আমাদের
পশ্চিম বাঙলার
সমুদ্র

ছন্দিতা

শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮২

সূচীপত্র

	ছন্দিতা		অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
কবিতা			
	নরেন্দ্রনাথ মিত্র		সুষমা মৈত্র
	প্রণাম	১১	প্রদীপ রায়চৌধুরী
	তোমাকে	১২	দেবারুণ রায়
	শরৎচন্দ্র ৭৫	১৩	অর্দ্ধেন্দু চক্রবর্তী
নাটক			
	জীবন পথিক	১৫	সুরেশ হালদার
প্রবন্ধ			
	শরৎচন্দ্র ও বাঙালী সমাজ	৩৩	নুরজাহান বেগম
	দেবদাসের প্রেম	৫৯	রজত রায়চৌধুরী
	শেষ প্রশ্নের প্রশ্ন	৪৪	লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
	কমললতা কি আদৌ কোন চরিত্র ?	৫২	পুলকেশ দে সরকার
গল্প			
	অন্ধকার	৭৪	মায়া বসু
	মন যারে চায়	৮৬	সরসী সরকার
	সুখের আকাশ	১০৮	নির্মলেন্দু গৌতম
	জীবনের চিত্রকর	১৫৩	হেনা চৌধুরী
কবিতাগুচ্ছ			
	গোত্রান্তর	১১৩	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
	পরিধি বাড়ে নি মোটে	১১৪	গোপাল ভৌমিক
	বদমাশের মুখোশ	১১৪	অমিয় কুমার হাটি
	সময় ছিল না তবু	১১৫	কৃষ্ণ ধর
	কৈশোর থেকে যৌবনে	১১৬	আইভি রাহা
	তুমিই জীবন	১১৭	শ্যামা দে
	এই আমি	১১৮	কামাল উদ্দিন মাহ্‌মুদ
	হ্যাঁ-না	১১৯	দুর্গাদাস সরকার

দ্রষ্টার বিবেকে ১২০ নচিকেতা ভরদ্বাজ
সুখ অসুখ ১২১ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
বেঁচে আছি ১২২ আবদুর রশীদ চৌধুরী
নারীকে ১২৩ কবিতা সিংহ
সন্ধিপত্র ১২৪ হেনা হালদার
তোমাকে ঘিরে ১২৫ রোসতম আলি মনজু
বাইশে শ্রাবণ ১২৬ নারায়ণ বসু
সারা দিনমান মেঘে ১২৭ সুভাষ পাল
রঙ্গমঞ্চে নায়ক ১২৮ সুচেতা মিত্র
আমার সম্রাজ্ঞী ১২৮ নয়ন কুমার রায়
ন্যায়-অন্যায় ১৬১ মানবেন্দ্র সান্যাল
দুর্গোৎসব ১৬২ কবিরুল ইসলাম

প্রবন্ধ নিবন্ধ

পেছনপানে তাকিয়ে ১২৯ অনুপ ঘোষাল
বেশভুষায় শালীনতা রক্ষা করুন ১৪২ বেলা দে
পূর্বাচলের পানে ১৪৫ রণজিৎ কুমার সেন
পুষ্পময়ী কলকাতা ১৪৭ উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
কবিতা বিষয়ে কিছু কথা ১৫০ বিজয়া মুখোপাধ্যায়
আইনজীবির চোখে শিশু
অপরাধী ১৬৩ অরুণা মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : দীপক দে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'ছন্দিতা' নামটি অভিনব। নামের মধ্যেই কেমন একটি গতিময়তা—গীতিময়তা আছে। ছন্দিতা বললেই মনে আসে স্পন্দিতা, নন্দিতা—আনন্দিতাকে। চাঞ্চল্যের মাঝে লাবণ্য, উল্লাসের মাঝে গাম্ভীর্য, লীলাতরঙ্গের মাঝে বিন্যাসশ্রী। ছন্দিতা অর্থই যেন শ্রীমণ্ডিতা। চতুর্দিকে চলনে-বলনে কাজে-কর্মে সাজে-সজ্জায় সর্বত্রই শ্রী-র আলিম্পন, শ্রী-র অর্চনা। ছন্দিতাই সর্বাবয়বা সুষমার মূর্তি।

ছন্দ বললেই মনে হয় যেন আর কারো সঙ্গে মিলবে, মিললেই সে তবে প্রাণ পাবে, অর্থ পাবে, সম্পূর্ণতা বা সিদ্ধি পাবে। না মেলা পর্যন্ত সে পঙ্গু, সে নিষ্প্রাণ, সে নিরর্থক, সে একাকী। এক ছত্র মিলবে আরেক ছত্রের সঙ্গে, এক ধ্বনি মিলবে আরেক ধ্বনির সঙ্গে, এক যতি পর্যাপ্তি পাবে আরেক যতিতে। প্রথম ছত্রটি পৃথিবী, দ্বিতীয় ছত্রটি আকাশ, প্রথম ছত্রটি ভূমি, দ্বিতীয় ছত্রটি ভূমা, প্রথম ছত্রটি দৈব, দ্বিতীয় ছত্রটি লোকান্তর। কর্ম চলেছে ধর্মে মিলবে বলে, প্রেম চলেছে পূজায় মিলবে বলে, বৈচিত্র্য চলেছে সামঞ্জস্যে, সামরস্যে মিলবে বলে। শোভার সঙ্গে শুভের মিলন, ক্ষণিকের সঙ্গে শাশ্বতের, বিগতের সঙ্গে অনাগতের।

ছন্দই তো রূপান্তর ঘটায়। ছন্দিতা হলেই তো সে রূপান্তরিতা। বিদ্যায় অবিদ্যার রূপান্তর, অমৃতে মৃত্যুর রূপান্তর, জীবনের রূপান্তর দিব্য কাব্যে।

শারদ অভিনন্দন

বাঙলা ও বাঙালীর সেরা উৎসবের দিনগুলি আবার ফিরে এসেছে। এ কটি দিন সবার জীবনে আনুক আনন্দের মূর্ছনা। যাত্রী যাঁরা — তাঁদের যাত্রা হোক নির্বিঘ্ন। প্রবাসের দিনগুলি হোক মধুময়।

পূর্ব রেলওয়ে

TCP/ER 336 A1/75

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নরেনদা চলে গেলে নিঃশব্দে

নীরবে   রাজার মত তোমার সে যাত্রাপথ

নয় বন্ধুর পিচ্ছল · ফুলে ফুলে শত সহস্র

গুণমুগ্ধ নরনারী অশ্রুভারাক্রান্ত বাক্যহীন —মৌন

স্তম্ভিত, নতমুখে সাজান

চলে সে রাজর্ষির শব পাশে পাশে।

নরেনদা, আর ফিরে আসবে না

নরেনদা, এ তুমি কি করলে

কার ওপর তোমার এ সর্ব্বনাশা অভিমান !

কথা-সাহিত্যে রাজা, অগণিত পাঠকের

হৃদয়রাজ্যে যে আসন পাতা তোমার

জানি তোমার অদর্শনে হবে না তা ম্লান

বরং আরো দেদিপ্যমান হয়ে জ্বলবে।

তবু তোমার — এ অকাল প্রয়াণ

কত কিছু এখনও দেবার ছিল তোমার

হৃদয়ে আমাদের শূন্য হাহাকারে ভরা

গুণমুগ্ধ শ্রোতা আমরা তোমার,

তোমাকে হারাবার দুঃখের চাইতে

তোমার সৃষ্ট চরিত্রের অকাল মৃত্যু

আমাদের বেদনা অথৈ জল।

নরেনদা, তোমার সেই মিষ্টি মধুর স-রস

রচনা সম্ভার —'সূর্যসাক্ষী', 'তিনদিন রাত্রি,

উপন্যাস—'রস', 'চেনা মহল', প্রভৃতি কত
অনুপম সৃষ্টি তোমার—আর কোথায় পাব আবার
কোন কথা না বলে চলে গেলেও
সাহিত্যাকাশে চির ভাস্বর উজ্জ্বল নক্ষত্র
তুমি—প্রোজ্জ্বল তবু আমাদের হৃদয়রাজ্যে
অম্লান সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র একটি নাম।

—সুষমা মৈত্র
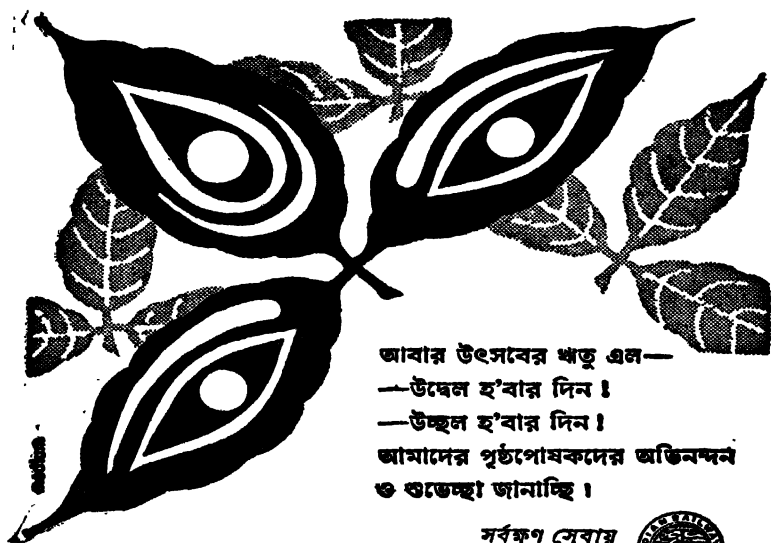
প্রণাম

প্রদীপ রায়চৌধুরী

এখনো গফুর খুনি
খুনের হয়নি কোন কিনারা
প্রচণ্ড খরায় শস্যের ক্ষেতের মতো
পুড়ে যায় বিপন্ন চাষীর কলজে
মহেশের তাজা খুনে রাঙা হয়
শিমুল ফুলের মতো আজও পূবালী আকাশ
মহাজন বাদশা সাজে নাটকীয় ভাবে
বুকের পাঁজর কেটে গড়ে তোলে স্বর্ণ দেউল

তোমায় প্রণাম জানাতে এসে হাত কাঁপে বড়
অপরাধী থেকে যাই নিজের গভীরে

অথচ এ্যাম্বাসাডার মার্কণ্ড্রি গণ্যমান্য প্রতিভূর ভীড়
সারারাত শতবার্ষিকী উৎসব চলে
ওরাতো সকলেই জানে মহেশের খুনি কে
কখন জেগেছে চর শুকনো নদীর বুক চিরে
কতখানি তীক্ষ্ণ ছিলো সমাজের ঝোড়ো রুক্ষ হাওয়া
কিভাবে উথাল পাথাল হলো তার সমস্ত চেতনা
অথচ সক্রোধে গফুর নিশ্চিন্ত জীবনের আজও পায়নি আশ্বাস
তবুও খুনিকে করেনি কেউ পবিত্র ক্ষমা

তোমায় প্রণাম জানাতে এসে হাত কাঁপে বড়
অপরাধী থেকে যাই নিজের গভীরে
এখনো গফুর খুনি
খুনের হয়নি কোন কিনারা

তোমাকে

দেবারুণ রায়

শরৎবাবু !
তোমার শিশিরে ভেজা পায়ের ছাপ
এখনও মিলিয়ে যায়নি
সোনালী গাঁয়ের শুকনো মেঠোপথে ।

রক্তহীন বাংলার মাঠে মন্দিরে মণ্ডপে,
যেখানে ক্ষয়িষ্ণু যুগের পটভূমিতে
কালোত্তীর্ণ নায়ক-নায়িকারা দু'দণ্ড বসে কথা বলে,
দারিদ্র্যে, প্রেমে, বঞ্চনায়, আবেগে,
বেঁচে থাকে আবার মরে যায়,
আজও সেখানে শোনা যায়
তোমার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ।

আবার, ঘোলাটে বার্মার কালো নদীর জলে
এখনও যাদের মুখ ভেসে ওঠে,
যারা মদ খায় আর মারামারি করে
তাদের মুখের অশ্রাব্য গালাগালির ফাঁকে
তোমার বলা না বলা অনেক কথায়
বেহাগ বেজে ওঠে ।

জীবনে যাদের কোনদিন আলো জ্বলেনি
সকালে অথবা সন্ধ্যায়,
তোমার প্রতিটি তপ্ত অশ্রুর খাঁজে খাঁজে
তাদের জন্য সাজানো ছিল
যেন যুগান্তরের বিন্দু বিন্দু প্রাণের উৎস ।
তারা এখনও শুকিয়ে যায়নি
ওদের ঝাঁঝরা হওয়া বুকের থেকে ।
কিন্তু আজকের সূর্য্যের আলোয়
তোমার বিবেক বিবর্ণ হয়ে যায়,
আজকের চাঁদের আলোয়
তোমার সত্তা গুমরে ওঠে,

আজ আর তোমার চোখে জল নেই,
সব যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।
তোমার শতবর্ষের আকাশ যখন
অরুণোদয়ের রঙে রাঙিয়ে উঠবে,
আমরা তোমায় অনেক করে সাজাবো, পূজো করবো,
তোমার অনেক অনেক কথা আমাদের সুরে বলবো,
কিন্তু দোহাই তোমার শরৎবাবু,
তুমি একটিও কথা বোলোনা,
কেঁদে গুমরে উঠো, তবু প্রতিবাদ কোরোনা,
তাতেই যে আমাদের আনন্দ !

শরৎচন্দ্র ৭৫

অর্দ্ধেন্দু চক্রবর্ত্তী

অনেক বিশ্বাস ক্রমে ভেঙে পড়ে
চতুর্দিকে যখন আক্রোশ
মানুষের মধ্যে থেকে মনে হয়
এ-সংসারে অনেকেই একা
দিনান্তের অনিশ্চিতি কুড়ে খায়
স্বপ্নের গঠন
এখন তোমার মুখ একান্ত জরুরী।

অনেক যুবক গেছে দূর কোনো
অ স্থির প্রবাসে
শব্দের ভিতর কাঁপা দৃশ্যপট, স্মৃতি,
প্রকৃত সুখের কাছে জাদুকর
বিলোচ্ছে আফিম।

বড় বেশী অন্ধকার আমাদের
নিঃশব্দ আত্মায়
আমাদের রক্তে নামে ভারি মেঘ
প্লাবনের মত
তোমার হাতের ছোঁয়া
এ মুহূর্তে এখনই আসুক॥

জীবন-পথিক

সুরেশ হালদার

গ্রামের রাস্তা। ঝোপ জঙ্গলের ভেতর থেকে দু'একটা পাখীর ডাক শোনা যায়। রাজলক্ষ্মী আপন মনে কবিতা আবৃত্তি করে চলেছে। শরৎচন্দ্র একটা গাছের আড়াল থেকে তাকে ডাক দেয়।

রাজলক্ষ্মী। পাখীসব করে রব, রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥

শরৎ। রাজু! রাজু—

রাজ। কে? (আবার আবৃত্তি করে চলে)

শরৎ। রাজু! এই রাজু—

রাজ। কে? ওমা—ন্যাড়াদা! জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কি করছ?—পাঠশালায় যাবে না?

শরৎ। আরে দূর—, এদিকে শোন। ও প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় বিশে ছোঁড়াটাকে আমার মোটেই ভালো লাগে না! উঃ সর্দার প'ড়ো। তাতে আমার কি? ওর অত মাথা ব্যথা কেন—আমরা পড়াশোনা করি ছাই না করি বিশের অত গায়ে জ্বালা কেন? আর প্যারী পণ্ডিত! বুড়ো ষাটের মড়া!—ওর কথা শুনে সেদিন কি মারটাই না মারলে আমাকে। তবে হুঁ, আমার নামও ন্যাড়া,—বিশে আর ওই প্যারী পণ্ডিত ও দুটোকেই আমি দেখে নেবো এক হাত।

রাজ। তুমি মিছিমিছি রাগ করছ ন্যাড়াদা,—নিজে দুষ্টুমি করবে আর ওদের ঘাড়ে চাপাবে দোষ!

শরৎ। কি দুষ্টুমি আমি করেছি শুনি—ওরাই তো আমাকে যখন তখন অপমান করে।

রাজ। এ তুমি মিথ্যে বলছ ন্যাড়াদা!

শরৎ। কি বললি আমি মিথ্যে বলছি—যা, তোর আর মুখ দেখবো না। জানিস, ন্যাড়া চাটুজ্যে সব পারে—সে কোনদিন মিথ্যে কথা বলে না।

রাজ। তুমি মিছেই রাগ করছ। চল, এখন পাঠশালায় চল। কত দেরী হয়ে গেল বলত?

শরৎ। তুই যা—আমি যাবো না।

রাজ। দেখ ন্যাড়াদা, পাঠশালায় না গেলে আজ সত্যিই আমি জ্যাঠা-মশাইকে সব বলে দেবো।

শরৎ। কি বলবি শুনি —

রাজ। বলব, তুমি পণ্ডিতমশায়ের হুঁকোয় তামাক টেনেছ! আর—

শরৎ। (উত্তেজনায়) রাজু—

রাজ। আচ্ছা ন্যাড়াদা, তোমার তো অনেক গুণ—তবে কেন এমন কর বলত?

শরৎ। বেশ ক'র। আমার যা খুশি আমি তাই করি—তাতে তোর কি?

রাজ। আমার আর কি?—তোমার ভালর জন্যেই বলি।

শরৎ। ভালো! আমার ভালো কাউকে ভাবতে হবে না। যা তুই এখন চোখের সামনে থেকে—

রাজ। তা যাচ্ছি, কিন্তু আর কোনদিন আমাকে কিছু বলতে পারবে না। তোমার সঙ্গে আর কোনদিন কোথাও যাব না—এই বলে রাখলাম।

শরৎ। যা-যা, ভারি আমায় ভয় দেখাস্। সতীশ আছে তাকে নিয়েই নৌকা বেয়ে আখড়া বাড়ীতে যাবো।—তখন কিন্তু কাঁদতে পারবে না।

রাজ। হুঁঃ! ভারি আমার বয়েই গেল। (গানের সুর ভেঙে চলতে থাকে)

শরৎ। রাজু—রাজু,—যা-যা, কারুকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে না। দেমাক করে আবার চলে যাওয়া হচ্ছে। রাজু—রাজু—(লঘু সংগীতের সুর বেজে ওঠে)

(২)

প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালা। ছেলেমেয়েদের পড়ার কলরব শোনা যায়। মাঝে মাঝে প্যারী পণ্ডিতের নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিশু ওরফে বিশে মাতব্বরি করছে।

বিশু। এই ঘণ্টে তোর লেখা হয়ে গেছে?—কি—আমাকে তুই মুখ ভ্যাঙালি! দাঁড়া গুরুসাঁইকে বলে দিচ্ছি।

১ম বালক। দেখ বিশেদা, ও আমার পাতাগুলো কেড়ে নিচ্ছে।

বিশু। কি রে, নিধু।

২য় বালক। ও আমার দোয়াতের কালি ফেলে দিল কেন—

১ম বালক। কখন ফেলেছি, দেখলে তো বিশেদা।

১ম বালিকা। না বিশেদা, নিধু মিথ্যে কথা বলছে।

বিশু। কি রে নিধু, ডাকবো গুরুসাঁইকে (পণ্ডিতের নাক ডাকার শব্দ জোরে শোনা যায়)

১ম বালক। কি মিথ্যুক-বিশেদা—এই, কখন তোর কালি ফেলেছি?

২য় বালক। কখন তোর পাতা কেড়ে নিয়েছি!

১ম বালক। নিস্ নি? আবার মিথ্যে কথা বলছিস্?

২য় বালক। দেখলে তো বিশেদা, কেবল কেবল মিথ্যেবাদী বলছে। (সহসা প্যারী পণ্ডিতের ঘুম ভেঙে যায়)

প্যারী। উঁ-হুঁ-হুঁ! (কাশতে থাকেন) কি রে লেখাপড়ার নামে অষ্টরম্ভা কেবল ঝগড়া হচ্ছে। এই বিশে—বেতগাছটা নিয়ে আয় তো। এই বিধে-এই খণ্টে ইদিকে আয়—আয় হারামজাদা!

১ম বালক। আর করবো না গুরুসাঁই—কক্‌খনো করবো না।

প্যারী। কি রে নিধে, এখন লক্ষ্মীছেলেটি সেজেছ যে—একেবারে সতী-সাধ্বী! ভাজা মাছটি যেন উল্টে খেতে জানে না। ইদিকে আয়—আয় শীগ্‌গির। রক্তগঙ্গা করে ছাড়বো। আয় ইদিকে—

২য় বালক। আর কক্‌খনো করবো না গুরুসাঁই, এই আপনার পায়ে পড়ছি—(প্যারী পণ্ডিত এলোপাথাড়ি বেত চালাতে থাকেন ও সাঁই সাঁই শব্দ শোনা যায়। বালকদের কান্নার সুর ভেসে ওঠে।)

১ম ও ২য় বালক। আর কখনো করবো না গুরুসাঁই—আর কক্‌খনো নয়।

প্যারী। বিশে, দে তো দু'টোকে নাড়ুগোপাল করে হাতে দুখানা ইট দিয়ে বসিয়ে দে। যত সব হারামজাদা বাঁদরের দল। আবার যদি করবি তো পাঠশালা থেকে দূর করে দেবো।

৩য় বালক। গুরুসাঁই এবার প'ড়বো?

প্যারী। না। আগে সব লেখা শেষ কর্।

২য় বালিকা। আমার সব শেষ হ'য়ে গেছে গুরুসাঁই।

প্যারী। আবার লেখ। হ্যাঁরে বিশে, ন্যাড়াটা অ'জ আসে নি?

বিশু। আজ্ঞে না, গুরুসাঁই।

প্যারী। রাজলক্ষ্মী এসেছিস্?

বিশু। আজ্ঞে না, গুরুসাঁই।

৩য় বালক। আমরা যখন আসি,—ন্যাড়া তখন রাস্তায় লাট্টু খেলছে দেখলুম গুরুসাঁই।

প্যারী। (গম্ভীরভাবে) হুঁ! এই ছোনে, এক ছিলিম্ তামাক সেজে দিয়ে আর তো—আসুক এবার ছোঁড়াটা, বেতিয়ে পিঠের চামড়া তুলে নেবো। (ধীরে ধীরে শরৎচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মীর আগমনে বালক বালিকাদের একটা চাপা গুঞ্জন শোনা যায়।)

এই যে বাবা নেড়ু, ইদিকে এস—এস বাপধন! এত দেরী হ'ল কেন বাপ? কি রাজকার্য হচ্ছিল শুনি—

শরৎ। আজ্ঞে গুরুসাঁই।

প্যারী। আজ্ঞে গুরুসাঁই (বেত্রাঘাতের সাঁই সাঁই শব্দ) বল্ কি করছিলি রাস্তায়? শিগ্ গির্ জবাব দে—

শরৎ। (নির্ভীকস্বরে) লাট্টু খেলছিলাম।

প্যারী। (বিকৃতস্বরে) লাট্টু খেলছিলে? হারামজাদা, পড়ালেখা ফাঁকি দিয়ে লাট্টু খেলা? ওরে গর্দভ—বামুনের ঘরের অকালকুষ্মাণ্ড চিরটা জীবন মুখ্যু হ'য়ে করবিটা কি!—যা লেখ্। (বিকৃতভাবে) আর মা জননী—তোমার এত দেরী কেন বাছা? (ধমকের সুরে) জবাব দাও, চুপ করে রইলে কেন?—বল? (রাজলক্ষ্মীর কান্না শোনা যায়) যাও, আর কাঁদতে হবে না। বুঝেছি, ন্যাড়াটাই তোমাকে দেরী করিয়ে দিয়েছে।

৪র্থ বালক। গুরুসাঁই!

প্যারী। সেজেছিস দে,—(তামাক টানার শব্দ শোনা যায়। কিছুক্ষণ পর, আবার প্যারী পণ্ডিতের নাক ডাকার শব্দ। এই অবসরে শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের টিকি কেটে দিয়ে রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। বালক বালিকারা হাসতে থাকে।)

বিশু। গুরুসাঁই—গুরুসাঁই! ন্যাড়া আপনার টিকি কেটে দিলে। ও-গুরুসাঁই।

প্যারী। উঁ-হুঁ-হুঁ! নে ডাক পড়া। (বিশু পড়ায়—"একে চন্দ্র, দু'য়ে পক্ষ" ইত্যাদি। বালক বালিকারা সমস্বরে পড়তে থাকে ও মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের কাণ্ড স্মরণ করে হাসতে থাকে।)

প্যারী। কি রে, থামলি কেন? এই হারামজাদা, হাসা হচ্ছে কেন? এ্যাঁ বেতগাছটা দেত, হারামজাদা, পাজি,—নচ্ছার—চুপ কর।

বিশু। গুরুসাঁই, ন্যাড়া আপনার মাথায়—

প্যারী। কি-কি আমার মাথায়?

বিশু। হাত দিয়ে দেখুন।

প্যারী। (ক্রোধে) কি আমার শিখা কর্তন? হারামজাদাকে আজ খুন করব। এই-এই যা তোরা সব, আজ ছুটি। (বালক বালিকারা "ছুটি ছুটি—ছুটি" চীৎকার করতে করতে চলে যায়।) বিশে, আমার সঙ্গে আয় তো। দেখি, হারামজাদা পাজি ছুঁচো। এঁ্যা, এত বড় স্পর্দ্ধা—আমার শিখা কর্তন। (ব্যাজ সুর বেজে ওঠে।)

(৩)

পথিপার্শ্বের ঘন সন্নিবদ্ধ জঙ্গল। শরৎ ও রাজলক্ষ্মী এখানে অপেক্ষা করছে। দু'একটা পাখীর ডাক ও শিশ্ শোনা যাচ্ছে।

রাজ। এ তুমি কি করলে ন্যাড়াদা!

শরৎ। ব্যাটা প্যারী পণ্ডিত! ন্যাড়া চাটুজ্জের সঙ্গে বাহাদুরী। গায়ে হাত তোলা? কেমন—

রাজ। কাজটা কিন্তু তোমার মোটেই ভাল হয় নি?

শরৎ। চুপ কর রাজু—রাগ বাড়াস নে! আর ব্যাটা বিশে,—তোমার মাথা নেড়া করে যদি ঘোল ঢালতে না পারি তো আমার নাম ন্যাড়া চাটুজ্জে নয় এস একবার এদিকে—

রাজ। বিশের কি দোষ বল—গুরুমশাই ওকে বলেছে বলেই তো—

শরৎ। দেখ্ রাজু, কারো দলে ভিড়বি তো আমার সঙ্গে মিশবি না—এই বলে দিলুম। সর্দ্দার পড়ো হয়েছে! ওর সর্দ্দার পড়ো হবার কি গুণ আছে শুনি?—নৌকা বাওয়া, মাছধরা, গাব্বু খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো—কোনটা ও পারে

রাজ। তা পারে না বটে কিন্তু লেখাপড়ায়—

শরৎ। (ক্রোধে) কি বললি রাজু,—আবার যদি ও কথা বলবি—

রাজ। তুমিই তো শিখিয়েছ ন্যাড়াদা,—সত্যি কথা বলতে।

শরৎ। যা দূর হয়ে যা আমার সুমুখ থেকে, যা শিগগির, আর কোনদিন আসবি না।

রাজ। দু'বেলা আবার ডাকতে যাও কেন?

শরৎ। বেশ করি, তাতে তোর কি?

রাজ। আমি সত্যি কথা বলবো তাতে কার কি? বিশে সর্দ্দার পড়ো—খুব ভাল ছেলে।

শরৎ। কি বললি, যা দূর হয়ে যা আমার সুমুখ থেকে। (প্রহার করে)

রাজ। (কাঁদতে কাঁদতে) ঠিক আছে যাচ্ছি,—আজ নির্ঘাত জ্যাঠামশাইকে গিয়ে বলবো—ন্যাড়াদা যখন তখন আমাকে ধরে মারে।

শরৎ। যা বল্ গিয়ে যা—আমি ওতে ভয় করি না।

রাজ। বলবো তো। তুমি রোজ রোজ পাঠশালা পালিয়ে দুষ্টুমি করে বেড়াবে—

শরৎ। (আরও কয়েক ঘা প্রহার) যা—যা, বলগে যা। রাক্ষুসি পোড়ারমুখি—

রাজ। (কাঁদতে কাঁদতে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবো তো—গিয়ে বলবো (ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে)।

শরৎ। বলবি—বলবি, আমি ব্যাটা ছেলে—আমার অত ভয় কিসের? আমি যা খুশি তাই করবো—তাতে কার কি? কারও আমি অত ভয় করি না, যা— (রাজলক্ষ্মী কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে যায়)

শরৎ। সত্যি কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছে— নাঃ! রাজু—রাজু—শোন লক্ষ্মীটি! রাগ করিস্ না!

রাজ। তুমি আমাকে এত যখন তখন মারো কেন?

শরৎ। তুই আমাকে অত রাগিয়ে দিস্ কেন? জানিস্ তো—আমি সহজেই ক্ষেপে যাই।

রাজ। তাই ব'লে তুমি আমাকে যখন তখম মারবে?

শরৎ। আর মারবো না,—এই কথা দিলাম।…আহা! গালে কেমন কালসিটে দাগ পড়ে গেছে দেখ,—কতদিন তোকে বলেছি—আমাকে অমন করে ক্ষেপিয়ে দিস্ না, তবুও—শোন্ রাজু,— শোন্ আজ আমার একটা কাজ আছে—

রাজ। আবার কি কাজ?

শরৎ। একবার বসন্তপুরের হাটে যেতে হবে। ভালো ছিপগাছটা ভেঙে গেছে। একগাছা ভাল ছিপ না হ'লে—

রাজ। আবার কাদের পুকুরে মাছ ধরবে?

শরৎ। মুখুজ্জেদের পুকুরের ম্যারোয়া মৃগেলটা আজ রাতেই ধরা চাই।

রাজ। তুমি এমন এক একটা দুঃসাহসিক কাজ কর না—

শরৎ। এই রে। বিশে আর প্যারীপণ্ডিত এদিকেই আসছে—

রাজ। কি হবে এখন!

শরৎ। শি—শ্! কিছু ভাবতে হবে না,—তুই ওই ঝোপটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়া। এখেন থেকে এমন একটা ইট ছুঁড়বো না—

বিশু। (দূর থেকে বিশুর কণ্ঠস্বর শোনা যায়।)—এখেনেই তো ন্যাড়ার আড্ডা!

প্যারী। আজ একবার তাকে পেলে হয়,—রক্তগঙ্গা করে ছাড়বো! (সহসা বিশুর গা ঘেঁসে একখানা ইট পড়ার শব্দ।)

বিশু। আরে বাবা! পালিয়ে চলুন গুরুসাঁই—পালিয়ে চলুন। ঝোপের ভেঁতর থেকে ন্যাড়া ইট ছুঁড়ছে। এখনি আমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যেত—

প্যারী। এঁ্যা, তাই নাকি! শেষে খুন করবে? চল্ চল্ পালিয়ে চল্ —শিগ্‌গির্ পালিয়ে চল্। কি খুনে ছেলেরে বাবা! চল্ চল্। (ঝোপের ভেতর থেকে রাজলক্ষ্মী হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে।)

শরৎ। কেমন মজা! তোমরা জব্দ করবে ন্যাড়া চাটুজ্যেকে! হা-হা-হা!

(৪)

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখুজ্যেদের পুকুর পাড়ে ঝোপের মধ্যে বসে মাছ ধরছে শরৎ। পা টিপে টিপে আসে রাজলক্ষ্মী। ঝিঁঝিঁর একটানা সুর ও ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে।

রাজ। ন্যাড়াদা! (চাপা স্বরে) ন্যাড়াদা!

শরৎ। ইস্, কি টানটাই না টানলে,—শুধু তোর জন্যে—

রাজ। এই অন্ধকারে ঝোপের ভেতর বসে ছিপ ফেলছ যদি সাপে কামড় দেয়?

শরৎ। শি—শ্। চুপ কর। সাপের ওষুধ আমার জানা আছে—মন্ত্রও জানি।

রাজ। আর কেউ যদি টের পায়?

শরৎ। ন্যাড়া চাটুজ্যেকে ধরবার মত লোক এ তল্লাটে কে আছে শুনি—

রাজ। উঁ—কি একেবারে বীরপুরুষ!

শরৎ। চুপ কর! এই রাজু—

রাজ। উঁ!

শরৎ। ওখেনে কল্‌কেটা আছে, একটু আগুন নিয়ে আয় তো।

রাজ। সে কি! তুমি তামাক খাও ন্যাড়াদা!

শরৎ। না—খাই না।—খেয়ে দেখবো।

রাজ। জ্যাঠামশাইকে বলে দেবো।

শরৎ। (ক্রোধে) রাজু!

রাজ। তোমার যা খুশী তুমি তাই করবে? তুমি না ভদ্রলোকের ছেলে অমন ছোটলোকের মত—

শরৎ। কি বললি! আজ তোকে এই ছিপ দিয়েই (মারতে থাকে রাজলক্ষ্মী ফুঁপিয়ে কাঁদে।) (কিছুক্ষণ পরে) চুপ কর রাজু। কাঁদিস নি। আর তো কটা দিন,—আর তোকে জ্বালাব না।

রাজ। (কান্নায় ভেঙে পড়ে) ন্যাড়াদা। আঃ—আঃ!

শরৎ। সত্যি রাজু, আমরা ভাগলপুরে মামারবাড়ী চলে যাচ্ছি।

রাজ। না! কিছুতেই তোমাদের যেতে দেবো না—জ্যাঠামশাইকে বলে—

শরৎ। তা হয় না রে রাজু। বাবার চাকরি নেই সংসার চালাবেন কেমন করে—যেতেই আমাদের হবে।

রাজ। যেতেই যখন হবে—আটকে তোমায় রাখবো না ন্যাড়াদা। অনেক যত্নে তোমার জন্যে এই বৈঁচির মালাটা গেঁথে নিয়ে এসেছি। বিদায়ের কালে এই ছোট দানটুকু নিয়ে সারাজীবন আমাকে মনে রেখো ন্যাড়াদা। (প্রণাম করে)

শরৎ। আহা-হা! একি! হঠাৎ এমন প্রণাম করছিস্ কেন?

রাজ। আর কোনদিন যদি দেখা না হয়,—তাই একটু পায়ের ধুলো মাথায় নিলাম ন্যাড়াদা!

শরৎ। রাজু! রাজু! (করুণ সুর বেজে ওঠে।)

(৫)

বর্ষাকাল। নদীতে জলের ঢেউয়ের আওয়াজ। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। নৌকার দাঁড় বাওয়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

রাজেন্দ্র। কি রে ন্যাড়া ভয় করছে না তো!

শরৎ। না—না, ভয় কি?

রাজেন্দ্র। সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের! (ঝুপঝাপ শব্দ)

শরৎ। ও কিসের আওয়াজ রাজুদা?

রাজেন্দ্র। জলের স্রোতে ওপাড়ের বালির পাড় ভেঙে পড়ছে।

শরৎ। কি রকম স্রোত! অত বড় পাড় স্রোতের মুখে ভেঙে পড়ছে।

রাজেন্দ্র। পড়বে না? এ নদীর স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা কি সোজা কথা। দাঁড়া এখানটায় নৌকো বাঁধি।

শরৎ। এখানে নৌকো বেঁধে কি হবে?

রাজেন্দ্র। দূর বোকা! এখেন থেকেই ত মাছ তুলবো। দেখছিস্ না জাল পাতা রয়েছে। তুই লগিটা শক্ত করে ধ'রে দাঁড়া, টপাটপ্ দু'চারটে বড় মাছ তুলে নিয়ে আসি।...(ক্যানেস্তারা পিটানোর শব্দ) ব্যাস্! চল্—।

শরৎ। ও কিসের আওয়াজ? জেলেরা টের পেলো নাকি?

রাজেন্দ্র। চল্ শিগ্গির, ওই ভুট্টা ক্ষেতের ভেতর লুকিয়ে পড়ি।

জেলেদের কণ্ঠ। "বললাম্ মাছ লাফাচ্ছে—যেমন জাল তেমনি পাতা রয়েছে, চল্—চল্!"

রাজেন্দ্র। যাক্ চলে গেছে···

শরৎ। ওই ভুট্টা ক্ষেতে ঢুকতে তোমার ভয় করল না?

রাজেন্দ্র। কেন?

শরৎ। তুমিই তো বললে,—কত সাপ; যদি কামড়ে দিত—

রাজেন্দ্র। আরে দূর! ওরাই তখন প্রাণের ভয়ে অস্থির।···ন্যাড়া, তুই নৌকোতে চুপচাপ্ বসে থাক্।···একা থাকতে তোর ভয় করবে না তো?

শরৎ। না—না, ভয় আবার কিসের। তুমি যাও—

রাজেন্দ্র। যদি কেউ মাছ চাইতে আসে কিছুতেই দিস্ নে।

শরৎ। আচ্ছা। (নদীর গর্জন আর দূরে কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে।)

রাজেন্দ্র। বেশী দূর যেতে হল না রে ন্যাড়া! ও—আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। দে, মাছগুলো বার করে দে।···বহুৎ বড়িয়া মছলি। বহুৎ জেয়াদা ভাও দেনে হোগা।

হিন্দুস্থানী। ও বাত ছোড় দিজিয়ে বাবুজী, আজ তো দো রূপেয়া কম্তি লেনে হোগা। ইধার বহুৎ বিমারী হোতা—কই আদমী মছলি খাতা নেই, লিজিয়ে (রৌপ্যমুদ্রার শব্দ) ম্যায় জাতা হুঁ বাবুজি···

রাজেন্দ্র। ঠিক হ্যায়।

শরৎ। জেলেদের জাল থেকে তুমি যখন মাছগুলো তুলে নিলে, তখন তোমার সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম রাজুদা!

রাজেন্দ্র। এখন ঘেন্না হচ্ছে না!···বিশে ডাকাতের গল্প শুনেছিস্। এও তেমনি, ওটাকা গরীব দুঃখীদের জন্যে রে ন্যাড়া—তাদের জন্যে।

শরৎ। কিন্তু তুমি!

রাজেন্দ্র। আমার সঙ্গে গেলেই বুঝতে পারবি—নিজের চোখে দেখে আসবি। কলেরায় গ্রামকে গ্রাম উজোড় হতে বসেছে! ওষুধ নেই, পথ্যি নেই,—নে চল্। (দাঁড় বাওয়ার শব্দ। ক্ষুধার্ত্ত শৃগালের কলহ ও চীৎকার। শকুনির পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ। একটা ভয়াবহ পরিবেশ।)

শরৎ। এখেন থেকে পালিয়ে চল রাজুদা, দুর্গন্ধে আর টেঁকা যাচ্ছে না।

রাজেন্দ্র। বললুম না, কলেরায় গ্রামকে গ্রাম উজোড় হয়ে যাচ্ছে। দেখছিস্‌-নে—বাচ্ছা ছেলেটার মরা দেহ কী রকমভাবে পড়ে আছে—ওটাকে একটু সরিয়ে দিই।

শরৎ। কি জাতের মড়া তার কোন ঠিক নেই—তুমি ওকে ছোঁবে ?

রাজেন্দ্র। মড়ার জাত নেই রে ন্যাড়া—মড়ার জাত নেই। চল্‌ ওই ঝাউ-বনটার ভেতর রেখে আসি। (দূর থেকে বাঁশীর করুণ সুর ভেসে আসে।)

(৬)

খঞ্জরপুরের বাড়ীর পাশের একটি মসজিদ ও কবরখানা। অদূরে প্রবহমানা গঙ্গায় কলকল শব্দ। রাত্রিকাল। চারদিক নিস্তব্ধ।

বিভূতি। কি গো ন্যাড়াদা, বাঁশী বাজাবে না ?

শরৎ। আর ভাল লাগছে না ভাই। এবার এখেনের পালা শেষ করতে হবে।

বিভূতি। কেন ?

শরৎ। বাবার চাকরি নেই আবার দেবানন্দপুরে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

বিভূতি। এই ভাগলপুর—খঞ্জরপুরের মায়া তুমি ত্যাগ করতে পারবে ?

শরৎ। না পেরে উপায় কি ভাই।

বিভূতি। তোমার মত নির্ভীক সত্যসন্ধ সঙ্গী থাকলে আমরা যে জগত জয় করতে পারতাম।

শরৎ। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম কশাঘাতে অকালে পড়াশোনাও আমাকে ত্যাগ করতে হচ্ছে। ছাত্রবৃত্তি পাশ করে তেজনারায়ণ জুবিলি স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিলাম কত সাধ ছিল কিন্তু সব বিফলে গেল যে ভট্ট।

বিভূতি। আজ কত কথা মনে পড়ছে ন্যাড়াদা,—এই কবরখানায় হিন্দুর সংস্কার বশে কেউ আসতে সাহস করত না। তোমার সাহসিকতার সঙ্গগুণে মামদো ভূতই বল—আর ব্রহ্মদৈত্যই বল সব ভয়কেই তুচ্ছ করতে শিখেছিলাম।

শরৎ। পুরনো কথাগুলো আর জাগিয়ে তুলিস্‌ না ভাই —

বিভূতি। অমাবস্যার রাতে কতদিন এই কবরখানায় কাটিয়েছি। গুরুজনের রক্তচক্ষু, দাদাদের চপেটাঘাত সব এড়িয়ে গঙ্গার চড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছি। জ্যোৎস্না রাতে তোমার বাঁশীর সুরে আবেশে চোখ বুজে এসেছে। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান—থিয়েটারের রিহার্সাল—কতরাত বাঁশ মাথায় দিয়ে সতরঞ্চিতে পড়ে রাত

কাটান—এ যে আর কোনদিন হবে না ন্যাড়াদা, এমন উদার জীবনের এখানেই শেষ হয়ে যাবে ?

শরৎ। না-রে-না, এক আসে আর যায় ! কারো জন্যে কারো জীবন বিফল হয় না ভাই !……যাক, রাজুদা. নীলু, সতীশ সবাইকে আমার কথা জানাস্ ! কাল সকালেই আমরা চলে যাচ্ছি !

বিভূতি। ও-কথা তুমি বলো না ন্যাড়াদা, আমি সহ্য করতে পারছি না। …(কান্নায় ভেঙে পড়ে)

শরৎ। কাঁদিস না ভট্টু—চুপ কর।

বিভূতি। আবার কবে আসবে ?

শরৎ। ভাগ্যের চাকা যেদিন ঘুরবে—চলি রে !

বিভূতি। সত্যিই তুমি চলে যাবে ন্যাড়াদা—(কান্নায় ভেঙে পড়ে)

(৭)

মালিসপুরের চৌরাস্তার মোড়। গোবিন্দ মুদির দোকান।

গোবিন্দ। এত সকালে কোথায় চল্লে দিদি ?

অন্নদা। তোমার কাছে একবার এলাম ভাই, আমার মাকৃড়ি জোড়া বিক্রী হয়েছে ?

গোবিন্দ। হ্যাঁ, এই নাও ! তোমার জন্যেই আলাদা রেখে দিয়েছি।

অন্নদা। তোমার দেনাটা মিটিয়ে নাও ভাই !

গোবিন্দ। শাহজী মাত্র কাল গত হয়েছেন—তা এত ব্যস্ত হবার কি ছিল একটু সবুর করতে পারলে না !

অন্নদা। কখন কোথায় চলে যাই—তোমাদের কাছে অনেক ঋণ তো করেছি আর কেন সামান্য ক'টা টাকা !

গোবিন্দ। দিদি ! এ তুমি কি বলছ ?

অন্নদা। ঠিকই বলছি ভাই, তোমাদের ভরসাতেই এতদিন কাটালাম ! কিন্তু আজ আর ঐ কবর আঁকড়ে পড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

গোবিন্দ। তা অবশ্য ঠিক কথা কিন্তু—

অন্নদা। কাল কবর দিয়ে ফেরবার সময় মনে হয়েছিল—যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাই কিন্তু সতু আর ন্যাড়া কিছুতেই ছাড়লে না।

গোবিন্দ। সত্যি, ছেলে দুটো খুব দুঃখু পাবে। ওদের ভালবাসা—

অন্নদা। ওদের ভালবাসার ঋণ আমি কোন দিন শোধ দিতে পারবো না ! ওদের কাছে পেয়েছি অনেক—বিনিময়ে শুধু ঠকিয়েছি…(কান্নায় ভেঙে পড়ে)

গোবিন্দ। দিদি! চুপ কর!

অন্নদা। সতুর কাছে আমার আর কোন মুখ নেই। ন্যাড়াকে এই চিঠিখানা আর পাঁচটা টাকা পৌঁছে দিও গোবিন্দ দা।

গোবিন্দ। তুমি যদি হিঁদুর মেয়ে হ'তে—

অন্নদা। গোবিন্দ দা!

গোবিন্দ। জাত আর জাত!

অন্নদা। অকারণ দুঃখ ক'রো না গোবিন্দ দা! আমি চলি—ন্যাড়া, সতু এসে গেলে হয়ত আর আমার যাওয়া হবে না। তাদের বলো—তাদের জন্যে রেখে গেছে আশীর্বাদ তাদের—অন্নদাদি!

গোবিন্দ। অন্নদাদি! (করুণ সুর ভেসে ওঠে)

(৮)

রাস্তা। সতীশ আর শরৎ চীৎকার করে চলেছে।

সতীশ। অন্নদাদি!— অন্নদাদি—

শরৎ। দিদি—দিদি—

সতীশ। দিদি—অন্নদাদি—নাঃ! অনেক দূরে হয়ত চলে গেছে!

শরৎ। গোবিন্দদা একবার খবর দিতে পারল না! কোথায় কোন পথে চলে গেছে।

সতীশ। চিঠিতে কি লিখেছে পড়তো ন্যাড়া। (অন্নদার কণ্ঠে শোনা যায়) স্নেহের ভাই ন্যাড়া,

সতুকে কিছু বলার মুখ আর আমার নেই। তাই তোমাকে চিঠি লিখে গেলাম ভাই। ওঁর কাছে সাপের ওষুধ মন্তর শিখতে এসে সে শুধু ঠকেছে, তাই লজ্জায় তাকে আর কোন দিন মুখ দেখাবো না।

সতীশ। ঠকেছি—আমি ঠকেছি,—তোমার কি?

তোমরা আমার পরিচয় জানতে চেয়েছিলে—এই চিঠিতে সংক্ষেপে তা জানালাম।···ওঁকে কবর দেওয়ার পর যখন নোয়া জলে ফেলে মাটি দিয়ে সিঁথির সিঁদুর তুলে এলাম তোমরা তখন একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলে—তাই না? ······তোমরা ঠিকই ধরেছ ভাই,—শাহজী (উনি) আমার বিবাহিত স্বামী। আমরা দু'জনেই ব্রাহ্মণ-সন্তান! আর পাঁচ জনের মত আমাদেরও উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে ঘটা করে বিয়ে হয়েছিল—

সতীশ। অন্নদাদি বামুনের মেয়ে।

শরৎ। তারপর শোন।

হিন্দুর আচারে সংস্কার করলে পাছে যদি সব নাশ হয়ে যায় তাই—

সতীশ। কবর দিয়েছে।

শরৎ। কিন্তু নিজের হিন্দুয়ানী ঠিক বজায় রেখেছে।

সতীশ। তারপর।

শাহজী আমার নিজের মায়ের পেটের বড় বোনকে খুন করেছিল !······

উভয়ে। খুন ! কিন্তু কেন ?

তোমরা ছেলেমানুষ সে কথা শুনতে চেয়ো না। বাবা ছিলেন খুব রাশভারী মানুষ ! শাহজীকে তিনি পুলিশে দেবেন। তাই তাকে নিতে হয়েছিল ছদ্মবেশী যাযাবরী জীবন। আসল মানুষটা মরে গিয়ে তখন হয়েছে শাহজী !

সতীশ। শাহজী ! তাহ'লে ওটা আসল নাম নয় !

যাযাবরী বৃত্তিতে ও হ'ল সাপুড়ে। কয়েক বছর পর একদিন আমাদের বাড়ীর সামনেই সাপ খেলাতে শুরু করে। আমি তাকে চিনতে পারি। আর সেদিন রাতেই খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে যাই স্বামীর সঙ্গে নিরুদ্দেশের পথে। সকালে সবাই শুনলো—সবাই জানলো—অন্নদা কুল ত্যাগ করেছে।

তাই বলছিলাম ভাই, কারো কাছে যাবার আজ আমার মুখও নেই,—উপায়ও নেই।

শরৎ। কি নিষ্ঠুর হিন্দু সমাজ।

···আমাদের ভাই ছিল না, আমরা দুটি মাত্র বোন। শাহজী গরীবের ছেলে দেখে বাবা নিজের কাছে রেখে, লেখাপড়া শিখিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দেন। থাক্, এই পর্যন্ত······

আজ এত দুঃখের মাঝেও তোদের ওই কচি বুক দুখানি আমার বুকে পুরে যেতে পারলাম তাতে যে আমার কি শান্তি ! কি তৃপ্তি ! তা তোদের বুঝিয়ে বলতে পারবো না ভাই।

সতীশ। পাষাণী !

শরৎ। মেয়েরা এমনি পাষাণী হয় সতীশদা !

পাষাণী দিদির কথা ভেবে তোরা মন খারাপ করিস না ভাই, তোদের দিদি যেখানেই থাক, ভাল থাকবে।···

মায়ের পেটের ভাই ছিল না। ভাইয়ের স্নেহ-ভালবাসা যে কি জিনিস অতি বড় দুঃখের দিনে তা যখন জানলাম, তখন আমি এ-কুল ও-কুল দুকুলই হারিয়ে বসে আছি। আজ কি বলে তোদের আশীর্বাদ করব—তার

ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। যাবার সময় শুধু এইটুকু বলে যাই,—ভগবান যদি এই পতিব্রতার মুখ রাখেন, তাহ'লে তোদের দু'টি প্রাণের বন্ধুত্বও যেন তিনি অক্ষয় করেন।······

ভাই গ্যাড়া, রাগ করিস না,—তোর ওই টাকা ক'টার সঙ্গে যে মায়া জড়ান রয়েছে,—তাই নিয়ে যেতে পারলাম না। সাপুড়ের সঙ্গ নিয়ে যখন বাপের ঘর ছেড়েছিলাম তখন আর পিছন ফিরে চাই নি। আজ আবার তোদের ছেড়ে যখন অজানার পথে পাড়ি দিচ্ছি—তখন আর টাকার দিকে ফিরে চাইতে পারবো না ভাই। বিদায়! ইতি—তোদের অন্নদা দি

শরৎ। অন্নদা দি! কুলটা, কুলত্যাগিনী কলঙ্ক নিয়েও স্বামীর জন্যে তুমি যে দুঃখ সইলে তা কোনদিন কখনোই ভুলব না!

সতীশ। আয় গ্যাড়া, দূর থেকে সতী সাধ্বী অন্নদাদিকে অন্তরের ভক্তি অর্ঘ্যে একবার প্রণাম করি! (বিষাদের সুর ভেসে আসে!)

(৯)

আদমপুর ক্লাব। মহলা চলছে। ক্লাবের সদস্যদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। হারমোনিয়ম, বাঁশী, বেহালা ইত্যাদি বাজছে।

সতীশ। সত্যি শরৎকে যে আবার আমাদের কাছে পাবো এ ভাবতেই পারি নি।

রাজেন্দ্র। সত্যি! এটা একটা অভাবনীয় ঘটনা।

সতীশ। আরে, এই—এই! আর আড্ডা দিতে হবে না। আজ বাদে কাল প্লে—এখনও আড্ডা দিচ্ছে। জাননা, উকীল চন্দ্রশেখর সরকার যা তা লোক নন। ভাগলপুরের বিখ্যাত আইনজীবী। তাঁর বাড়ীতে প্লে খারাপ হলে রক্ষে থাকবে না!

রাজেন্দ্র। আর আদবপুর ক্লাবের মুখ একেবারে ডুবে যাবে।

সতীশ। শরৎ! ঐ সিন্‌টা একবার ঝালিয়ে নাও তো ভাই।

শরৎ। কোন্ সিনটা?

সতীশ। ঐ যে চিন্তামণির যেখানে হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটছে।

শরৎ। বেশ, প্রম্পট!

সতীশ। না, আজ বাদে কাল প্লে প্রম্পট আর হবে না!

শরৎ। আহা, মুখটা একটু ধরিয়ে দাও।

প্রম্পটার। হরি কি আমার মতন পাপীয়সীকে কৃপা করবেন—

শরৎ। (চিন্তামণির ভূমিকায় অভিনয় সুরু করে) "হরি কি আমার মতন পাপীয়সীকে কৃপা করবেন। শুনেছি, তিনি প্রেমময়; আমি প্রেমহীন বেশ্যা, আমি প্রেম কখনও দিতে জানি নি, প্রেম কখনও নিতেও জানি নি, আমি হরি প্রেম পেলেও ত নিতে পারব না, আমার বেশ্যার চক্ষে ত কখনও প্রেম দেখি নি। কিন্তু থাকি, আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে হয়; আমি কি বরাবরই এমনি? না, পুড়ে পুড়ে কয়লা হয়ে আছি? আমার প্রাণে কত সাধ ছিল, সে সব কোথায়? অনেককে অনেক দাগা দিয়েছি; ভগবান, আমি দাগা পাই নি। সে আমাকে তার সর্বস্ব ভেবেছিল, শেষ দেখলে, কালসাপিনী! সে প্রেম জানে—প্রেমময়ের কৃপা পাবে; আমার প্রাণ মরুভূমি—মরুভূমিই থাকবে!

থাক। (একজন সদস্য বলে) সকলই কেমন বাড়াবাড়ি! মানুষ গেছে, গুণগান কর, অন্য মানুষ দেখ্। আমি বাপু আর পারি নি।

শরৎ। হ্যাঁ থাকি, সে পাগলিনীর খবর নিয়েছিলি?

থাক। ও একটা গেরস্থর বৌ, বাপ মা কেউ ছিল না; মাসী মানুষ করেছিল, বিয়ে দিয়েছিল, বিয়ের রাত্তিরেই ভাতার ছোড়া মরে গেল; তারপর মাগী পাগল হ'য়েছে।

চিন্তা। (শরৎ) তুই কি করে জানলি?

থাক। ওমা! আমি জানি নি? আমার বাড়ীর কাছে। ও অমনি বেড়াত; ওর দেওরগুলো ধরে নে গে মারত। এই নাও সেই পাগলী আস্‌চে।

সতীশ। রাজু প্রস্তুত হও! হারমোনিয়মে সুর দাও—মিউজিক রেডি—

চিন্তা। এও সামান্য পাগলী নয়; 'একেও দাগা দে' ভগবান গৃহত্যাগী ক'রেছে। (পাগলিনীর প্রবেশ। এবং রাজেন্দ্র পাগলিনীর ভূমিকায় অভিনয় সুরু করে)

পাগলিনী। মা, তুই ভাবিস্ নি, তোকে হরি কৃপা করবেন! সে সকলকে কৃপা করে, আমার ওপর বড় নির্দ্দয়। ওমা, লজ্জা করে মা—লজ্জা করে; সে আমায় দেখতে পারে না! (সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বেজে ওঠে। রাজেন্দ্র গান শুরু করে) "আমায় বড় দেয় দাগা। / সারারাত কি পাগলা নিয়ে যায় গো মা, জাগা?" ইত্যাদি।

চিন্তা। মাগো, তুই কে? তুই সাক্ষাৎ জগদম্বা?

পাগ। হ্যাঁ, মা—আমি সেই অভাগী মা—সেই অভাগী। দেখ না মা, সব সেই—সব সেই! কিছু বলিস্ নি, মা; চুপ করে থাক; লজ্জা করে—লজ্জা করে।

চিন্তা। মা, তুমি কি বল? তোমার কথা শুনে আমার আপাদ-মস্তক কাঁপে; মা, তুই কে?

পাগ। আমি মা, পাগলীদের মেয়ে; আমি, মা, তোর মেয়ে; তুই ও পাগলী মা, আমিও পাগলী মা।

চিন্তা। "(স্বগত) কেন রে পাষাণ হৃদি……(প্রকাশ্যে) কে তুমি মা পাগলিনী?„

সকলে। (উচ্ছ্বাসে) বাহ-বা! চমৎকার!

(১০)

মাঠের মাঝে গাছের তলায় সাহিত্য সভা বসেছে। বাতাসের দমকা আওয়াজ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।

সুরেন। সত্যি, শরৎ যেখেনে, সাক্ষাৎ জয়লক্ষ্মীও সেখেনে—

যোগেশ। প্রতিভা বলতে হবে—

সুরেন। সেদিন চিন্তামণির ভূমিকায় কি অভিনয়টাই না করলে—পাড়ার বুড়োবুড়ীরা তো কেঁদে কূল পায় না।

যোগেশ। সত্যি, আর পাগলামো করতে হবে না। যে কাজে এসেছ—আলোচনা শুরু কর।

সুরেন। কিন্তু, এখন ত সবাই এসে হাজির হলো না।

শরৎ। তাহ'লেও প্রাথমিক কাজটা আমরা শেষ করে রাখতে পারি।— উপেনমামার কলকাতার ভবানীপুরের পত্রিকা "তরণী" আর "আমাদের ছায়া"।

যোগেশ। তুলনা হয় না—তুলনা হয় না।

সুরেন। ওই জন্যেই ত বললাম—শরৎ যেখেনে,—জয়লক্ষ্মীও সেখেনে—আমাদের "ছায়া"র সঙ্গে উপেনদার "তরণী"র তুলনা—হা-হা-হা!

যোগেশ। যাচ্ছে তাই—যাচ্ছে তাই পত্রিকা। most বাজে পত্রিকা!

শরৎ। সত্যি, আমাদের "ছায়া" গিরীনের অঙ্গুলি-যন্ত্রে যে অলঙ্কার পেয়েছে এমনটি আর কোন পত্রিকায় পাবে না।

সুরেন। কিন্তু নিরুদির কোন লেখা তো এখনও এসে পৌছল না!

যোগেশ। সত্যিই তো—নিরুদির লেখা!

শরৎ। যাক্, বিভূতি ভট্ট মশায়ের লেখাটা এবারের "ছায়া"তে অবশ্যই প্রকাশ হচ্ছে তো গিরীন ?

গিরীন। অবশ্যই! কিন্তু এখনও কেউ আসছে না কেন ?

যোগেশ। আজ সভা বসতে অনেক দেরী হ'য়ে গেছে বরং আর একদিন—

শরৎ। না—না, অন্ততঃ আজ যারা জমায়েত হয়েছি—অবশ্য সবাইয়ের যদি মত থাকে—

গিরীন। সত্যিই, আজ বেশ দেরী হয়ে গেছে।

স্বরেন। হ্যাঁ, গুরুজনদের উষ্মা, অকারণ না বাড়ানই ভাল—বরং দু' এক দিনের মধ্যেই আর একটা সভার আয়োজন করলেই হবে। আজ আবার জগদ্ধাত্রী পূজোর একটা ঝঞ্ঝাট রয়েছে। শরৎ ওখেনে একটু ব্যস্ত থাকবে। দাদা ওকেই আবার ব্রাহ্মণ ভোজনে পরিবেশনের দায়িত্ব দিয়েছেন।

সকলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল! দু'একদিন পরে সভা ডাকলেই হবে।

শরৎ। বেশ, তাহলে আজকের মত আমাকে সভাপতির দায়িত্ব থেকে রেহাই দাও,—সভা এখানেই শেষ।

(১১)

ভাগলপুর। গাংগুলী বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখ। জগদ্ধাত্রী পুজার ধুমধাম। কোলাহল ও বাদ্য। তারই মধ্যে পণ্ডিত মণ্ডলীর উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা।

১ম। না-না, এ অনাচার আমরা কিছুতেই সহ্য করব না! হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে—একটা অনাচারী ম্লেচ্ছের ছোঁয়া আহার করতে হবে ?

২য়। আহা-হা ভট্টাচার্য—

ভট্টা। যথার্থই যদি আমি নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে থাকি—

২য়। আহা-হা, করেন কি—করেন কি ভট্টাচার্য মশাই মায়ের শুভাগমন আজ বাড়ীতে—আপনারাও খাঁটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

সকলে। সেই জন্যেই আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক!

৩য়। একটু ধৈর্য ধরুন, আমি ছোট বাবুকে সংবাদ দিচ্ছি,—এই তো ছোটবাবু এসেই গেছেন।

বিপ্রদাস। ব্যাপার কি ?—এত গণ্ডগোল কিসের ?

ভট্টা। বলি শোন কথা, আমরা সবাই ব্রাহ্মণ সন্তান—নৈকষ্য কুলীন। সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষণ ও পালন আমাদের হাতে—বলো না হে আচার্যি—

আচার্য। অবশ্যই—যথা কথা।

ভট্টাচার্য। এ্যাই, তার ওপর সমাজের সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমাদেরই স্কন্ধে। তার ওপর আপনারা হচ্ছেন প্রধান সমাজপতি।

আচার্য। যথার্থ।

ভট্টা। আপনারই বাড়ীতে এতবড় সমারোহ কাজ আর আমরা জেনে শুনে—

সকলে। এঁ—হেঁ—হেঁ!

বিপ্রদাস। আহা-হা, খুলেই বল না কি বলতে চাও?

ভট্টাচার্য। ব্যাপারটা হচ্ছে কি—আজকের এই জগদ্ধাত্রীমায়ের শুভ আরাধনার দিনে, ন্যাড়া যদি স্বহস্তে পরিবেশন করে—

আচার্য। ব্যাপারটা—মানে, ন্যাড়া তো দিনরাত ওই বিলেত ফেরতা শিব বাঁড়ুর্যের বাড়ীতে থাকে বল্লেই চলে। সেখেনে অখাদ্য, কুখাদ্য মানে—মুর্গিটা আশটা—

সকলে। ইস রামচন্দর—রামচন্দর!

ভট্টাচার্য! আমি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করলাম,—জাত নেই অজাত নেই কারও পরিবারের সৎকার্য—বিনা দ্বিধায় চলে গেল ন্যাড়া বাপধন। ও সমাজ·সমাজপতি মানে না—

বিপ্রদাস। বুঝেছি, এই, ন্যাড়াকে ডাক একবার।

আচার্য। মানে—আপন ভাগ্নে—একান্ত পরম আত্মীয়, তাকে বর্জন না করে বরং আমরাই আজ উঠি—

বিপ্রদাস। না—না, আপনাদের মান আমি প্রাণ দিয়েও রাখবো পণ্ডিতমণ্ডলী!

শরৎ। আমাকে ডেকেছেন মামা?

বিপ্রদাস। হ্যাঁ, তোমাকে!

শরৎ। সমস্ত তৈরী হয়ে গেছে মামা, আপনারা আসুন। আমি এখনি আপনাদের পরিবেশন করছি।

সকলে। ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা!

ভট্টাচার্য। মা, জগত্তারিণী রক্ষে কর মা!

শরৎ। মামা!

বিপ্রদাস। না, তুমি আর এঁদের খাবার পরিবেশন করতে পাবে না। এই কে আছিস, সমস্ত খাবার ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে রান্না চাপাতে বল। ......আপনারা একটু অপেক্ষা করুন পণ্ডিতমণ্ডলী।

(শেষাংশ ১৬৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

৮

শরৎচন্দ্র ও বাঙালী সমাজ

নুরজাহান বেগম

দিগন্ত প্রসারী জয় কেতন উড়িয়ে বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যে এক দিক্‌পালরূপে আবির্ভাব শরৎচন্দ্রের। সর্বদেশে সর্বকালে সমাজ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বাঙলার সমাজ সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। সব সাহিত্যিকই স্ব স্ব দৃষ্টি কোণ থেকে সমাজকে নিরীক্ষণ করেন। কালে কালে যুগের বিবর্তনে সমাজের রূপ পালটায় সে সাথে পালটায় সাহিত্যের রূপও। বাংলা সাহিত্যে চর্যায় পাই আদিযুগের সামাজিক রূপ। মধ্য যুগের সাহিত্যে পাই তৎকালীন সামাজিকরূপ এবং আধুনিক সাহিত্যে বাংলার সমাজ আদি ও মধ্যযুগ থেকে অনেক সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। কারণ গতিশীল পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে বিবর্তনশীল সমাজ সামনের দিকে এগিয়ে চলে। এজন্যই এক যুগে প্রচলিত সমাজ সংস্কার রীতিনীতি অন্যযুগে অন্যায় কুসংস্কার বলে অভিহিত হয়। সনাতনপন্থীরা শাস্ত্র ও সংস্কারের নামে এ অন্যায় ও কুসংস্কারকে সমাজের মধ্যে জোর করে টিকিয়ে রাখতে চান। সমাজের এ বিসদৃশরূপ গভীরভাবে অনুধাবন করে বাঙালী সমাজ সম্পর্কে সাহিত্যিকদের মনে জেগে ওঠে বিরাট জিজ্ঞাসা। এ জিজ্ঞাসা আমরা সর্বপ্রথম দেখি শরৎচন্দ্রের মধ্যে।

কয়েকশত বৎসরের প্রাচীন ঘুণে ধরা বাঙালী সমাজের পাপের ফল, পুঁতিগন্ধময় বাঙালী সংস্কার, প্রাণহীন সমাজের মিথ্যাচার কেমন করে মানুষকে অক্টোপাশে বেঁধে রাখে তার মর্মান্তিক পরিচয় ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র শরৎচন্দ্রই সর্ব্ব প্রথম তুলে ধরলেন। এজন্য তাঁকে সমাজের কাছ থেকে আঘাত পেতে হয়েছে, সম্মুখীন হতে হয়েছে বিরাট জিজ্ঞাসার। কিন্তু তাতে তিনি বিচলিত হননি। তিনি জানেন কয়েকশত বৎসর পর্যন্ত সমাজ এক অন্ধকূপে বাস করছে, তাদের দেখাতে হবে আলোর বর্তিকা। আর সে আলোর দিশারী হয়েই তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন।

যে সমাজ প্রাণের আলো থেকে সরে এসে নিরেট বিকারে পরিণত

হচ্ছে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"জীবনের পরিবর্তন বিকাশ, মৃত্যুর পরিবর্তন বিকার। আমাদের সমাজেও দ্রুতবেগে পরিবর্তন চলিতেছে, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সচেতন অন্তঃকরণ নাই বলিয়া সে পরিবর্তন বিকার ও বিশ্লেষণের দিকে যাইতেছে কেহ তাহা ঠেকাইতে পারিতেছেন না।"

বৈচিত্র্যহীন ব্যাপ্তিহীন এ বাঙালী সমাজ সঙ্কীর্ণমণ্ডলের শান্ত স্নিগ্ধ মায়া মমতা, সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্খা, হতাশা-নিরাশাসহ নিজ পরিমণ্ডলেই টিকে আছে। এ সমাজের নরনারীদের দুচোখ খুলে বাইরের দিকে তাকানোর অধিকার নেই। যদি কেউ তা করতে যায় তাহলে তারা হয় হবে পাপী আর না হয় সমাজচ্যুত। সনাতনপন্থীদের মতে এ হলো সমাজের কল্যাণও মহত্ত্ব স্বরূপ। আর প্রগতিশীলদের মতে এ হলো সমাজের দুর্বলতা ও অন্যায়। মহত্ত্ব, কল্যাণ আর দুর্বলতা যাই হোক একে নিয়েই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টি।

বাঙালী সমাজ জীবনের যে চিত্র শরৎচন্দ্র অঙ্কিত করেছেন তার এক দিকে রয়েছে স্বাভাবিক নরনারী অন্যদিকে নরনারীর অতৃপ্ত যৌন জীবন, এক দিকে রয়েছে ভবঘুরে, ছন্নছাড়া, দুর্বল কাপুরুষের দল অন্যদিকে নিষিদ্ধ প্রেম, সামাজিক বৈষম্য, কুসংস্কার, কপট ভদ্রতা, এক দিকে রয়েছে নিষ্ঠুরতা অপরদিকে কোমলতা। সমাজের এসব রূপ শরৎচন্দ্র এত উজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করেছেন যে কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি থেকে বাদ যায় নি। তার বড় কারণ "তিনি বাঙালী, বাঙালী সমাজের মানুষ" বাঙালী জীবনই তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য।"

শরৎচন্দ্রের সমাজ চিত্রের সাথে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের তুলনা করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র অসামাজিক প্রেমকে তাঁর উপন্যাসে পুর্ণমুল্যায়ণ করেছেন আবেগ নয় যুক্তির ওপর নির্ভর করে এবং এ করতে গিয়ে সমাজ রক্ষার দায়িত্বকে পালন করেছেন শিল্পকলার তুলনায় অনেক বেশী। অসামাজিক জৈবিক কামনা বাসনাকে ধিক্কৃত করে সুস্থ আদর্শমণ্ডিত মানবধর্মের জয় ঘোষণা করেছেন। প্রচলিত সামাজিক বিধি বিধান অনুযায়ী নরনারীকে বিবেচনা করে সাজানোর আগ্রহ নিঃসন্দেহে সুচিত হয়েছে, বিধবা রোহিনীর হৃদয়ের আকাঙ্খা পরিণতিতে হত্যা, কুন্দনন্দিনীর সস্নিগ্ধ চিত্রনে পরিণতিতে আত্মহত্যা, দস্যু অপহৃতা ইন্দিরার বহু বছর পর স্বামীর সহিত মিলন, পরস্ত্রী শৈবলিনী প্রেমিকের সাথে মিলিত হওয়ার দুর্জয় অভিযান পরিণতিতে

স্বামীর সহিত মিলিত হওয়ায় মধ্যে বঙ্কিমের যুক্তিমূলক ও বিবেচিত মনের পরিচয় মিলে।

রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি উপন্যাসে বিশেষতঃ 'গোরা' 'চোখের বালি' 'ঘরে-বাইরে' প্রভৃতিতে প্রচলিত রীতিনীতির মূল্যায়ণের চেষ্টা করেছেন। সামাজিক অন্যায়, অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন, ধিক্কার দিয়েছেন প্রাচীন সংস্কারের বৈষম্যকে। রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে যত উদার এবং গভীর প্রেমের প্রকাশ দেখান না কেন-সমাজ বির্গহিত প্রেমে বা বিবাহে যে কোনো কল্যাণ থাকতে পারে না রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রে তা কও স্বীকার করে নিয়েছেন। বিনোদিনীকে বিহারী বিয়ে করতে রাজী হওয়া সত্ত্বেও বিনোদিনীকে বিহারীর কাছ থেকে সরিয়ে দূরে কাশী পাঠিয়ে দিলেন। রমেশের সাথে কমলা বহুদিন একসাথে ঘনিষ্ঠভাবে থাকা সত্ত্বেও বিয়ে হল না, বিয়ে হল সামাজিক সংস্কার অনুযায়ী নলিনাক্ষির সাথে। সন্দীপের সাথে বিমলার গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠলেও শেষ পর্যন্ত স্বামী নিখিলেশের সাথে বিমলার মিলন হল। এভাবে রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থলে বাঙলার সমাজকে স্বীকার করে নিয়েছেন। "রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যে আধুনিকতার অগ্রগামী, আর শরৎচন্দ্র হচ্ছেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য।" বাঙালী সমাজ ও জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যত প্রভাবই শরৎচন্দ্রের ওপর পতিত হোক রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু চরিত্র এমন অবাস্তব যে তাদের এ মাটির পৃথিবীর বাইরে সম্পূর্ণ অন্য জগতের বলে প্রতিভাত হয়। এ ছাড়া চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে একটা আদর্শ ও ব্যাপ্তি। আর শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলো রসরস গন্ধে ভরা এ মাটির পৃথিবীর একেবারে নিরেট বাস্তব। শরৎচন্দ্রের মূল লক্ষ্য একটা দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে তার সামাজিক সত্তার বাস্তব ও সজীব রূপ দিয়ে একটা জাতীয় ভাবকে তুলে ধরা।

শরৎচন্দ্র অসামাজিক প্রেমগুলো এঁকেছেন উজ্জ্বল ও জীবন্ত করে তবে সাফল্য দেখিয়েছেন খুব কম ক্ষেত্রেই। প্রেমের এ অসাফল্য এগিয়ে গেছে একটা দুঃখময় পরিণতির দিকে। শরৎচন্দ্র সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে বুঝলেন সমাজ এক বিরাট শক্তির আধার এবং সে শক্তির কাছে ব্যক্তির শক্তি নিতান্ত তুচ্ছ। এ ব্যক্তি শক্তি শেষ পর্যন্ত বিরাট সমাজ শক্তির কাছে পরাজিত হয় অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বে সমাজেরই জয় ঘটে। এবং যে প্রেম ভালবাসার সমাজের স্বীকৃতি নেই—অর্থাৎ অসামাজিক প্রেমের

সাকল্য শরৎচন্দ্র সমাজের মধ্যে অবলোকন করেননি। পরিবেশের শিকার হয়ে মানুষ অন্যায় করে, ভুল করে, করে পাপ এর ফলে তাদের ভাগ্যে ঘটে নির্মম অত্যাচার ও অপমান। সমাজের চোখে কেউ হয় পতিতা, কেউ লাঞ্ছিতা। শাস্ত্রাচার রক্ষার নামে বাঙালী সমাজের এরূপ দেখে তাঁর মন করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠেছে এবং নিভৃত হৃদয়ের স্পর্শে এ সমস্ত অসামাজিক ব্যর্থ প্রেমের চিত্রগুলো স্পন্দিত ও সজীব করে সৃষ্টি করলেন। এ ছাড়া সমাজের বহুবিধ সমস্যার প্রসঙ্গ যেখানে টেনেছেন সেখানে শুধু সমস্যার কথাই তুলে ধরেছেন সমাধান করেননি। কারণ তিনি নিজে সামাজিক মানুষ। সমাজের সাথে সম্পর্ক আছে। তাই সমাজের দোষ ত্রুটি সমাজকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কোনো সংস্কার বা সমাধান করেননি। কারণ তিনি সমাজ সমালোচক, সমাজ সংস্কারক নন। সমাজকে আঘাত দিয়ে চরম কিছু করা তাঁর ধর্ম নয়। তাই আমরা দেখি দেবদাস-পার্বতীর বিয়ে হল না, এমন কি জীবনের শেষ প্রান্তেও পার্বতীকে দেখার তীব্র বাসনাটুকুও সফল হল না। দেবদাস মরল পরস্ত্রী পার্বতীর বাড়ীর কাছে এক অজ্ঞাত পথিকরূপে। রমার সাথে রমেশের বিয়ে হল না। এমনকি তাদের কাছাকাছি রাখতেও ভয় পেলেন শরৎচন্দ্র। তাই রমাকে রমেশের কাছ থেকে দূরে কাশীতে পাঠিয়ে দিলেন। অচলাকে হরণ করেও সুরেশ বাঁচলো না, মরল। তারপর অচলা আবার স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ালো। এ ধরণের সমাজ চেতনা শরৎচন্দ্রের মধ্যে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে কিন্তু পরোক্ষভাবে ইঙ্গিতে সমাজের প্রতি রয়েছে তীব্র ব্যঙ্গ। যাদের নিয়ে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টি এবং যাদের কেন্দ্র করে সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে হুমায়ুন কবির বলেছেন—"কোনো বিদেশীর পক্ষে তাদের অন্তরের সন্ধান পাওয়া শক্ত যদি সেটা তার পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে বাঙালীর জীবনের ও চরিত্রের গুরুত্ব তার কাছে সর্ব রকমে উদ্‌ঘাটিত হবে।" সামাজিক গুরুত্ব এবং সমাজ চেতনাই শরৎচন্দ্রকে মানবতার শীর্ষে স্থান দিয়েছে।

মানুষের জন্য এবং মানুষের প্রয়োজনেই সমাজের কাঠামো পরিবর্তিত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, প্রথম মহাযুদ্ধ, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার সমাজ সহ সমগ্র পৃথিবীতে বিরাট আলোড়ন তুললো—এ আলোড়নে সাধারণ মানুষ মুক্তির

জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো এবং সমগ্র বিশ্বের সাথে বাংলার মানুষ নৈকট্য লাভের সুযোগ পেল। বাংলার নারী সমাজ চার দেয়ালের মাঝে চিরদিনই কূপমণ্ডূকতার জীবন যাপন করত। কাজেই এ আলোড়ন সমাজকে মুখর ও চঞ্চল করে তুললেও নারী জাতিকে খুব একটা জাগরিত করতে পারেনি। বাংলার নারীরা অশেষ দুঃখভোগ করেও আত্মসমর্পণ করে বা করতে চায়। এ দুঃখভোগ আর আত্মসমর্পনের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের প্রতিবাদ, বিদ্রুপ আর বিদ্রোহের সুর শোনা যায়। প্রচলিত সমাজনীতির বাস্তবতার নিরিখে নারী-জাতিকে অঙ্কিত করেছেন বলে বিদ্রোহের প্রচণ্ডতা তেমন করে ফুটেনি। তবে এ বিদ্রোহের রূপ আমরা দেখি অভয়া ও কিরণময়ীর মধ্যে। স্বামী লাঞ্ছিতা অভয়া স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে প্রেমিককে অবলম্বন করে বেঁচে থাকবে বলে স্থির করল। বিধবা কিরণময়ী প্রেমাস্পদ উপেন্দ্রর ওপর প্রতিশোধ নিয়ে উচুঁ মাথা নীচু করার জন্য বালক দিবাকরকে নিয়ে পাড়ি জমালো আরাকানে।

বাঙালীর সমাজজীবনের অবক্ষয়ের রূপ দেখেছেন শরৎচন্দ্র। কর্মজীবনে দেখেছেন বাঙালী পুরুষের উৎসাহহীনতা, কর্মবিমুখতা, ও নিস্ক্রিয়তা, বিশৃঙ্খল আত্মকেন্দ্রিক সমাজ পরিবেশে সক্রিয়, বলিষ্ঠ, আদর্শবান পুরুষ চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই শরৎচন্দ্রের পুরুষ চরিত্রগুলোর মধ্যেও সমকালীন যুগের প্রতিফলন ঘটেছে। তারা প্রায় সবাই নিস্ক্রিয়, গতিহীন। তবে বীর, সবল, সক্রিয় চরিত্র একেবারে নেই তা নয়, কিছু কিছু পাওয়া যায়। সুরেশ, জীবানন্দের মত উজ্জ্বল, চঞ্চল, জীবন্ত পুরুষ চরিত্র শরৎ সাহিত্যে এক ব্যতিক্রম সৃষ্টি।

বাঙালী সমাজে যৌথ পরিবার প্রথা যুগ যুগ ধরেই প্রচলিত ছিল। কালের প্রবাহে ধীরে ধীরে যৌথ পরিবার প্রথায় ভাঙ্গন ধরল। মানুষ হয়ে উঠল স্বার্থপর, এক কেন্দ্রিক। বহুজন নয় একার চিন্তাই পেয়ে বসল মানুষকে। যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন শরৎচন্দ্রের মনকে আকুল করে তুললো—সে আকুলতা দিয়েই জোর করে রক্ষা করার চেষ্টা করলেন যৌথ পরিবারকে কয়েকটি গল্প উপন্যাসে।

বাংলা দেশ মুলতঃ জমিদার প্রথারই দেশ। এই জমিদারী ও ভূম্যধিকারীর পটভূমিতেই শরৎ সাহিত্য সৃষ্টি। জমিদার, জোতদার, ব্রাহ্মণকে এক শ্রেণীভুক্ত করে বাংলার সমাজের সঙ্গে এদের বাস্তব, নিখুঁত ও অকপট চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তাদের মানবিকতা, হীনতা প্রত্যক্ষদ্রষ্টা

শরৎচন্দ্রের হাতে অভিনব হয়ে উঠেছে।

বাংলার পল্লীর সমাজজীবন অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার শিকার হয়ে জড়তাগ্রস্থ, অভিশাপগ্রস্থ, গতিহীন জীবন যাপন করছে। তার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে সমাজের স্বার্থপর ধনীক শ্রেণী। এ অজ্ঞানতা অন্ধকার ও উন্নতির পথে বাধা দূর করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার। শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে বাংলার সমাজকে উন্নত করার উপদেশ শরৎচন্দ্র দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র অনুরাগের বশবর্তী হয়ে তীব্র ভাবাবেগের দ্বারা নতুনভাবে বাংলাদেশ, বাংলার সমাজ ও বাংলার মানুষকে অবলোকন করে এর কুটিলতা, পঙ্কিলতা দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখনীতে বাংলার সমাজ ও বাংলার মানুষ অনন্য সাধারণ হয়ে উঠেছে। তাঁর দরদী মনই তাঁকে বাঙালী সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।
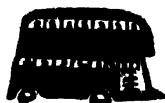
দেবদাসের প্রেম

রজত রায় চৌধুরী

সর্বকালের সেই শাশ্বত প্রশ্ন পুনর্বার উচ্চারণ করা যাক দেবদাস প্রসঙ্গে।

নরনারীর প্রেম সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার মূলে হৃদয়াবেগের প্রাধান্য অনস্বীকার্য, আবার রূপ-মোহ-আসক্তি-যৌণাকাঙ্খা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়নির্ভর প্রবৃত্তির প্রাবল্যও লক্ষণীয়। প্রেমতত্ত্বের সূত্রসন্ধানে আদর্শান্বিত ইন্দ্রিয়বর্জিত প্রেমধারণার কথাও অনুচ্চারিত থাকেনি বাংলা উপন্যাসে। কিন্তু উচ্ছ্বাস-বাহুল্যে ভারাক্রান্ত হৃদয়াবেগ নির্ভর প্রেমকাহিনীর টানাপোড়েনের মধ্যে দেবদাস-পার্বতী-চন্দ্রমুখীর প্রেমসম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার সঙ্গে একমত হতে পারা সম্ভব হয়নি বলেই সর্বকালের সেই শাশ্বত প্রশ্ন "প্রেম" নিয়ে পুনর্বার আলোচনার সূত্রপাত।

'দেবদাস' শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনা নয়। অথচ চন্দ্রমুখীর সঙ্গে সংলাপের ভেতর পরিণত চিন্তা, বোধ, প্রত্যয়, কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলেই বিশ্বাস। শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মীর প্রণয় সম্পর্কের মধ্যে খাদ নেই; কিন্তু শ্রীকান্ত সামাজিক মর্যাদার জন্যই পতিতা পিয়ারী বাঈজীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। তেমন প্রসঙ্গ দেবদাস, চন্দ্রমুখীর সংলাপেও বিধৃত। যেখানে দেবদাসের দাসী হয়ে প্রবাসের সঙ্গী হতে চেয়েছে চন্দ্রমুখী, সেখানে দেবদাস উত্তর দিয়েছে, "ছিঃ, তা হয় না। আর যাই করি, এতবড় নির্লজ্জ হতে পারব না।" অথচ এই দেবদাসই চন্দ্রমুখীকে বলেছিল যে সে তাকে ভালবাসে। এমন কি এমন উক্তিও করেছিল, "পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা তোমার কি বিচার করবেন জানিনে; কিন্তু মৃত্যুর পর যদি আবার মিলন হয়, তবে আমি কখনো তোমা হতে দূরে থাকতে পারব না।" —এমন উক্তি রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত প্রসঙ্গেও লক্ষণীয়। অর্থাৎ হৃদয় যাকে চায়, মন যা কামনা করে; সমাজ সেখানে বাধা দেয়। এই বিরোধ নিঃসন্দেহে ট্র্যাজিডির বিরোধ। এবং শরৎ সাহিত্যে রম-রমেশ যেমন,

তেমনভাবে পরিবেশিত না হলেও, বিরোধ তেমন সোচ্চার হয়ে না উঠলেও, —নীচু ঘর, অর্থনৈতিক ব্যবধান এবং পাশের বাড়ির কুটিলতা—এইসব প্রশ্নগুলো কি দেবদাস-পার্বতীর মিলনের আপাতঃ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি ?

অন্ততঃ পক্ষে এইটুকু প্রমাণ করা অসম্ভব নয় যে, যে সব ধ্যান ধারণা শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছিল, দেবদাসে তার বীজ সুস্পষ্টভাবেই চিত্রিত। রচনাটি অপরিণত বয়সের, অতএব এই উপন্যাসের প্রেম-সম্পর্কিত বোধটি, তার ভিত্তিস্বরূপ চরিত্রগুলি পরিণত রসবোধে, চেতনায়, চিন্তায়, প্রকাশে উত্তীর্ণ নয়, এমত ধারণা পূর্বাহ্নে করে নিয়ে বিশ্লেষণ করা বোধহয় বাঞ্ছনীয় নয়।

দেবদাসের জীবনেতিহাসে দুটি রমনীর উজ্জ্বল আবির্ভাব : পার্বতী ও চন্দ্রমুখী। মোটামুটিভাবে অধ্যায়ও দুটি : তালসোনাপুরে এবং কলকাতায়। বস্তুত, কলকাতায় আগমনের পুর্বে পার্বতরীই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। কিশোর কিশোরীর কলহাস্যে, কলহে, ক্রীড়া-কৌতুকে তা পরিপূর্ণ। এবং তখনই পার্বতীর প্রেম দানা বেঁধে উঠেছে। তার হৃদয়াকাশের সূর্য চিহ্নিত হয়ে গেছে চিরকালের জন্য। রাজলক্ষ্মীরও প্রণয়বিকাশ এমনই বালিকাবয়সেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসেছে চন্দ্রমুখী। এসেছে ঘৃণায়-বিতৃষ্ণায়-অবহেলায়। এইখানেই পরিবেশগত পার্থক্য প্রকট। গ্রামের দিগন্ত, নদীর তীর, বাঁশঝাড়, মাঠ, প্রান্তর, নিস্তব্ধ দুপুর, নিঃঝুম রাত এবং কোলাহলহীন তন্দ্রাচ্ছন্ন ঢিমেচালা জীবন পরিবেশ—আর এই পরিবেশেই পুকুর পাড়ে, নদীর তীরে, ছিপ নিয়ে মাছ ধরার জন্য বসে থাকায়, কলসী নিয়ে জল আনতে যাওয়ায়—প্রণয় দৃশ্য সংঘটিত। কিন্তু কোলাহল মুখর জনাকীর্ণ কলকাতায় এসে শরৎচন্দ্র অঙ্কন করলেন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন চিত্র। চন্দ্রমুখীর জীবনচর্চা নিন্দিত—সমাজবহির্ভূত। লোকালয়ে থেকেও সে লোকের বাহিরে। সেই কামনা-বাসনা-বিলাস-বিভ্রম প্রণয়াভিনয়ের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত দ্বিতীয় দৃশ্য। জীবন সেখানে মদে মা'তাল উজ্জ্বল, রঙিণ। যৌবন সেখানে যৌণসর্বস্বতা দিয়ে ভরা। ক্লেদাক্ত, পঙ্কিল তার পরিবেশ—তাই দিনের বেলায় কেউ সেখানে আসে না ; আসে রাত্রে। অন্ধকারের রক্তে-মাতাল ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে সে দেয় হাতছানি।

সুতরাং মনে হতে পারে এখানে প্রেমের কোন তুলনা ওঠা উচিত নয় ; পার্বতীর প্রেম স্বভাবের খাত বেয়ে প্রবাহিত, আর চন্দ্রমুখীর ঘরের

প্রেম তার বিকৃত পরিবেশের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। কিন্তু শরৎচন্দ্র পরিবেশের পার্থক্য আঁকলেও প্রেমের পার্থক্য আঁকেননি। নারীর প্রেম নারীরই—সে কুলেরই হোক আর পতিতালয়েরই হোক। তাই চন্দ্রমুখী বলতে পারে, "যে যথার্থ ভালবাসে, সে সহ্য করে থাকে।"

দেবদাসের জীবনে দুই নারী—পার্বতী ও চন্দ্রমুখী। পার্বতীর হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে পুরুষটি বিরাজিত—সে দেবদাস। চন্দ্রমুখীর হৃদয়াভ্যন্তরে যার মূর্তি অমলিন,—সে দেবদাস। পার্ব্বতী অন্যের ঘরণী, কিন্তু মনের মধ্যে সযত্নে লালিত দেবদাস। অপমানে-পীড়নেও তা উজ্জ্বল। লোকলজ্জা, অপবাদ, ভয়, কলঙ্ক—সব কিছুই পার্বতীর কাছে তুচ্ছ। কুমারীজীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য সে নিবেদন করতে উদ্‌গ্রীব ছিল, দেবদাসের কাছে। দেবদাস প্রত্যাখান করল। দোষটাই দিল মাতাপিতার। চিঠিতে জানাল "তোমাকে আমি যে বড় ভালবাসিতাম, তাহা আমার কোনদিন মনে হয় নাই—আজিও তোমার জন্য আমার অন্তরের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ বোধ করিতেছি না।" —মাতাপিতার অসম্মতি, নিচু ঘর—এসব অপমান পার্বতীর কাছে অপমান নয়। কিন্তু তার ভালবাসার অপমান সে সহ্য করতে পারেনি। তাই দেবদাস যখন পুনরায় বললে, মাতাপিতাকে সে সম্মত করাবার চেষ্টা করবে, তখন পার্বতী তাকেই প্রত্যাখান করল। কিন্তু পরবর্ত্তী প্রসঙ্গই জানিয়ে দেয়, পার্বতীর মনের কথা তা নয়। অভিমানাহত রমণীর বেদনার আর্তি সেদিন পার্ব্বতীর কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল। সব অপমান সহা যায়, সহা যায় না প্রেমের অপমান। কারণ প্রেমই পার্ব্বতীর জীবনের সর্ব্বস্ব ধন। প্রেমের বলেই সে বলী। তাই ধনরত্ন ঐশ্বর্য তার কাছে তুচ্ছ। তাই সাধারণ রমণীর যা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, সেই অলংকার তার কাছে অকিঞ্চিৎকর। হৃদয়ের প্রেমাবলেই তার পরিপূর্ণতা। প্রেমের এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আবাল্যলালিত প্রেমাস্পদের জন্য সমগ্র মনপ্রাণ সমর্পিত করে গৃহের নিত্যকর্ম সুশৃঙ্খলভাবে সমাধা করা। যে মুহূর্ত্তে সে মনোরমার পত্রে জানতে পেরেছে দেবদাসের নিন্দনীয় জীবনযাত্রার কথা—সেই মুহূর্ত্তে সে তার ভালবাসার ধনকে কাছে নিয়ে যাবার জন্য ছুটে এসেছে—ফিরিয়ে দিয়েছে তার নিয়তি। যে মুহূর্ত্তে সে শুনেছে দেবদাসের পিতৃবিয়োগের কথা—ছুটে এসেছে—কথা আদায় করেছে—বিপদে পড়লে, দেবদাসকে সেবা করবার সুযোগ সে যেন পায়।

অপর প্রান্তে চন্দ্রমুখী। ঘৃণা দিয়ে শুরু। সহনশীলতায়, ক্ষমায়-প্রেমে

সে পরিপূর্ণ। যে দেবদাস তাকে ঘৃণা করত, ছুঁতো না—সেই দেবদাস তার হাত ধরেছে, তাকে ভালবেসেছে। এবং সে যে পার্ব্বতীর চেয়েও বেশি জানে তার কথা, তা দেবদাসের জবানীতেই আমরা জানতে পেরেছি : "আমার কোন কথা তোমার জানা নেই ; এ বিষয়ে তুমি যে পার্ব্বতীরও বেশি।" পার্ব্বতীর চেয়ে চন্দ্রমুখী দেবদাসের কাছে বেশি—কারণ, পার্বতীর প্রতি "কর্তব্য আছে ত। ধর্মাধর্ম আছে ত"—আর চন্দ্রমুখী ! পরজন্মে তার প্রতি মিলন কামনা করেছে দেবদাস। শুধু তাই নয়। পার্বতীর কাছে দেবদাসকে পৌঁছতেই হবে—কারণ—(ক) পার্বতী তার জন্য দুঃখ পেয়েছে—এ ধারণায় দেবদাস সুনিশ্চিত। (খ) পার্বতীর কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছে, "যেমন করিয়া হৌক, একবার তাহাকে শেষ দেখা দিতেই হইবে।" —কিন্তু পরমুহূর্তেই জীবনের সেই অন্তিম প্রহরে দেবদাসের অশ্রুসজল হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েছে জননীর পাশে চন্দ্রমুখীর স্নেহকোমল নিরতিশয় পবিত্র মুখ। ঘৃণা, প্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছে। চন্দ্রমুখীর প্রেম হয়েছে জয়ী। অপবিত্র থেকে সে পবিত্রতায়, ঘৃণা থেকে প্রেমে, অভিনয় থেকে বাস্তবে, মুখোস থেকে মুখশ্রীতে সে রূপান্তরিত। চন্দ্রমুখীর প্রেমকে মহিমামণ্ডিত করে গেল দেবদাস। কিন্তু পার্বতী। তার প্রতি কঠোর কর্তব্যবোধ, প্রতিশ্রুতি পালন।

দেবদাস ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় উদভ্রান্ত পথিক— এ কথা মানা শক্ত। যে ছোটবেলা থেকেই সমস্ত শাসনের অতীত, প্রেমের ক্ষেত্রে সুবোধ বালকের মতন মাতাপিতার অমত, নিচু ঘর প্রভৃতি মেনে নিয়ে দেশান্তরী হল—এ কথা স্বীকার করা তার মতন দুর্বিনীত, বেপরোয়া মানুষের ক্ষেত্রে স্বীকার্য নয়। যদি বলা যায়, তার সমস্ত প্রতাপ, কেবলমাত্র ঐ নিরীহ বালিকাটির ওপর— তাহলেও দেবদাসকে ছোট করা হয়। আসলে দেবদাসের চরিত্রে রক্ষণশীল শরৎচন্দ্র বিরাজ করেছেন। তাই রূপসী পার্বতীর আত্মনিবেদনে সে সাড়া দেয়নি। কিন্তু প্রশ্ন হল, ভালবাসার। সে যদি যথার্থ প্রেমিক হত, পার্ব্বতীকে ফিরিয়ে দিতে পারত কি বারংবার ! প্রেম যদি তার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ধ্রুব জ্যোতিতে বিরাজিত হত, পার্ব্বতীর প্রেমকে সে অসম্মান করতে পারত কি ? প্রেমের বেদনায় সে মদ ধরেছিল ? চন্দ্রমুখীর কাছে গিয়েছিল ? আমাদের মনে হয়, প্রেমের বেদনায় নয়; পার্ব্বতী যে সারা জীবনে তারই জন্য দুঃখ পাবে, সেই অনুশোচনার গ্লানির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই তার মদ্যপান, পতিতালয়ে গমন। যখন জীবনের পালা সাঙ্গ হবার দিন সমাগত, তখন বোম্বাই হাসপাতাল

থেকে বেরিয়ে এসে তার মনে হয়েছে। "তাহার মা আছেন, বড় ভাই আছেন, ভগিনীর অধিক পার্ব্বতী আছে—চন্দ্রমুখীও আছে।" মনের মধ্যে পার্ব্বতী-চন্দ্রমুখীর অবস্থান নির্ণয়ে কখনও পার্ব্বতী, কখনও চন্দ্রমুখী আবর্তিত হলেও, জীবনের প্রত্যন্ত সীমায় উপনীত দেবদাসের হৃদয়াকাশে পার্ব্বতী ভগিনীর অধিক। কিন্তু চন্দ্রমুখী স্বকীয় ক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল। সে তার আদরের বৌ।

পার্বতী ও চন্দ্রমুখী দুজনেই গভীরভাবে ভালবেসেছে দেবদাসকে। কিন্তু দেবদাস গভীরভাবে ভালবাসল কাকে? এ কথা যখন দেবদাস বুঝল, পার্বতী তার জন্যই সারাজীবন দুঃখ পাবে, তখন এক বিচিত্র অনুভূতির বেদনায় তার চিত্ত ভারাক্রান্ত হল। যেন একটা অপরাধ বোধ—আমার জন্যই মেয়েটার জীবন বিনষ্ট হয়ে গেল। আর চন্দ্রমুখীকে সে ঘৃণা থেকে মুক্তি দিয়েছে প্রেমে। পার্বতীতে অপরাধ-বোধ থেকে কর্তব্যবোধে, দেবদাস উত্তীর্ণ। কিন্তু চন্দ্রমুখীতে ঘৃণা থেকে প্রেম। পার্বতীর গৃহপ্রান্তে পৌঁছেও সে তার সাক্ষাৎ পায়নি। পার্বতীর জীবনে এ ট্র্যাজিডি ঘটেছে বারংবার। কিন্তু চন্দ্রমুখী পেয়েছে সেবার অধিকার, ঘৃণিত জীবন থেকে সে মুক্তি পেয়েছে দেবদাসের ভালবাসায় কিংবা দেবদাসকে ভালবেসে।

শেষ প্রশ্নের প্রশ্ন

লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

'শেষপ্রশ্ন' 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ কালেই (১৩৩৪-৩৫) পাঠক সমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রায় পঞ্চাশ পার হতে চলল, কিন্তু সেদিনের প্রশ্ন এদিনেও প্রশ্নই রয়ে গেছে। প্রশ্নটা এমনিতেই গুরুত্বপূর্ণ, তার উপরে শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে তুলে ধরাতে শরৎ মানসের বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বংশ গৌরব, প্রাচীন আদর্শ এবং সংস্কার সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। ঔপন্যাসিক তাঁর বিশ্বাসকে যুক্তি-তর্ক, ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর উপন্যাসে। কমলকে দিয়ে আপনার মতবাদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অন্যত্র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শরৎচন্দ্র বলেছেন, "বংশের কোন গৌরবই আমি রাখিনা। তার পরিচয় দিয়ে কি হবে? পুরান জিনিষের গৌরব করে আমাদের কিছু হবে না। যাঁরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস মাটি খুঁড়ে বার কচ্ছেন আর বলছেন—এই দেখ আমাদের এই ছিল, ঐ ছিল, আমি তাঁদের কথায় খুশী হই না। আমাদের বুক তাতে ফুলে ওঠে না। আমি বলি, আমাদের কিছুই ছিল না। আমাদের যা দরকার আমরা তা গড়ে নেব। মানুষ এখন এগিয়ে যাচ্ছে, নিজের জোরে সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে নিচ্ছে। দু'হাজার বছর আগে আমাদের কি ছিল, পাথর খুঁড়ে বার করে তা শুনিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই। নিজের গৌরব কিসে হয়, তাই ভাল করে গড়ে তোল। জাতের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে, নাই বা থাকল জাত—নিজের জোরে প্রতিষ্ঠা করে নাও। নাই বা থাকল কিছু বংশ পরিচয়। নিজে সাকসেশফুল, সার্থক জীবন হবার চেষ্টা করো। আমার 'শেষ প্রশ্নে' আমি এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আমাদের যা কিছু বর্তমানে চলছে তার অনেক কিছুর উপরে কটাক্ষও আছে, আঘাতও আছে।..." বলাবাহুল্য, লেখকের এই মতবাদ কমলকে আশ্রয় করেই প্রকাশ পেয়েছে শেষ প্রশ্নে। সাহিত্যের সমাজে কমল বিদ্রোহিনী নায়িকা। কমলের জীবন আমাদের সনাতন সমাজে এক জলন্ত জিজ্ঞাসা। কেবলমাত্র বংশগৌরবহীনাই নয়,

জন্ম পরিচয়েও কমল কলঙ্কিতা। চা বাগানের বড় সাহেবের বাঙ্গালী বিধবা রক্ষিতার মেয়ে সে। বংশের কোন গৌরবই লেখক তাকে দেন নি। আর প্রতিষ্ঠা? নিজের জোরেই সে সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। শিবনাথ, সতীশ, রাজেন, অক্ষয়, মনোরমা, মালিনী, নীলিমা সকলের মধ্যমণি বিদ্রোহিনী বিধবা ক্রীশ্চান বধূ কমল। শিবনাথ তার শিবানীকে ত্যাগ করে অপরের বাগদত্তাকে বিয়ে করল, আর কমল অম্লান বদনে তাতে সম্মতি দিল। শিবনাথের নব পরিনীতা মনোরমার এককালের প্রণয় অজিতের জীবন সঙ্গিনী হতেও বাধল না কমলের। সংস্কার এবং সমাজ শাসনের হাত থেকে মুক্ত এ ধরণের পরিমণ্ডল রক্ষণশীলবাতো নয়ই, অতি প্রগতিশীল কেহও সহজে কল্পনা করতে পারবেন না। কেবল কমলের কথাই নয়, শিবনাথ ও অজিতের প্রেম প্রণয়ও অতিপ্রগতিবাদীদেরও লজ্জা দেবে।

শরৎচন্দ্র প্রগতিশীল। কিন্তু তাঁর এই প্রগতিশীলতা আমাদের সমাজ, ধর্ম, সংস্কার এবং আদর্শের দেউলে সাংঘাতিক রকমের ধাক্কা দিয়েছে। পাঠক এবং সমালোচকের নিন্দা প্রশংসা দুইই জুটেছে শেষপ্রশ্নের ভাগ্যে। শেষপ্রশ্ন শরৎচন্দ্রের বহু নিন্দিত এবং বহুবন্দিত উপন্যাস। নারীর প্রেম, নারীর সতীত্ব বর্তমান জীবন এবং চিরাগত সংস্কারের সংঘর্ষে কীরূপ নেয়? পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর মূল্য কি বংশ গৌরবে না প্রাচীন আদর্শে জীবন যাপনে? স্খলন পতনের (?) ফলে কেন ব্যাহত হয় নারীর জীবনের গতি? কী দিয়ে নারীত্বের মূল্য যাচাই হয়? নারীর জীবন কি স্মৃতি নির্ভর? নারীত্বের সঙ্গে সতীত্বেরই বা কী সম্পর্ক? হৃদয়ের অনুশাসন বড়, না সামাজিক অনুশাসন বড়? সমাজের কাছে শরৎচন্দ্রের সেই শেষপ্রশ্ন। মানুষের জন্যই তো সমাজ। কিন্তু কে বড়? মানুষ না সমাজ? মানুষের সংস্কার বড় না মানুষ বড়? জন্ম বড় না জাতক বড়? ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে জীবনে কোনটি বরণীয়? পাপ পুণ্য প্রভৃতি তো মানুষের আপেক্ষিক দৃষ্টির ফল। অথচ, এই পাপ পুণ্যের বিচারে মানুষের জীবনে কোথাও নেমে আসে আশীর্বাদ, আবার কোথাও বা অভিশাপ। কে এরজন্য দায়ী?

শরৎচন্দ্র দায়ী করেছেন আমাদের সমাজকে। কোন ব্যবস্থা যতই অভিনব হোক না কেন, চিরদিন তার অভিনবত্ব দাবী করতে পারে না। রাজপথ যেমনই সুগঠিত, সুমসৃন হোক না কেন, চিরদিন একভাবে থাকতে পারে না। তার সংস্কার প্রয়োজন। সংস্কার না হলে যক্ষের মণিময় ঘাট

বাঁধানো পুকুরটা এঁদো ডোবায় পরিণত হতে কতদিন। মানুষের চলার গতি তো সকলের সমান নয়। কিন্তু সকলে একসঙ্গে চলতে গেলে মোটামুটি একটা সমতা বিধান দরকার। তাই সমান না হলেও মানুষে মানুষে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। তার ফলেই গড়ে উঠেছে মানুষের সমাজ, সংহতি। কেবলমাত্র গতিই যদি লক্ষ্য হ'তো তাহ'লে সমাজজীবনে এত বাঁধাবাঁধি, এত নিয়মশৃঙ্খলার কী প্রয়োজন ছিল? সকলেই প্রগতির কথা বলেন এবং দাবীও করেন প্রগতিশীল বলে। আমাদের এই অনেক কালের পুরানো হিন্দু সমাজ ও জাতির জন্য শরৎচন্দ্র দুঃখ করে' বলেছেন, "পৃথিবীর আর সব জাত কেমন বড় হয়ে উঠেছে, সমস্ত মানুষ কেমন করে নিজের প্রতিষ্ঠা করে দাঁড়াচ্ছে, আর আমরা জুতোর তলায় পড়ে আছি চোখ বুজে; এতে আর সুখ পাই না, পূর্ব গৌরব স্মরণ করেও না। রোমের মত পাঁচশো বছর পর সে গৌরব ফিরে পাবো, এ চিন্তায় সুখতৃপ্তি পাই না।....." শরৎ-চন্দ্র প্রেমিক পুরুষ। দেশের জন্য, জাতির জন্য, সমাজের জন্য, দেশ, জাতি ও সমাজের মানুষের জন্য তাঁর অন্তরের প্রেম অন্তহীন। ধর্ম ও জাতির সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁদের মুখের উপর বলেছেন, "আমি বলি আর মেরামত করো না। ও অচল হয়ে গেছে। ওটা বাদ দাও। মেরামত করে আর খাড়া করো না।....." নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে নির্ভীক কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন, "আমি ধ্বংস করে যাবো। ভয় কি? আমি তো একলা নই, ধ্বংস হলেই আর একদল গড়ে তুলবেই।"

অনেকের মতে শরৎচন্দ্র শুধু সমস্যা তুলে ধরেছেন, সমাধান দেন নি। শরৎচন্দ্র নিজেও সেই কথাই বলেছেন। তিনি ধ্বংসের স্রষ্টা। বস্তুতঃ তার সামাজিক উপন্যাসগুলো চিরাগত সংস্কার এবং প্রথাকে নির্মমভাবে কষাঘাত করেছে। সমকালীন সমাজজীবনের দেনা-পাওনা মিটিয়ে তাঁর অনেক রচনা কালোত্তীর্ণের ছাড়পত্র পেল না। তার কারণ, শরৎচন্দ্র কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী হয়েও কালের দাবী মেটাতেই ব্যস্ত ছিলেন। যে বঞ্চিত, নিপীড়িতের দল তার লেখনীমুখের উৎস খুলে দিয়েছে, তাদের জন্য দরদী শরৎচন্দ্র নিজের প্রতি দরদ দেখাতে পারেন নি।

কিন্তু শেষ প্রশ্নের প্রশ্ন কেবল একালের নয়, আগামীকালেরও; বোধকরি সর্বকালের। সমাজ শাসনের মৌল কার্যকারণ তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা হয়ে

দাঁড়িয়েছে। কমল বাইরের শাসন মানতে কুণ্ঠিত। সে অতি সংযমের বিরোধী। মানুষের জীবন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংঘর্ষে রক্তরাঙা। মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তির মধ্যদিয়ে খুঁজে বেড়ায় অভিব্যক্তির পথ। প্রবৃত্তির উদ্দাম স্রোতকে ঠেকাতে প্রয়োজন সামাজিক অনুশাসন; নইলে ভেসে যাবে সমাজ সংসার বল্‌গাহীন প্রবৃত্তির উদ্দাম জোয়ারে। কমল স্বীকার করেনা সামাজিক অনুশাসন। বিশ্বাস নেই আচার অনুষ্ঠানে। কমলের জীবনে প্রতিষ্ঠা ও সফলতা আনন্দানুভূতিতে। এই আনন্দকে সে জানে চিরচঞ্চল বলে। তাৎক্ষণিক ভোগই তার জীবনে চরম পাওয়া। কমলের জীবন দর্শনে আনন্দের শাশ্বত রূপের কোন অস্তিত্ব নেই। শিবনাথ তাকে ছেড়ে গেলে, সে দুঃখিতা হয়নি। আবার অজিত তার পানিপ্রার্থী হলেও সে আনন্দে আত্মহারা হয়নি। নারীর জীবনে একাধিক পুরুষের আসাযাওয়া সে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছে; মেনে নিয়েছে পুরুষের জীবনেও। অথচ, কমল স্বৈরিনী নয়। রূপবতী ও বুদ্ধিমতী এই রমণীর পুরুষের প্রেম ও নারীর সতীত্ব নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। প্রাক্তন স্বামী পীড়িত শিবনাথের শুশ্রূষা করতে সে আশুতোষ গুপ্তের বাড়ী গেল বটে, কিন্তু শিবনাথের সঙ্গে বিচ্ছেদের অবসান ঘটানোর কোন অভিপ্রায় তার ছিল না। প্রবঞ্চক শিবনাথের বিরুদ্ধে তার নালিশ থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তা না হয়ে 'তাহার নালিশ হইল আশুবাবুর বিরুদ্ধে যিনি মৃত-পত্নীর স্মৃতির কাছে তাঁহার সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়েছেন, তাহার নালিশ নীলিমার বিরুদ্ধে যে পরের গৃহের গৃহিনী ও পরের ছেলের জননী হইয়া নিজেকে পরের জন্য উৎসর্গ করিয়াছে; এবং তাহার সবচেয়ে তীব্র বিদ্রোহ হইল আশ্রমের ব্রহ্মচর্যের আদর্শের বিরুদ্ধে, যে আদর্শ স্বাভাবিক নহে, সুন্দর নহে।' কমলের এই নালিশ কি শরৎচন্দ্রের নালিশ নয়! কমলের এই বিদ্রোহ কি শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহ নয়?

আশুতোষ, নীলিমা, রাজেন সনাতন হিন্দু ধর্ম ও সমাজের প্রতিভূ। এঁদের উদারতা, এঁদের স্নেহ প্রেম, এঁদের ত্যাগ ও সংযম হিন্দুর সমাজ জীবনের আদর্শ। আশুতোষের একনিষ্ঠতা, বিধবা নীলিমার ত্যাগ, সংযম ও সেবা বিপ্লবী রাজেনের কঠোর ব্রহ্মচর্য কমলের কাছে অর্থহীন। আমাদের সমাজ জীবনে আশুতোষ, রাজেন আদর্শ পুরুষ; নীলিমা নারী সমাজের আদর্শ। একথা অস্বীকার করার নয় যে সনাতন ভারতীয় সমাজ

বর্তমানে নানা কুসংস্কার এবং দুর্নীতির পঙ্কে পঙ্কিল। সমাজ জীবনে অনেক গলদ। তৃষ্ণার্ত পথিক যদি তার তৃষ্ণা নিবারণ করতে না পারে, তা'হলে পথের পাশে জলাশয় প্রতিষ্ঠার সার্থকতা কোথায়? গৃহস্থ যদি তার গৃহে শান্তি না পায়, তবে অরণ্যের সঙ্গে গৃহের প্রভেদ কোথায়? যন্ত্র যদি না যন্ত্রীর প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়, তাহলে যন্ত্রের কার্যকারিতা কী রইল? সমাজ মানুষের সুপেয় জলাশয়, শান্তিময় গৃহ, উৎপাদনশীল যন্ত্র। অথচ এই সমাজে যদি কমলের মত ধীমতী মেয়েরা আশ্রয় না পায়, না পায় প্রতিষ্ঠা, তাহ'লে সেই সমাজের মূল্য কোথায়? অক্ষয়, বেণী ঘোষাল এরাই তো সমাজের মাথা। এদের শাসনে রমা, জ্ঞানদার জীবন ব্যর্থ; অন্নদা কুলটা। এদের জন্যই বিদ্রোহিনী কমল, অভয়া।

শেষ প্রশ্ন প্রসংগেই শরৎচন্দ্র তাঁর মনের আক্ষেপ তীব্র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। "আমাদের এ দশা কেন যদি বার করতে পারেন, দেশের মহা উপকার হবে। এই যে হাজার বছরের দুরবস্থা, এ সামলাবার কোন উপায় দেখি না, কিছু আশা দেখতে পাইনা। বই খানায় আমার যা মত তা বলেছি। আর সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আহ্বান করছি, আসুন, কোথায় গলদ আছে, বার করে দিন। দেখান কোন খানটায় গলদ ছিল যার দোষে আমরা এই শাস্তি ভোগ করছি। আমরা খুব বড় ছিলাম, অথচ রেজাল্ট নিল, শূন্য। ………মেরামত করে কখনও ভাল হয় না। বরং অন্যায় অচল জিনিষটাকে আরো মজবুত করে কায়েমী করে তোলা হয়।…" এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে শরৎচন্দ্র ভারতীয় জীবন দর্শনের মৌল প্রশ্ন ধরে টান দিয়েছিলেন। কমল আনুষ্ঠানিক অংশকে বরদাস্ত করে না। ভগবানে তার বিশ্বাস নেই। ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তের কথায় "কমলের মতবাদের মধ্যে দুইট দিক আছে—একটি অতীতের বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে চায় আর একটির লক্ষ্য বর্তমানে সুখভোগের প্রতি।" এই জীবন দর্শন ভারতীয় জীবানুসারী নয়। পাশ্চাত্য ভোগাদর্শে পরিচালিত আধুনিক জীবনে এই চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখা যায় আধুনিক প্রগতিশীল সমাজে। এই ভোগবাদী সভ্যতার গোড়ার কথা নারীর স্বাধীনতা। প্রগতিশীলতা বলতে লোকে বোঝে নারীস্বাধীনতা। আমাদের বিশ্বাস, নারীর গৃহকোণে আবদ্ধ জীবন একদা আমাদের সমাজের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করেছে। নারী পুরুষের সমান অধিকার

পায়নি বলেই আমাদের সমাজ জীবন নানা কুসংস্কারের বেড়াজালে আচ্ছন্ন হয়েছে। উনবিংশ শতকে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সমাজ বন্ধন ভেঙে টুকরো টুকরো হতে থাকে! বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর দেশে অর্থনৈতিক সমস্যাও যতই প্রবলতর হয়ে দেখা দিতে লাগল, ততই এই ভাঙনের রেখা বিস্তীর্ণতর হয়ে দেখা দিতে লাগল। সমান অধিকারের দাবীতে বাইরের কর্মক্ষেত্রে নারী প্রতিযোগিতায় নামল পুরুষের সঙ্গে। বিধবা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রভৃতি এই অবস্থার পরিণতি। কমল অজিতের সঙ্গে বিবাহে বসতে চায়নি; কারণ আনুষ্ঠানিক বিবাহ সে মানে না। অথচ, স্ত্রীরূপে অজিতকে আশ্রয় করতে তার বাধেনি। এটা বৈপ্লবিক। কিন্তু বৈপ্লবিকতার খাতিরে সমাজে এই ব্যবস্থা কি মেনে নেওয়া চলে? নিঃসন্দেহে স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে হৃদয়ের অনুশাসনটাই বড়। কিন্তু নারী পুরুষের এই ধরনের বসবাসে কে সম্মতি দেবেন? ক্ষণিকের আনন্দানুভূতিকেই নারী যদি জীবনের চরম ও পরম প্রাপ্তি বলে মনে করে, আর অন্তরের প্রবৃত্তিগুলো যদি নিরন্তর খুঁজে-ফেরে পরিতৃপ্তির পথ, তাহলে মানুষ ও পশুর জীবনের সীমারেখার দ্রুত অবলুপ্তি ঘটতে থাকবে।

মানুষ প্রবৃত্তির দাস নয়। প্রবৃত্তির দাস হলে জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়। নিবৃত্তি করবার শক্তিতেই মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয়। সংযমই জীবন। সংযম-হীনতাই পশুত্ব। মানুষ লোভী হলে প্রবৃত্তির অনলে ইন্ধন যোগায়, প্রবৃত্তির আগুন যদি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে, তবে কোন্ দমকলের সাধ্য তা নেভাতে পারে! তাই আপাতদৃষ্টিতে ভোগবাদী জীবন দর্শন যে আদর্শের জয়গান করে, তা ঘটায় মানুষের অপমৃত্যু। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ শরৎচন্দ্র দেখে যেতে পারেননি। একদা বর্মামুল্লুকে তিনি স্ত্রীস্বাধীনতার রুদ্র নগ্ন মূর্তি প্রত্যক্ষ করে নির্বাক হয়েছিলেন। আজকের হৃদয়হীন সমাজ নারীপুরুষের বল্গাহীন জীবন যাপনের ফল কিনা তাই-বা কে বলবে!

শরৎচন্দ্র নিজে বলেছেন যে তিনি অন্য লেখকের লেখা পড়ার চেয়ে বিজ্ঞানের পুঁথিপত্রই যত্ন করে পড়তেন। কার্য-কারণের দিকে তাই তাঁর লক্ষ্য বেশী। অথচ, মানুষের সৃষ্টি প্রবাহের নানাগতি পথে যে বিচিত্র কার্যকারণ জাল বিচিত্রতরভাবে ক্রিয়াশীল, সেই মানুষের সামাজিক সমস্যাবলীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হলে সেই সমাজজীবনের আত্মপ্রকাশের উৎসে যাওয়া প্রয়োজন। মাঝ পথে জলঘোলা করলে সমভূমিতে মানুষের আবাসে ঘোলা জলের সন্ধানই মিলবে। মূল সমস্যার

সমাধান কোনদিন হবে না। তাতে মানুষের সহানুভূতি আকর্ষিত হবে বটে, তবে যারা সহানুভূতির পাত্র, তারা মানুষের চোখে কৃপার পাত্র হয়ে থাকবে মাত্র, অন্য কোন আশা করা যাবে না। ধর্মের ভণ্ডামি দেখে যদি ধর্মকে না মানি, সে দোষ তো ধর্মের নয়। সন্ন্যাসী না হয়ে সন্ন্যাসীর গেরুয়া মাত্র সম্বল করে যদি বাঁচবার অবলম্বন খুঁজি, আর সন্ন্যাসীর ত্যাগ, সংযম ও বৈরাগ্যকে নস্যাৎ করি, সেই দোষে কি ব্রহ্মচর্য কিংবা সন্ন্যাসকে দায়ী করা চলে?

অর্থনৈতিক কারণ যে মানুষের জীবনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক—এই প্রশ্নটা তো পাশ কাটিয়ে গেলে চলেনা। ব্যক্তিগত জীবনে ভুক্তভোগী হয়েও ভাগ্যক্রমে তাঁর উপন্যাসে শরৎচন্দ্র এই অর্থনৈতিক সমস্যাকে বড় একটা গুরুত্ব দেননি। অথচ, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজের উত্থান পতনে তার ধর্মবিশ্বাসের, সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিশেষ বিশেষ অবস্থার জন্য দায়ী তার বিত্তের অবস্থা। শরৎসাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারের। তাই যে নালিশটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, সেই নালিশটির অনুপস্থিতি বড় অস্বাভাবিক ঠেকে। কমলের বংশগৌরবহীনতার জন্য কি কমলের মায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা দায়ী নয়?

আমরা প্রগতির নামে, নারী স্বাধীনতার নামে ভুলে যাই নারীপুরুষে সত্তার দুই পৃথক প্রকাশের কথা। পুরুষ ও প্রকৃতি। ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে গঠিত নর ও নারি। স্বাভাবিক কারণেই তাই কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতা। একজন ঘরের, অপরে বাইরের। ভগবান মানি আর নাই মানি, সৃষ্টির কার্য কারণকে অমান্য করি কেমন করে। হৃদয় ধর্মে আর বুদ্ধির ধর্মে দ্বন্দ্ব খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে নিপীড়ন প্রবঞ্চনা কে চায়? 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।' নারীর এই অন্তহীন বেদনা দিয়েই গড়ে উঠেছে নব নারীর সাহিত্য। শিবনাথ কমলকে ছাড়ল, কারণ মনোরমায় আসক্তি। কমল খুব নিরাসক্ত চিত্তে শিবনাথের ছেড়ে যাওয়া মেনে নিল বটে, কিন্তু অজিতকে আঁকড়ে ধরল ঐকান্তিক ব্যাকুলতায়। "তোমার দুর্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো, এত নিষ্ঠুর আমি নই,…ভগবান তো মানিনে, নইলে প্রার্থনা কোরতাম দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আগলে রেখেই একদিন যেন মরতে পারি।" এ কোন্ কমল? এই কি শেষ প্রশ্নের বিদ্রোহিনী কমল! হায়রে, সেই চিরন্তনী নারী প্রকৃতি, প্রকৃতি স্বরূপের এই তো শাশ্বত সনাতন রূপ, পুরুষকেই অবলম্বন করতে চায়।

এই রূপের মূলকেন্দ্রে আছে নারীপুরুষের বিচিত্র যৌনানুভূতি। যৌন সংগঠনই

যে নারীপুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রধান সংগঠক, একথা কে অস্বীকার করবে? শরৎচন্দ্র নিজে কি গৃহদাহে, বিপ্রদাসে কিংবা চরিত্রহীনে সেকথা বলেন নি? বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিনী সম্পর্কে তার দুঃখের কারণও তো সেইখানে। সংসারে রাজলক্ষ্মীকে খুঁজলে পাওয়া যাবে কিন্তু রক্তমাংসের শ্রীকান্ত কোথায় মিলবে? নারী কামিনী। বহুর কামনা নারীর স্বভাব ধর্ম। নারীর সতীত্ব পুরুষের শাসন এবং সমাজ শৃঙ্খলার দান। নারী হৃদয়বতী কিন্তু পুরুষ বিবেকবান। সমাজ শৃঙ্খলাই সভ্যতার উপাদান।

পথের দাবীর ভারতী সত্যকে চরম ও পরম শাশ্বত, সনাতন আর অপৌরুষের বলে মানুন আর নাই মানুন, সত্যকে তিনি মূর্খকে ভোলাবার যাদুমন্ত্রই বলুন আর মিথ্যার সঙ্গে সত্যের সৃষ্টির যতই মিল খুঁজুন না কেন, সমস্তই তর্কের খাতিরে। সত্য সত্যই। সমাজকে বাঁচাতে হলে সেই সমাজের অভ্যন্তরেই তার বাঁচবার উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। গাছের মূল যখন মাটিভেদ করে' স্থানান্তরে ধেয়ে চলে, তখন ছোট ছোট অজস্র শাখামূল প্রধান মূল থেকে বেরিয়ে চারপাশের মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কারগুলো গাছের শাখা-মূলের মতই মানুষের জীবন ধারাকে সমাজদেহের অভ্যন্তরে প্রসারিত হয়ে সমাজকে বেঁধে রাখে। এমনি করেই স্বাভাবিক নিয়মেই গড়ে ওঠে মানুষের সংস্কার। সংস্কার বর্জিত হলে মানুষের থাকে কী? মানুষ কি কখনও সংস্কারশূন্য হতে পারে? শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস অনুযায়ী দোল-দুর্গোৎসব আমাদের এই দুর্দশায় এনে ফেলেছে কিনা জানি না, তবে দোল-দুর্গোৎসব আছে বলেই বাঙালী যে আজও বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে, একথা ঠিক।

কমললতা কি আদৌ কোন চরিত্র ?

পুলকেশ দে সরকার

শরৎচন্দ্র কেন যে শ্রীকান্ত'র তৃতীয় পর্বের পরেও চতুর্থ পর্বে এলেন তার দু'টি সম্ভাব্য কারণ আমার মনে জেগেছে। এক—আত্মসমীক্ষায় বসে শ্রীকান্ত যে তার একাকীত্বের নিঃসঙ্গতার দায় দায়িত্ব রাজলক্ষ্মীর ওপর চাপিয়ে নিজেকে ভারমুক্ত করতে চেয়েছে এবং স্থির করেছে অভয়াই তার যোগ্য আশ্রয়—সে সিদ্ধান্ত কালাতিক্রমে স্রস্টার মন সায় দিতে পারেনি। সুতরাং, চতুর্থ পর্ব যেন তার জবাবদিহি অথবা তৃতীয় পর্বের সিদ্ধান্তগুলোর সুকৌশল খণ্ডন।

অথবা এ শরৎচন্দ্রের সহজিয়া তত্ত্বের এক এক্সপেরিমেণ্ট—প্রয়োগ-প্রচেষ্টা। নইলে এই চতুর্থ পর্বে নতুন আছে কি ? আছে পুটু—যা অত্যন্ত গতানুগতিক। আছে গহর। কমললতা, বৈরাগীদের আখড়া, পদাবলী। আছে গহরের অনাগ্রাসী, সুস্থির, নির্বাক প্রেম, যে-ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে কমললতা আশ্রয়চ্যুত হয়। আছে অতীত কাহিনী উদ্ঘাটিত করবার জন্য কমললতা ও রাজলক্ষ্মীর অসুস্থ প্রতিযোগিতা বা জেদ—যেন শ্রীকান্ত গীর্জার বিশ্বস্ত ফাদার (যাজক) ও ঐ দুটি 'পতিতা' কনফেসন-প্রার্থী। তৃতীয় পর্ব অবধি শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে পিয়ারী বাঈজীর ইতিহাস উদ্ঘাটিত করতে দেয়নি, যদিও যতটুকু অনুমান করা যায়,যে-কোন পাঠকের পক্ষে তা যথেষ্ট, আরও বেশি জানবার কৌতূহল অসুস্থ মনেরই পরিচায়ক। কিন্তু শ্রীকান্ত কমললতাকে তাঁর কলঙ্কময় কাহিনী বলতে অবকাশ দিল, কাহিনী আগ্রহভরেই শুনল। তার আচরণে, কথায় ও ক্রিয়ায় কমললতার প্রতি নমনীয়তা, দুর্বলতা একেবারেই অস্পষ্ট ছিল না ; কমললতাও বার তিনেক শ্রীকান্তকে নিয়ে বৃন্দাবন যাবার অথবা ঘুরে বেড়াবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে, প্রলোভন জাগিয়েছে। শ্রীকান্তও বেশ ঝুঁকেছিল এবং যে সহচারিতা (বাগানে ফুল তোলা) সে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে করেনি, কমললতার সঙ্গে তা করেছে। রাজলক্ষ্মীও নারীচিত্তের স্বাভাবিক ঈর্ষাবশত নিজেকে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করে শ্রীকান্তের চিত্তও জয় করতে চেয়েছে। কি রাজলক্ষ্মী কি কমললতা– কারুরই কাহিনীতে কোন বাহাদুরি নেই ; তবু রাজলক্ষ্মীর ক্ষেত্রে যদি-বা অনেকটা দায় সমাজের ওপর চাপানো, কমললতার ক্ষেত্রে তার কিছুমাত্র অবকাশ নেই। সে স্বৈরিনী।

তবে এ কি ? সহজিয়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ? আমি এ তত্ত্ব নিজে ভাল জানিনে ; যতটা বুঝি, এতে দেহোত্তীর্ণ চিত্তের অতিক্রমণ বা sublimation ঘটেনা, অবনয়ন বা degeneration ঘটে। পারমিসিভ সমাজ নৈরাজ্যেরই সমাজ। কমললতাকে সেখানে হয়তো মানায়, রাজলক্ষ্মীকে নয়। তবে আমার বুদ্ধিবৃত্তিতে এইটুকু আছে যে, জৈব আবেদন যথাযথ মেনে নিয়েও দেহ-সর্বস্বতাকে ছাড়িয়ে দেহাতীত অতিরিক্ত ভাবনা অমানবিক বা অস্বাভাবিক নয়, বরং তাতেই মানুষকে মহিমান্বিত করে, দেহকেই চূড়ান্ত মন্দির বলে কলরব তোলার বদলে। তাই একবার পণ্ডিতদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাক 'সহজিয়া' কি এবং শরৎচন্দ্র যদি চতুর্থ পর্বে 'সহজিয়া' নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন তবে তাতে আদৌ সার্থক হয়েছেন কিনা অথবা একেবারেই ব্যর্থ হয়েছেন। চতুর্থ পর্বটি নিঃসন্দেহে সংলাপ-প্রধান এবং একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি দোষে পীড়াদায়ক। তবু, এরও যদি কোন মানদণ্ড থাকে সেটাও বুঝে নেওয়া দরকার।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'ভারতকোষ'-এর পঞ্চম খণ্ডে 'সহজিয়া' নিয়ে দুটি নিবন্ধ দিয়েছেন ; আমি তারই কিছুটা এখানে তুলছি ; প্রথমটি নয় দ্বিতীয়টি থেকে (পৃঃ ৫৪৯) :—

"বাংলাদেশের বৈষ্ণবদিগের মধ্যে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে একটি বিশেষ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ সহজিয়াগণের ন্যায় ইহারাও সহজ-পন্থী ছিলেন ; অর্থাৎ ইহাদের চরম উদ্দেশ্য ছিল মহাভাব-রূপ সহজ বস্তুকে লাভ করা, সাধন-পন্থাও ছিল সহজ বা অবক্র। নিজেদের সহজিয়া মত প্রচার করিবার জন্য ইহারা বাংলায় অনেক গান এবং পদ্যে ও গদ্যে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই তত্ত্ব-গ্রন্থ ও গান লইয়াই বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্য। বহু প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাসই প্রথম বৈষ্ণব সহজিয়া মতের সাধক এবং প্রচারক। তিনি রামী নাম্নী এক রজকিনীর সহিত এই সহজ -সাধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ রাগাত্মিকা পদাবলীর ভিতর দিয়া এই সহজ সাধনার গূঢ় তত্ত্বই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সহজিয়া চণ্ডীদাস যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বকার কিম্বদন্তী ভিন্ন তাহার অন্য কোনও প্রমাণ নাই। বরঞ্চ চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত এই রাগাত্মিক পদগুলি পরীক্ষা করিলে মনে হয়, এগুলি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বিভিন্ন কবির রচনা ; প্রাচীনত্ব এবং প্রামাণিকত্ব দান করিবার জন্যই এগুলির সহিত চণ্ডীদাসের নাম যুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। সহজিয়াগণ তাঁহাদের অনেক তত্ত্ব-গ্রন্থ এবং গান বিদ্যাপতি, রূপ গোস্বামী, সনাতন

গোস্বামী, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরহরি, নরোত্তম, লোচন, চৈতন্য দাস প্রভৃতির নাম চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণব সহজিয়াদের নামে প্রচলিত রচনাবলীর মধ্যে 'বিবর্ত-বিলাস' (অকিঞ্চন দাস), 'আনন্দভৈরব', 'অমৃত রসাবলী' 'আগমগ্রন্থ', 'প্রেম বিলাস' (যুগল কিশোর দাস), 'রাধারস-কারিকা', 'দেহ-কড়চা' (নরোত্তম), 'সহজ উপাসনা-তত্ত্ব' (তরুনী রমণ), 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়', 'রতিবিলাস-পদ্ধতি', 'রাগময়ীকণা, 'রত্নসার' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এইগুলির তেমন কোনও সাহিত্যিক মূল্য নাই; সাহিত্যিক মূল্য আছে সহজিয়াগণের লেখা পদাবলীর। বৌদ্ধ-সহজিয়াগণের রচিত গানগুলির ন্যায় বৈষ্ণব সহজিয়াদের গানগুলির মধ্যেও সাধন-প্রণালী বা সাধন-অনুভূতির বর্ণনায় বহুলভাবে সন্ধ্যা ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বাংলা দেশের বৈষ্ণব-সহজিয়া সম্প্রদায় পূর্ববর্তী বৌদ্ধ সহজিয়াদের মত বৈষ্ণব সহজিয়াগণও বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক নরনারীর দৈহিক রূপের মধ্যেই তাহাদের স্বরূপ বা সহজ রূপ লুক্কায়িত আছে। নররূপে নর, স্বরূপে কৃষ্ণ; তেমনই নারীরূপে নারী, স্বরূপে রাধা। রূপ ছাড়িয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। রূপের মিলনে যখন স্বরূপের মিলন সংঘটিত হইবে তখনই আসিবে সামরসের অনুভূতি। ইহাই মহাভাব বা সহজের অনুভূতি। বৈষ্ণব সহজিয়াগণ কামকেই পরিণত করিতে চাহেন। এই জন্য তাঁহারা যে সাধনা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইল আরোপ সাধনা; রূপে স্বরূপের আরোপ, নর-নারীতে কৃষ্ণ রাধার আরোপ। এই আরোপ সাধনার দ্বারা যখন স্বরূপে ধ্রুবা স্থিতি লাভ হয়, তখন নরনারীর আকর্ষণে আর কাম থাকে না, তাহা প্রেমে পরিণত হয়। তবে এ সহজ সাধনা বিশেষ সহজ নয়। সহজিয়াদের নিজের ভাষায় 'সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি' তবেই সম্ভব হইবে এই সাধনা। চণ্ডীদাসও বলিয়াছে, প্রকৃত সহজ-সাধক 'কোটিতে গোটিক হয়।'

মুরারিপুরে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের আখড়ায় বৈরাগী দ্বারিক দাসকে শ্রীকান্ত যখন বলে: "বাবাজী, আমাকে হঠাৎ চিনলেন কি করে ?"

"বাবাজী হাত নাড়িলেন—ও চলবে না, গোঁসাই, ক্রিয়াপদের শেষের ঐ সম্ভ্রমের দন্ত্য 'ন'টি বাদ দিতে হবে। তবে ত রস জমবে।"

শ্রীকান্ত 'ন'বাদ দিয়েই প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলে"বাবাজী কহিলেন, হঠাৎ চিনব কেন! তুমি যে আমাদের বৃন্দাবনের চেনা মানুষ গোঁসাই, তোমার চোখ দুটি যে রসের সমুদ্দর—ও যে দেখলেই চোখে পড়ে। যেদিন কমললতা এলো, তারও এমনি দুটি চোখ—তারে দেখেই চিনলাম—কমললতা, কমললতা এতদিন ছিলে

কোথা ? কমল এসে সেই যে আপনার হলো তার আর আদি-অন্ত বিরহ-বিচ্ছেদ রইল না। এই ত সাধনা গোঁসাই, একেই ত বলি রসের দীক্ষা।"

আচমকা এসব কথা শুনলে মনে হবে শ্রীকান্তর সঙ্গে আমরা কোন পাগলের মেলায় এসে পড়েছি। এই সহজ কথাগুলো একেবারেই সহজবোধগম্য নয়। প্রথম সম্বোধনেই এমন কথা কেউ বলতে পারে স্বাভাবিক অবস্থায় ?

শ্রীকান্ত কমললতার কথায় কৌতুহলী হওয়ায় বললেন, "দেখবে তাকে ? কিন্তু সে তোমার অচেনা নয়, গোঁসাই, বৃন্দাবনে তাকে অনেকবার দেখেচ। হয়ত ভুলে গেছ, কিন্তু দেখলেই চিনবে, সেই কমললতা……"

কথায় কথায় শ্রীকান্ত জানতে পারল, গহর তার সব কথাই এই আখড়ায় বাবাজী, কমললতার কাছে বিশেষ করে নিবেদন করেছে। নতুবা বাবাজীর এই আচরণে শ্রীকান্তর সন্দেহ হচ্ছিল "কোন অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে" দেখামাত্র চিনেছে এবং বর্মা যাবার খবরটা পর্যন্ত জানে।

একটু পরে কমললতাও এল। "বয়স ত্রিশের বেশি নয়, শ্যামবর্ণ, আঁটসাঁট ছিপছিপে গড়ন, হাতে কয়েকগাছি চুড়ি—হয়ত পিতলের, সোনার হইতেও পারে, চুল ছোট নয়, গেরো দেওয়া পিঠের উপর ঝুলিতেছে, গলায় তুলসীর মালা, হাতে থলির মধ্যেও তুলসীর জপমালা। ছাপছোপের খুব বেশি আড়ম্বর নাই, কিংবা হয়ত সকালের দিকে ছিল, এ বেলায় কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে।……"

"সে কিছুমাত্র ভূমিকা করিল না, সোজা আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, কি গোঁসাই চিনতে পার ?"

আশ্চর্য এই, শ্রীকান্তও কমললতাকে দেখে মুহূর্তকাল পূর্বে আশ্চর্য হয়ে গেছল। "সবিস্ময়ে মনে হইল এই চোখ মুখের ভাবটা যেন পরিচিত এবং চলার ধরণটাও যেন কোথায় দেখিয়াছি।"

ব্যাপারটা যেন সংক্রামক।

কমললতার কথায় শ্রীকান্ত বলল, "কিন্তু কোথায় যেন দেখেচি মনে হচ্চে।"

"বৈষ্ণবী কহিল, দেখেচ বৃন্দাবনে। বড় গোঁসাইজীর কাছে খবরটা শোননি এখনো ?"

"বলিলাম, তা শুনেচি। কিন্তু বৃন্দাবনে আমি কখনো জন্মেও যাইনি।"

"বৈষ্ণবী কহিল, গ্যাছো বই কি। অনেক কালের কথা হঠাৎ স্মরণ হচ্ছেনা না। সেখানে গরু চরাতে, ফল পেড়ে আনতে, বনফুলের মালা গেঁথে আমাদের

গলায় পরাতে—সব ভুলে গেলে ?" এই বলিয়া সে ঠোঁট চাপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

"বুঝিলাম তামাসা করিতেছে, কিন্তু আমাকে না বড় গোঁসাইজীকে, ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না।"

শ্রীকান্তর এ কথায় যেন আমরা আবার মাটিতে ফিরে আসি। কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে তামাসাও তো নয়। কমললতা এর পরই শ্রীকান্তকে সাদর আহ্বান জানিয়ে বলল, "রাত হয়ে আসচে, আর জঙ্গলে বসে কেন ? ভেতরে চলো।"

শ্রীকান্ত এখানে থাকতে এসেছে, এখবর শ্রীকান্তরও বোধ হয় জানা ছিল না। সে বলেছিল, "জঙ্গলের পথে আমাদেরও (মানে, গহর ও শ্রীকান্তর) অনেকটা যেতে হবে। বরঞ্চ কাল আবার আসব।"

বৈষ্ণবী নবীনের কথা তুলে বলল, "বোষ্টমীর জাল ছিঁড়ে হঠাৎ বার হওয়া যায় না, তোমাকে সাবধান করে দেয়নি ?"

শ্রীকান্ত বলেছিল, "তাও দিয়েচে।"

এবার কমললতা আরও সোজাসুজি বলল, শ্রীকান্ত বিদেশে চাকরি করতে যাবার দরকারটা কি, কেউ যখন নেই, গোবিন্দজীর প্রসাদ পেলেই চলবে। বৈরাগীগিরি শ্রীকান্তর ধাতে বেশি দিন সয় না জেনেও তেমনি অনায়াসে বলল, তোমার কমই ভাল। শ্রীকান্তর অন্ধকারে ফেরবার ভাবনায়ও নিঃসঙ্কোচে বলল, অন্ধকারে ফিরতেই বা আমরা দেব কেন ? অন্ধকার কাটবে গো কাটবে। তখন যেয়ো এসো।

আবার যেন স্বপ্নের দেশে আসা গেল। একি সেই নররূপে নর, স্বরূপে কৃষ্ণ ; নারীরূপে নারী স্বরূপে রাধা ? তাই থেকেই বৃন্দাবনে বহুকাল আগে দেখা ; দুজনেরই চেনা চেনা, রাধার মনে আছে কৃষ্ণের মনে নেই। এবং এজাল ছিঁড়ে বেরোনো যায় না। কিংবদন্তী আছে, কামরূপে নাকি পুরুষকে কামিনীরা ভেড়া করে রাখত। নবীনেরও মুরারিপুর আখড়া সম্পর্কে সেই আশঙ্কা—বিশেষ কমললতা। তবে এখানে কিন্তু শ্রীকান্ত খুব একটা অনিচ্ছা-চালিত নয়, কৌতূহল, কৌতুক, স্বেচ্ছাও তাকে চালনা করেছে ; কমললতার রূপবর্ণনায়ই তা অভিব্যক্ত।

অথবা সহজিয়া সম্প্রদায় নিয়ে শরৎচন্দ্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে প্রস্তাব করেছি শ্রীকান্তর কমললতা-সাক্ষাতের পর এই মানসিক রোমন্থনের তার সমর্থন মেলে :

"বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি, বাঙলাদেশের আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ় রহস্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই সুগুপ্ত আছে এবং সেইটাই নাকি বাঙলার নিজস্ব খাঁটি

জিনিস। ইতিপূর্ব্বে সন্ন্যাসী-সাধুসঙ্গ কিছু কিছু করিয়াছি—ফললাভের বিবরণ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু এবার যদি দৈবাৎ খাঁটি বস্তু কপালে জুটিয়া থাকে ত এ সুযোগ ব্যর্থ হইতে দিব না। সঙ্কল্প করিলাম।"

এখানেও শরৎচন্দ্র ও শ্রীকান্ত একাত্ম ; বার বার সন্ন্যাসী হওয়া সাধু-সঙ্গ করা বার বার ছেড়ে দেওয়া শরৎচন্দ্রের নিজস্ব বয়ানেও একাধিকবার আছে, চন্দনগরের আলাপ সভায় তো আছেই, শ্রীকান্ত পর্বেও শ্রীকান্তর বয়ানে বার কয়েক আছে এবং কথা একই। সুতরাং, শরৎচন্দ্র ওরফে শ্রীকান্তর চিত্তে এই সহজিয়া রূপটি সম্পর্কে উৎসুক্য ছিলই।

ভেতরে আখড়ায় বৈষ্ণবীদের একটা বর্ণনা আছে। কমললতা বলেছিল কমলবন, শ্রীকান্তর চোখে পড়ল, কমলেরই বন বটে তবে দলিত-বিদলিত। কমললতা এখানে রাধা এবং শ্রীকান্ত ?

সে নতুন গোঁসাই, শ্রীকান্ত গোঁসাই নয়, কারণ কমললতার একটা ইতিহাস আছে, আপাতত তা অনুদ্ঘাটিত, কেননা, এখন এদের বাস্তবে পা পড়ছে না. আপাতত এই যে, কমললতা বলল, "ও নামটা আমার ধরতে নেই, অপরাধ হয়।"

শ্রীকান্তর এখানে একটা কৌতুহল জেগে রইল—পিয়ারী বাইজীর বেলায়ও যে কৌতুহল জাগেনি। আজকে এখানে রাত কাটালে গহর কি মনে করবে এমন একটা অস্বস্তির ভাব তার হয়েছিল, কিন্তু শ্রীকান্তর কৌতুহলের (না কি ঈর্ষার) সলতে উসকে দিয়ে কমললতা বলল, "সে ভার আমার। আমি ধরে রাখলে তোমার বন্ধু একটুও রাগ করবে না, এই বলিয়া সে হাসিয়া চলিয়া গেল।"

সব ব্যাপারটাই কেমন সহজ। আহ্বান আমন্ত্রণ সহজ, কথা সহজ, সম্বন্ধ সহজ, সমস্যা সমাধানও সহজ। কমললতা মঠের কর্ত্রী কিনা জিজ্ঞাসা করায় "কমললতা জিভ কাটিয়া কহিল, আমরা সবাই গোবিন্দজীর দাসী ···এই বলিয়া সে মন্দিরের উদ্দেশে হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল। বলিল, এমন কথা আর মুখে এনো না।"

মীরাবাঈর মত এ যদি কৃষ্ণের প্রতি অনন্য প্রেম হত তো সর্ববিধ জাগতিক সম্বন্ধ উত্তরণের ও গোবিন্দজীর দাসী আখ্যাত হবার অর্থ বোঝা যেত। এ তো তাও নয়। শ্রীকান্ত যে টাকা দিয়ে পরের কন্যাদায় উদ্ধার করেছে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে গিয়ে এখবরও বৈষ্ণবী পেয়েছে। অর্থাৎ শ্রীকান্ত সম্পর্কে যতকিছু জানবার তা গহর এবং ভিক্ষা মারফৎ সংগৃহীত হয়েছে। শ্রীকান্তর যেটুকু বাকী ছিল, অর্থাৎ পুটুর বিয়ে ও শ্রীকান্তর টাকা বেঁচে যাওয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনাক্রম

তাও প্রকাশিত হল। ধারণাগত আখড়ার পরিবেশের সঙ্গে এসব তথ্য সংগ্রহ নিতান্তই বেমানান ; কিন্তু অল্পকালের মধ্যে বার বার তিনবার হাত জোড় ক'রে নমস্কারই শুধু মনে করিয়ে দেয় এটি বৈষ্ণবীদের আখড়া। গৃহস্থালীর কাজ এদের সাধনা, রাঁধাবাড়া, জলতোলা, কুটনো-বাটনা, মালাগাঁথা, কাপড় ছোপান। "দাস-দাসীর এর চেয়ে বড় সাধনা আমরা পাব কোথায় গোঁসাই ?"

শ্রীকান্তর মন টলল, তার হঠাৎ মনে হ'ল সে "এই অপরিচিত বৈষ্ণবীর মুখের মত সুন্দর মুখ আমি সংসারে কখনো দেখি নাই।" (কোথায় যেন দেখিয়াছি বা বৃন্দাবনে বহুদিন আগে দেখা নয়)। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে কমললতার গৃহী পরিচয় জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। বৈষ্ণবীও রহস্য ছেড়ে বলল, "ছিল ইট-কাঠের তৈরী কোন একটা বাড়ির ছোট্ট একটি ঘর।" ব্যস্, আপাতত ঐ পর্যন্ত। সাসপেন্স। পরবর্তী কোন অজ্ঞাত তারিখ অবধি মুলতুবি। শ্রীকান্তর জন্য একটি পরিচ্ছন্ন ঘর ও তার বাঁশের আলনায় পরিষ্কার তসরের কাপড় দেখিয়ে বলল, "ঐটি পরে এস।"

সবই আকস্মিক, অপরের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা নেই ; দরকারও নেই। ঐ ঘরে "একটি তক্তপোষে পাতা বিছানা। নিকটেই জলচৌকির উপরে রাখা কয়েকখানি গ্রন্থ ও একথালা বকুলফুল" ইত্যাদি। শ্রীকান্তর আসবার কথা নয় থাকবার কথা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি খুটিনাটি তার আগমনের পূর্বেই যেন প্রস্তুত। থর্ট্ স্টাডির ম্যাজিক।

"কাপড় ছাড়িয়া ঝুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কি জানি এ কাহার ঘর, কাহার শয্যা, অজ্ঞাত বৈষ্ণবী একটা রাত্রির জন্য আমাকে ধার দিয়া গেল—কিংবা হয়ত, এ তাহার নিজেরই—কিন্তু এ সকল চিন্তায় মন আমার স্বভাবতই ভারী সঙ্কোচ বোধ করে, অথচ আজ কিছুই মনে হইল না, যেন কতকালের পরিচিত আপনার জনের কাছে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছি।......"

এই কি সহজিয়া ? কমললতায় রাধারূপ শ্রীকান্তে কৃষ্ণরূপ ? জানিনে। শ্রীকান্তর কানে "মন্দিরা-সহযোগে কীর্ত্তনগান কানে গেল। বামাকণ্ঠ, রমণীকে চোখে না দেখিয়াও নিঃসন্দেহে অনুমান করিলাম এ কমললতা।" মন্দিরে গিয়ে দেখল "সকলের দৃষ্টিই রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তির প্রতি নিবদ্ধ। মাঝখানে দাঁড়াইয়া কমললতা কীর্ত্তন করিতেছে—মদনগোপাল জয় জয় যশোদাদুলাল কি, যশোদা-দুলাল জয় জয় নন্দদুলাল কি। নন্দদুলাল জয় জয় গিরিধারী-লাল কি, গিরিধারী-লাল জয় জয় গোবিন্দ গোপাল কি।......

"গায়িকার দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া দরদরধারে অশ্রু ঝরিতেছে এবং ভাবের গুরুভারে তাহার কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে যেন ভাঙিয়া পড়িল বলিয়া।" শ্রীকান্তরও "মনের ভিতরটা হঠাৎ যেন কেমন ধারা করিয়া উঠিল। বাবাজী দ্বারিকাদাস মুদ্রিত নেত্রে একটি দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি সচেতন কি অচেতন বুঝা গেল না…।"

এই সবই একটা বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর আখড়ায় হয়তো খুবই মানান সই, কিন্তু নিতান্ত কাছেই যে কত বড় অসঙ্গতি বেমানান একটি রূঢ় বাস্তব নিশ্চল হয়ে ছিল, শ্রীকান্তর বেরিয়ে এসে গহরকে একাকী সেখানে বসতে থাকার দৃশ্যে তা উদ্‌ঘাটিত হল। তামাসা কোন্‌টি ? ওটি না এটি ? এই নামকীর্ত্তনে গহরের প্রবেশাধিকার নেই। শ্রীকান্তও তাকে সঙ্গ দিল না। গহরের সঙ্গে তার বাড়ীতে ফিরে গেল না। কমললতার ঘরে এসে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল এবং চোখের জল ফেলতে লাগল, কার জন্য, কিসের জন্য সে জানে না।

সেই আলোহীন ঘরেই কমললতা নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে এল। সদ্য সন্ধ্যে-বেলাকার 'বন্ধু'। প্রসাদ দেবে বলে ডাকাডাকি। গহরের প্রসঙ্গও উঠল। গহর চলে গেছে। বৈষ্ণবীর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসও শোনা গেল, একটু আগে যশোদাদুলাল নন্দদুলালের কীর্ত্তনে অশ্রুপ্লাবন সত্ত্বেও, শোনা গেল গহর-কমললতা সম্পর্কে অমনি চাপা ইঙ্গিত। মানব মানবী। কিন্তু আখড়া জাত মানে। তাকে মুসলমানরা বলেন কাফের, আখড়া বলে মুসলমান !

শ্রীকান্তর আতিথেয়তার ত্রুটি হল না। কমললতা "সমুদয় খাদ্য সামগ্রী একে একে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিল।" অনুমান করা যায়, নেবানো আলোটা জ্বালানো হয়েছিল।

তারপর ভোরে আবার কীর্ত্তন : কানু-গলে বনমালা বিরাজে, রাইগলে মোতি সাজে। অরুণিত চরণে, মঞ্জীর রঞ্জিত খঞ্জন গঞ্জন লাজে।

কমললতা সম্পর্কে শ্রীকান্তর যেন কৌতূহলের অন্ত নেই, কি একটা মোহ তাকে পেয়ে বসেছে, যে মোহ তার পিয়ারী-রাজলক্ষ্মী সম্পর্কে প্রকাশ পায়নি, বরং সে সেখানে উপেক্ষিত, ভেবেছিল অভয়ার কাছেই তার যোগ্য আশ্রয়স্থান, সে স্থির করেই এসেছিল বর্মায় যাবে অভয়ার জন্য, চাকরী গৌণ। কিন্তু কমললতার সান্নিধ্য যেন তার কাছে প্রথম একটা সন্ধ্যাতেই সহজকাম্য হয়েছে। জানতে চাইল, 'আমি জানি তুমি অন্য সকলের মত নও। সত্যি বল ত ভগবানের এই প্রতীক এই যে পাথরের মূর্তি—'

কমললতা শ্রীকান্তর একথাটা শেষ করতে দেয়নি এবং এমন কথা মুখে আনতে মানা করে দেয়। তারপর ভক্তি-বিশ্বাস সম্পর্কে শ্রীকান্তকে নির্বাক করে দেয়।

"বৈষ্ণবী কহিল, কি গোঁসাই কথা কও না যে?"

"বলিলাম, ভাবচি।"

"কাকে ভাবচ?"

"ভাবচি তোমাকেই।"

"ইস্! বড় সৌভাগ্য যে আমার! একটু পরে কহিল, তবুও থাকতে চাও না, কোথায় কোন্ বর্মাদের দেশে চাকরী করতে যেতে চাও।" কমললতা চায় শ্রীকান্ত থাক আখড়ায়, খেতে ঠাকুর দেবেন যেমন তাদের দিচ্ছেন। শ্রীকান্ত জানতে চায়, কমললতার দেশ কোথায়। কমললতা জবাব এড়িয়ে বলল, "কালকেই তা বলেচি, গোঁসাই, ঘর আমার গাছতলায়, দেশ আমার পথে পথে।" শ্রীকান্ত জানতে চেয়েছিল, "মঠে থাকো কিসের জন্যে?" সে তারও জবাব এড়িয়ে গিয়ে নির্দ্বিধায় বলল, "সঙ্গী পাই ত আবার একবার পথই সম্বল করি।" শ্রীকান্ত যদি আখড়ায় না থাকতে চায় সে কি তার পথের সঙ্গী হবে? আভাষমাত্র নয়, সে স্পষ্টই শ্রীকান্তকে পথের সাথী হতে ডাকল। শ্রীকান্ত যখন বলল "তোমার সঙ্গীর অভাব একথা বিশ্বাস হয় না, কমললতা, যাকে ডাকবে সে-ই রাজী হবে।" কমললতা তৎক্ষণাৎ বলল, 'তোমায় ডাকচি, নতুন গোঁসাই—রাজী হবে।' শ্রীকান্ত বলেছিল, রাজী। এবং রাজী হবার যে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে তা অবান্তর। সাময়িক হলেও কমললতার আকর্ষণ শ্রীকান্তর পক্ষে দুর্নিবার হয়ে পড়েছিল, ভাষায় সে তা যতই ঢাকতে চেষ্টা করুক।

কমললতাও যে তামাসা করছিল তা নয়, আখড়ায় যতবার যত কথায়ই সে পাষাণ মূর্তি প্রত্যক্ষ বলে হাত জোড় করুক সে সান্নিধ্য চায় নর-রূপের, আপাতত শ্রীকান্ত সেই নর-রূপ, যদি কোনকালে এইভাবে সোপান-আরোহণ ক'রে কৃষ্ণ লাভ হয় হবে, আজ সে নারীরূপে নারী—যদি কোনকালে রাধা-রূপ হয় তো হবে; আপাতত শ্রীকান্তই তার কাম্য: চলো না, গোঁসাই, বেরিয়ে পড়া যাক।

কমললতা কিসের বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চায়? অথবা ঘরের বিপরীত এই তার অবাধ মুক্তি থেকে মুক্তি চায়, চায় বন্ধন, হৃদয়ের, অপরের হাতের হাত-কড়ায়?

"বলছিলে শ্রীবৃন্দাবনধাম কখনো দেখোনি, চলো তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে

আসি। অনেকদিন ঘরে বসে কাটল, পথের নেশা আবার যেন টানতে চায়। সত্যি, যাবে নতুন গোঁসাই ?"

চব্বিশ ঘণ্টায় বিশ্বাস অবিশ্বাসের জবাব দিয়ে কমললতা আবার বলল, "কাল পঞ্চমী, বেরিয়ে পড়বার ভারি শুভদিন—চলো। আর পথের ধারে রেলের পথ তো রইলই—ভাল না লাগে ফিরে এসো, আমি বারণ করব না।" রাজলক্ষ্মীরই প্রতিধ্বনি।

ঘরে যাবার আগে আরও একবার কমললতার দিকে তাকিয়ে শ্রীকান্ত নিঃসংশয় হল, কমললতা "পরিহাস করিতেছে না। আমি যে মাত্র উপলক্ষ তাহাও নিশ্চিত (এ সম্বন্ধ শ্রীকান্তর রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধেও ছিল) কিন্তু যে-কারণেই হোক এখানের বাঁধন ছিঁড়িয়া এই মানুষটি পলাইতে পারিলেই বাঁচে—তাহার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব সহিতেছে না।" শ্রীকান্ত তার একটা কারণও বের করেছিল, সে কমললতার কুৎসিত ইতিহাস এবং তার প্রত্যক্ষ আসামী ও সাক্ষী—কমললতার 'স্বামী' !

শ্রীকান্তকে কমললতার আহ্বানে কোন কৌতুক, কোন পরিহাস আন্তরিকতা-হীন কোন কৃত্রিমতা ছিল না। সে আহ্বান সত্য, কমললতা প্রথম দর্শনেই শ্রীকান্তকে একান্ত করে পেতে চেয়েছে, সেই কারণেই আখড়া তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে, পথ চেয়েছে মধুরতর এবং আমন্ত্রিত সঙ্গীর কাঙ্খিত সান্নিধ্যে কল্পনা হয়েছে মধুরতম। এই হৃদয়বৃত্তি দেহ ছাড়িয়ে নয়, শ্রীকান্তর মোহও দেহাতীত নয়। জানিনে সহজিয়া তত্ত্বে এর কি ব্যাখ্যা হবে। পরবর্তী ঘটনাবলীতে পরিষ্কার হয়ে যাবে সেই কুৎসিত ইতিহাসের সাক্ষী স্বামী তাকে আখড়ায় বন্দী করেনি, ঐ একদিন শ্রীকান্তর কাছে কাহিনী বিবৃত করা ছাড়া দ্বিতীয়বার তার আবির্ভাব ঘটেনি অথবা এই যে কমললতা একা ভোরবেলায় ফুল তুলতে যেতো তাতেও কোন বিপদ ঘটায়নি, ঘটাতে পারত। আবার যেদিন কমললতা সত্যিই বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সেদিনও কোন বিঘ্ন ঘটেনি। কমললতা নির্বিঘ্নে গহরের বাড়ী আনাগোনা করেছে ঐ লোকটি একবারও পথরোধ করে দাঁড়ায় নি। সুতরাং, শ্রীকান্ত কমললতার বাঁধন ছেঁড়বার যে যুক্তি বা ঘটনা আবিষ্কার করেছে তা কমললতার মনোবাঞ্ছার সঙ্গে একান্তই বিসদৃশ। শ্রীকান্ত রাজী হলে চিরকাল সে তারই হয়ে এবং একান্ত মানবীরূপে থাকত না এমন কোন প্রতিশ্রুতি কমললতার আচরণে প্রকাশ পায়নি। প্রগলভতার বৈশিষ্ট্য ছাড়া সে অতি সাধারণ নারী। শ্রীকান্তর আবিষ্কারটা এই :

"শেবালাচ্ছন্ন শীর্ণকায়া মন্দস্রোতা" নদীর "লতাগুল্ম কণ্টকাকীর্ণ তটভূমি" সলগ্ন "সর্পসঙ্কুল বেতসকুঞ্জ ও সুবিস্তৃত বেণুবন"—যেখানে অনভ্যস্ত পদক্ষেপে গা ছমছম করে সেইখানে—"খর্ব্বাকৃতি রোগাগড়ন," "খুব কালো নয়" "মুখের নীচের দিকটা যেমন অস্বাভাবিক রকমের ছোট চোখের ভ্রূ দুটাও তেমনি অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘপ্রস্থে বিস্তীর্ণ", "প্রকৃতির কোন হাস্যকর খেয়ালে একজোড়া মোট-গোঁফ ঠোঁটের বদলে কপালে গজাইয়াছে," একটি মানুষ। এ যেন একটু পরেই কমললতার যে কুৎসিত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হতে চলেছে তারই এক জীবন্ত-ভূমিকা। লোকটারও "গলাজোড়া তুলসীর মালা, পোষাক পরিচ্ছদও অনেকটা বৈষ্ণবদের মত, যেমন ময়লা তেমনি জীর্ণ।" এর মুখেই কমললতার অতীত জীবনের যবনিকা উত্তোলিত হ'ল। কমললতার আসল নাম ঊষাঙ্গিনী, বাড়ী সিলেটে, কমললতার বাপ নিজে থেকে ওদের কণ্ঠি বদল করিয়েছিলেন। লোকটি জানিয়ে গেল, "পেয়াদা সঙ্গে করে একেবারে ঝুঁটি ধরে টেনে বার করে" আনবে কমললতাকে।

লক্ষ্যণীয় যে, ঝুঁটি-ধরে নিয়ে যেতে সঙ্কল্পবদ্ধ এই লোকটির গতিবিধির খবর কমললতা রাখত (এবং কমললতা যে গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিয়তই ভিক্ষান্ন আনত এখবরও ইতিপূর্বে প্রকাশিত) কিনা ধরে পড়েছে পুষ্পচয়নকালে না কোন ভিন্‌গাঁয়ে। আশ্চর্য! এবং ঐ গা ছম্‌ছম্‌-করা জায়গায় শ্রীকান্তর সঙ্গে লোকটার যে দেখা ও আলাপ হ'ল এও কমললতা দেখেছে এবং তাদের সম্পর্কে প্রশ্নগুলো এমনভাবে রেখেছে যেন শ্রীকান্তর মন লোকটির কথায় নিঃসংশয় না হয়। পক্ষান্তরে, কমললতা ফরিয়াদী পক্ষের সওয়ালের জবাবে তার নিজস্ব আত্মসমর্থক সওয়াল শ্রীকান্তকে শোনাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। এই উৎকণ্ঠা কেন? শ্রীকান্তর কথা—যে কাল চলে যাবে, হয়ত আর কখনো দেখাও হবে না তাকে আত্মকথা শোনাবার জন্য এই উদ্বেগ কেন? জানিনে, সহজিয়া তত্ত্বের বিচারে এর কি ব্যাখ্যা হবে অথবা এর সঙ্গে সহজিয়ার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা। কিন্তু এই মাত্র যা হ'ল তা একান্তই মাটির, মানবের এবং অতি তুচ্ছ পরিচিত ধারার যৌনকাহিনীর এক দৃশ্যপট। শ্রীকান্ত যে তার অনুরাগী কমললতা তা ইতিমধ্যে হৃদয়ঙ্গম করেছে, কিন্তু উদ্বেগ এইখানে যে, বর্ণিত কাহিনী (যা আদৌ অসত্য নয়) শ্রীকান্তর আকর্ষণকে যেন বিরাগে শিথিল করে। সে শ্রীকান্তকে হারাতে রাজি নয়। ফাঁসীর আসামীর মতো সে তাই জবাব দিহির জন্য উদ্বিগ্ন। শ্রীকান্তর এই অনুমান ভিত্তিহীন যে, এই লোকটির জন্য কমললতা আখড়া ছেড়ে

যেতে ব্যস্ত হয়েছে। কোন ঘটনায়ই তার সমর্থন পাওয়া যায় না। কেননা, লোকটা পেয়াদার ভয় দেখিয়ে গেলেও, শ্রীকান্তর অবর্তমানেও, তাকে দ্বিতীয়বার ঐ তল্লাটে দেখা যায়নি। কমললতা নিজের স্বার্থেই শ্রীকান্তর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছে। ঐ কুৎসিত কাহিনী শোনার পর, মৌখিক আশ্বাস সত্ত্বেও, শ্রীকান্তর মন বিরূপ হ'তে পারে এমন আশঙ্কাকে সে মনে স্থান দিতে চায়নি। তাই ঠিক রাজলক্ষ্মীর মতই বলেছিল, 'কাল তোমাকে যেতে দেবনা' এবং 'যেতে কোন দিনই দেবনা; তারপর মশারিটা ঠিকমত গোঁজা আছে কিনা দেখবার আছিলায় "সেই অন্ধকারেই হাত বাড়াইয়া বিছানার সকল দিক পরীক্ষা করিয়া বলিল, ঘুমোও গোঁসাই—আমি চললুম। এই বলিয়া সে পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেল এবং বাহির হইতে অত্যন্ত সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।"

কমললতার এই আচরণ নৈরাশ্যে বিরক্ত-চিত্ত শ্রীকান্ত বিদায় নেবার পূর্বরাত্রে হুবহু রাজলক্ষ্মীর আচরণের মতই :

"অনেক রাত্রে হঠাৎ এক সময়ে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিলাম। দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর হইতে আলোটা সরাইয়া, ওদিকে দরজার কোণে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল। সুমুখের জানালাটা খোলা ছিল, তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার শয্যার কাছে আসিয়া এক মুহূর্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিয়া লইল। তারপরে মশারির ভিতরে হাত দিয়া প্রথমে আমার কপালের উত্তাপ অনুভব করিল; পরে জামার বোতাম খুলিয়া বুকের উত্তাপ বারংবার অনুভব করিতে লাগিল।......তাহার পরে সে বোতাম বন্ধ করিল; গায়ের কাপড়টা সরিয়া গিয়াছিল, গলা পর্য্যন্ত টানিয়া দিল। শেষে মশারির ধারগুলা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া অত্যন্ত সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।"

পার্থক্যের মধ্যে কমললতার পরিচর্যাকালে দু'জনই সজাগ, রাজলক্ষ্মীর বেলায় শ্রীকান্তর কপট নিদ্রা। রাজলক্ষ্মী যতক্ষণ ধরে যত কাণ্ড করল তাতে একেবারে মৃত ছাড়া কোন জীবন্ত মানুষই নিদ্রিত থাকতে পারে না। আসলে, কমললতারও যা, রাজলক্ষ্মীরও তাই, প্রার্থিত, বাঞ্ছিত, দয়িতের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের, প্রকৃতি পুরুষের শাশ্বত লীলার অভিব্যক্তি। শ্রীকান্ত যে সাড়া দেয় নাই, সে কেবল সচেতন মনে সজাগ দেহে এই পরিচর্যা উপভোগ করবার জন্য।

একই প্রকৃতি। এর পর দুইজনের মধ্যে অসূয়াদিগ্ধ প্রতিযোগিতা চলল শ্রীকান্তকে কেন্দ্র ক'রে; দু'জনেই আপন আপন অনুদ্ঘাটিত কাহিনী

বলবেই তাকে। করুণা সঞ্চারের জন্য? অথবা প্রেম নিবেদনের এও এক ধারা? এতো নিছক ধর্মগুরু বা যাজকের কাছে স্বীকারোক্তি মাত্র নয়, এ অন্তরের আর এক প্রত্যাশার তাড়না। আপাতত জিত কমললতার।

"একদিন গহর গোঁসাইয়ের মুখে শুনলুম" ইত্যাদি; সর্ব শুনে কমললতার মনে প্রশ্ন জাগল, 'তার কি কেউ কোথাও নেই নাকি?' গহর গোঁসাইও ঠিক এই কথাই বললে। তারপর? "নাম শুনে যেন চমকে উঠলুম।"

গহরের মুখেই শুনল, বন্ধু দেখতে কেমন, বয়স কত, ইত্যাদি। "সব কাজ কর্মেই কেবল একটা কথা মনে হয় তুমি আবার কবে আসবে। তোমাকে নিজের চোখে দেখতে পাব কবে।" ইত্যাদি।

আখড়ায় ঢুকতে শ্রীকান্ত যে আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ় রহস্য ও খাঁটি বস্তু দেখবে ব'লে কপালের জোর কল্পনা করেছিল তার সঙ্গে এর কতটুকু মিল? পিয়ারী-রাজলক্ষ্মীর ঘরেও যা, কমললতার-উষাঙ্গিনীর ঘরেও তাই; দ্রুততায়ও দুজনের মধ্যে কত মিল! রাজলক্ষ্মী বার বার বৈঁচিফলের মালার কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, সেই তার চরম আবেদন; আর, কমললতা এ-জন্মের পূর্বকাহিনী ব'লেই ক্ষান্ত হয়নি, পূর্বজন্মের কথাও তুলেছে। অর্থাৎ, জনমে জনমে···প্রাণনাথ।

"বৈষ্ণবী কহিল, সবে কাল সন্ধ্যায় ত তুমি এসেচ, কিন্তু আজ আমার চেয়ে বেশি এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালবাসে না। পূর্বজন্ম সত্যি না হ'লে এমন অসম্ভব কাণ্ড কি কখন একটা দিনের মধ্যে ঘটতে পারে! একটু থামিয়া আবার সে বলিল, আমি জানি তুমি থাকতেও আসোনি, থাকবেও না। যত প্রার্থনাই জানাইনে কেন, দু'একদিন পরেই চলে যাবে। কিন্তু আমি যে কতদিনে এই ব্যথা সামলাব তাই কেবল ভাবি।"

শ্রীকান্তও স্বীকার করল যে, "এত অল্পকালে এমন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় রমণীর প্রণয় নিবেদন কাহিনী ইহার পূর্বে কখন পুস্তকেও পড়ি নাই; লোকের মুখেও শুনি নাই এবং ইহা অভিনয় যে নয় তাহা নিজের চোখেই দেখিতেছি। কমললতা দেখিতে ভালো, অক্ষর পরিচয়হীন মূর্খও নয়, তাহার কথাবার্তায়, তাহার গানে, তাহার যত্ন ও অতিথিসেবার আন্তরিকতায় তাহাকে আমার ভালো লাগিয়াছে······।" কিন্তু এর পর সমস্ত ব্যাপারটাকে খারিজ করতে শ্রীকান্ত নিজের পক্ষে যে সাফাই গেয়েছে তা সত্য নয়, একটা অপ্রয়োজনীয় নির্লিপ্ততা প্রকাশের উৎকণ্ঠা ছলনা মাত্র। তার যেতে সত্যিই তো কোন বাধা ছিল না;

সে যে যায়নি তার কারণ তার নিজের মধ্যেই ছিল। শ্রীকান্ত তা বোঝেনি, বুঝেছিল আর এক নারী রাজলক্ষ্মী—যে কমললতার মতই বলতে পারে 'আমার চেয়ে বেশি এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালবাসে না।' কেবল ছেলেবেলার বৈঁচিফলের মালা নয়, সে ইতিমধ্যেই তার যথেষ্ট প্রমাণ রেখেছে। খাঁটি বস্তুর সন্ধানে এসে শ্রীকান্ত শেষ পর্যন্ত এইটিই আবিষ্কার করেছে যে, কমললতা "রসের সাধনায় মগ্ন থাকিয়াও তাহার একান্ত নারী প্রকৃতি আজও হয় ত রসের তত্ত্ব পায় নাই, সেই অসহায় অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তি এই-নিরবচ্ছিন্নভাব-বিলাসের উপকরণ সংগ্রহে হয়ত আজ ক্লান্ত—দ্বিধায় পীড়িত। সেই তাহার পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত মন আপন অজ্ঞাতসারে কোথায় যে অবলম্বন খুঁজিয়া মরিতেছে, বৈষ্ণবী তাহার ঠিকানা জানে না।·······

শ্রীকান্তর একথাও ঠিক নয় যে, "আমার 'শ্রীকান্ত' নামটাকেই পাথেয় করিয়া সে খেয়া ভাসাইতে চায়।" না, গহরের কাছে শুনেছে, তার বন্ধু জাত বেজাত মানে না, সাতকুলে কেউ দেখবার নেই, ছন্নছাড়া। গহরও তার দয়িত, কিন্তু সেখানে ছিল অন্য এক বাধা ; সে স্বজাতীয় নয়। শ্রীকান্তর ক্ষেত্রে ঠিক সে বাধা ছিল না, অন্ততঃ কমললতার তাই ছিল অনুমান। সুতরাং শ্রীকান্তকে দেখে অবধি সে তাকেই স্বয়ম্বরার সুপাত্র স্থির করেছে এবং সর্বান্তঃকরণে আশ্রয় করতে চেয়েছে, শ্রীকান্তকে স্পষ্ট প্রাঞ্জল ভাষায় প্রেম নিবেদন করতে তার একটুও সঙ্কোচ হয়নি।

কিন্তু শ্রীকান্ত বর্ণভেদ মানে। সে জিগগেস করেছিল, কমললতা, তোমরা কি শুঁড়ি? কমললতা বলেছিল, না, সোনার বেনে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিল, কিন্তু তোমাদের কাছে ত প্রভেদ নেই। শ্রীকান্তকে আরও বলেছিল, তুমি গহরের মায়ের হাতে খেয়েচ (অর্থাৎ শুঁড়িই হই আর সোনার বেনেই হই, তোমার মত লোকের পক্ষে আমাকে গ্রহণ করার এসব আপত্তি টেঁকে না) কিন্তু শ্রীকান্ত এর কোন সোজা জবাব দেয়নি। ভুরুওয়ালা লোকটার প্রসঙ্গ উঠতে কমললতা তার গোড়ার কথাটা শোনাবার জন্যে মিনতি করল এবং অপ্রতিবাদী, হ্যাঁ, আগ্রহী শ্রীকান্তকে ব'লেও গেল। কেননা, মেয়েদের সহজ সংস্কার থেকে শ্রীকান্তর নির্লিপ্ততার ভান সে স্বীকার করে নি। সে জোর দিয়ে বলেছিল, কালকের পর আর আমাদের দেখা হবে না, এই কি তুমি সত্যিই বলতে চাও? কথাটা ভাল তো নয়ই, পীড়াদায়কও। তার যথারীতি বিয়ে হয়েছিল, কত বছর বয়সে তা বলে নি, বিধবা

হয় সতেরো বছর বয়সে এবং পদস্খলন হয় একবার মাত্র নয়, পাঁচ বছর কাল ধরেই ঐ কুৎসিত লোকটার চেয়ে "আপন" তার কেউ ছিল না। স্বামীর নাম শ্রীকান্ত এটা নিতান্তই আকস্মিক, কিন্তু এই লোকটাকে কমললতা যত ভালোবেসেছিল "অত ভালো বোধ করি কেউ কাউকে বাসেনি।" শুনে শ্রীকান্তর মত নিস্পৃহ মনও ছোট হয়ে গেছল। তারপর বেচারা পিতা নবদ্বীপে গিয়ে ২১ বছরের অন্তঃস্বত্বা মেয়ের সঙ্গে কণ্ঠিবদল করালেন মন্মথ নামে ঐ লোকটার সঙ্গেই।

কমললতা নাকি বিষ খেয়ে এই লজ্জা থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিল; এজন্য সে একটি নিস্পাপ ছেলের সাহায্য চাইতে লজ্জা পায়নি। ছেলেটি মন্মথরই পিতৃহীন ভাইপো, কমললতাদের বাসায় থাকত, কমললতার বাবা তাকে কলেজে পড়াতেন। মন্মথ প্রথমে দশ হাজার, পরে ঐ ছেলেটির নামে অপবাদ দিয়ে কমললতার বাবার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা আদায় করেছিল। যতীন কমললতাকে আত্মহত্যায় নিবৃত্ত ক'রে নিজেই নিষ্কলঙ্ক জীবনে মিথ্যা অপবাদের লজ্জায় আত্মহত্যা করল। এতে কমললতার মনে সত্যিকারের কোন আঘাত লেগেছিল? কিছুমাত্র অনুশোচনা হয়েছিল? না। পক্ষান্তরে, অবৈধ সংসর্গে যে সন্তান গর্ভে এসেছে মন্মথর সঙ্গে কণ্ঠিবদল হ'লে "তাকে হত্যা করতে হবে না সেই ভরসাতেই যেন অর্দ্ধেক বেদনা মুছে গেল। নবীন বৈষ্ণবের বেশে মন্মথর যখন দেখা মিলল, হঠাৎ মনের ভিতরটা যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল। সে আনন্দের কি ব্যথার ঠিক জানিনে, হয়ত দুইই ছিল, কিন্তু ইচ্ছে হ'লো উঠে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নি।" বৈধব্য জীবনের কলঙ্ক তাকে ম্রিয়মান করেনি, নবজীবনের সম্ভাবনায় তার চিত্ত ভরপুর, সেখানে প্রথম বিধিমত স্বামী শ্রীকান্তর লেশমাত্র অস্তিত্ব নেই। শ্রীকান্তর সঙ্গে দেখা হবার পর নামে চমকে ওঠা কমললতার বানানো, শ্রীকান্তকে পাবার জন্যই।

সব চাইতে মর্মান্তিক এই যে, যতীনকে বলা হ'ল ঊষা ওরফে কমললতাই একথা বলেছে ঊষার বাবাকে—অর্থাৎ, যতীনই ঊষার গর্ভসঞ্চারের কারণ—একথা শুনেও ঊষা অনুতপ্ত হয়নি; প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে এগিয়ে আসেনি—পাছে ঐ দুশ্চরিত্র লোকটার সঙ্গে একটা নামকা-ওয়াস্তে বিয়েটা ফস্‌কে যায়। সুতরাং, ঊষা ওরফে কমললতার শ্রীকান্ত নাম শুনে চমকে ওঠা ও বাকী কথাগুলো কথাই। এর পর সে আখড়ায় থাকতে আসক্ত হ'ল আশ্রম-সীমানার বাইরে গহরের প্রতি; কিন্তু বাধা ছিল জাতের—যদিও কমললতা নিজে জাত তুচ্ছজ্ঞান

করে। তবু গহর সম্পর্কে যেটুকু বালাই ছিল শ্রীকান্তর বেলায় তা ছিল না। তাই, কমললতার অশেষ অতৃপ্ত ক্ষুধা এবার শ্রীকান্তকেই নানা ছলে ও ছেলে-ভুলানো ছড়ায় গ্রাস করতে উদ্যত হ'ল। কমললতা আর কোন দিন মরণের কথা বলেনি. মরবার শত পথ থাকতেও কমললতার মানসিকতা ভগবদ্বিশ্বাসী বৈষ্ণবীর নয়—যৌনলোলুপ অতি সাধারণ অতৃপ্ত কামনাময়ীর।

এর পরও শ্রীকান্ত তার কথা শুনতে চেয়েছে এবং সে ব'লছে, সবটাই সত্য বলেছে কিনা কমললতার প্রকৃতি বিচার করলে তাও সন্দেহস্থল। সম্ভবত সে অর্ধসত্যই বলেছে, যা মিথ্যার চেয়েও কুৎসিত। ছলনাই তার প্রকৃতি। সে বলেছে, একটা মরা ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে তাকে বাঁচিয়েছে। কিসের বাঁচা? [অবৈধ মৃতবৎস গল্প উপন্যাসের একটা সহজ সমাধান] সে তো গর্ভস্থ সন্তানকে মারতে হবে না ব'লেই কণ্ঠিবদলে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। ছেলে মরে বেঁচে যাওয়ার কথা মন্মথকে পাবার সময় মনে হয় নি, মনে হয়েছে মন্মথর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর। সবৎসার পক্ষে প্রেম নিবেদন অসম্ভব না হ'লেও কিছু বাধা আছে, মন্মথর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর অবৈধ মৃত সন্তানই তার অন্য পুরুষের সঙ্গ লাভের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে দিয়েছে। এই তো বাঁচা? বাবাকে সে বলেছে, সে মরবে না, কিন্তু মাকে মিথ্যে বলতে বলেছে, অর্থাৎ, মা জানবেন, কলঙ্কিনী মেয়ে মরেছে। কমললতা আগাগোড়াই মিথ্যাচারী। তার এত লালসা যে তার পক্ষে মরা কঠিন ছিল। সে নতুন সঙ্গী নিয়ে বৃন্দাবন ধাম চলে গেল। "কত তীর্থে, কত পথে, কত গাছতলায় কেটে গেল।" সুতরাং, শ্রীকান্তর এ-প্রশ্ন অবান্তর হয়নি : "কত শত বাবাজীর কত শত সহস্র দৃষ্টির কথা ত বললে না, কমললতা?" কমললতা এর যে জবাব দিয়েছিল, তা শুনতে ভাল, বিশ্বাস্য নয়।

কমললতার মুখে ঘুরে ফিরে এক কথা, নিছক নরনারীর ভালবাসার কথা, দেহাতীত কোন কথাই নয়। "হ্যাঁ গোঁসাই, এ বয়সে সত্যিই কাউকে কখনো ভালোবাসোনি?" শ্রীকান্তর আত্মসমীক্ষায় জানা যায়, "এদিকে বয়স ত যৌবনের সীমা ডিঙ্গাইতেছে, এই সময়ে অযাচিত নারীপ্রেমের বন্যা নামিল নাকি?" 'অযাচিত' কথাটি শ্রীকান্তর বাড়াবাড়ি। নারীর সহজ সংস্কার অন্তত পুরুষের ভালবাসা বা ভালবাসার ঝোঁকটা বোঝে; ভাললাগা ও ভালবাসার মধ্যে সীমান্তরেখাটি অতি সূক্ষ্ম এবং আদৌ অনতিক্রম্য নয়। শ্রীকান্ত কবুল করেছে যে, কমললতাকে তার ভাল লেগেছে; সে ভাললাগা এমন যে, সে আখড়ায় কমল-

লতার ঘরে ও সান্নিধ্যে বন্দী হ'য়ে গেল। পুষ্পচয়নে ও কীর্তনে শ্রীকান্ত যেভাবে কমললতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে এমন কিন্তু সে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে চলে নি বা চলতে চায়নি। কমললতা তখনও রাজলক্ষ্মী—শ্রীকান্ত কাহিনী জানত না, শ্রীকান্তও চেপে গেছে, তাই, কমললতা ঐ প্রশ্নটি করেছে।

কমললতার মনে সন্দেহ ছিল শ্রীকান্ত তার প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়নি, শ্রীকান্তর কৃত্রিম ঔদাসীন্যই তার এ সন্দেহের কারণ; তাই, সে সংশয় নিরসনের জন্য বলল, এমন যদি কেউ তোমার থাকে, তুমি তাকে ভুলবে, কিন্তু সে তোমাকে না পারবে ভুলতে, না শুকোবে কখনো তার চোখের জলের ধারা।

একটু আগে সে যে রসতত্ত্বের কথাগুলো বলল এবং সে নিজে রসের খবর পেয়েছে বলে আভাস দিল তার সঙ্গে একথাগুলো একেবারেই বেমানান—দুটো আলাদা জগতের। সে বলতে চেয়েছে, যারা রসের খবর পায় না "প্রাণহীন নির্জীব পুতুলের সেবায় প্রাণ তাদের দুর্দিনে হাঁপিয়ে ওঠে, ভাবে এ কোন্ মোহের-ঘোরে নিজেকে দিনরাত ঠকিয়ে মরি।" কমললতা নিজেকে তাদের থেকে পৃথক করতে চেয়েছে।

অথচ এ কিন্তু কমললতারও কথা—তা সে যতই কেননা বারবার জোর করে নির্জীব পুতুলের উদ্দেশে সজীব বিশ্বাসে নমস্কার করুক। সন্দেহ নেই, সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে বাইরের প্রণম্য মূর্তিতে চিত্ত প্রতিষ্ঠিত ক'রে তন্ময় হয়ে যেতে এবং সেখানে তার নিষ্ঠার ও আন্তরিকতার অভাব নেই, কিন্তু তার স্বভাব ও প্রবৃত্তিকে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারছে না, জঙ্গলে পলাতক কুৎসিত দর্শন মন্মথর আনাগোনার দিকে তার নজর আছে, সাপের দেশে লোকেরা যেমন সাপের আনাগোনা সম্পর্কে সতর্ক থাকে। মন্মথ নামটাও তাৎপর্যময় যেমন শ্রীকান্ত নামটা। সে শ্রীকান্তকে হারিয়ে মন্মথ—মদন—কাম প্রবৃত্তিরই আশ্রয় নিয়েছিল, কম্‌সেকম তাই এই মন্মথকে নিয়েই বিভোর ছিল, সে নিছক দেহেরই ক্ষুধা, কিন্তু মানুষের মনও নাকি সমান্তরাল চলে এবং এজন্যই সে মানুষ, অন্য জানোয়ার থেকে পৃথক, তার সেই মন মন্মথর কাছে কোন খোরাক পায়নি, তাই শ্রীকান্ত অর্থাৎ বিষ্ণুও তার কাম্য। কিন্তু তারই আশ্রমের লাগোয়া বেণুবন ও লতাগুল্মের অরণ্যে সেই শিংওলা অশ্বখুর শয়তান অথবা মন্মথ তার সন্ধানে ঘোরে, বলে, সমনবলে সে তাকে আশ্রম থেকে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে এবং শ্রীকান্তর সঙ্গে মন্মথর, বিষ্ণুর সঙ্গে মদনের কি কথা হয় ঊষা ওরফে কমল তা কান পেতে শোনে, অর্থাৎ, মনের দ্বন্দ্বের কলরবের প্রতি সে সচেতন থাকে।

সঙ্গে মন্মথর নিভৃত সংলাপ তার শোনবার কথা নয়, কিন্তু শোনে। শরৎচন্দ্রের এই প্রতীকী প্রয়োগ সচেতন কিনা জানি নে, নামগুলো অবশ্যই সচেতন স্বাক্ষর, মনের গহন অরণ্যে মন্মথর গোপন বিচরণ ও শ্রীকান্ত-মন্মথ-মদন-বিষ্ণুর সঙ্গোপন সংলাপ প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু উষা ওরফে কমললতা আর পাঁচজন মন ও দেহে দ্বন্দ্ব দোদুল 'সাধারণ মেয়ে' না হ'লে এরকম স্পষ্ট প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীকান্তর কাছে প্রেম নিবেদন করতে পারত না। এই কারণেই, সময়ে-অসময়ে কমললতার সহচরী পদ্মার হাসিটা বাস্তবতায় এত তাৎপর্যময় হ'য়ে ওঠে।

শ্রীকান্ত জানতে চেয়েছিল তার যে উদাসীন বৈরাগী মন, মাত্র দুদিনের মধ্যে কমললতা জানল কি ক'রে? কমললতা দ্ব্যর্থহীন জবাব দিয়েছিল, তোমাকে ভালবেসেচি বলে। বিস্মিত বিমোহিত শ্রীকান্ত প্রশ্ন করেছিল, ভালবেসেচ এ কি সত্যি কমললতা? কমললতা বলেছিল, হ্যাঁ, সত্যি। শ্রীকান্তর প্রশ্নের উত্তরে আরও বলেছিল, তার জপ তপ রাত্রি দিনের ঠাকুরসেবা আরও সার্থক হয়ে উঠবে। "চল না, গোঁসাই, সব ফেলে দুজনে পথে পথে বেরিয়ে পড়ি?"

শ্রীকান্তর আত্মসমীক্ষায় এই একটা সংশয় ও সত্যপ্রকাশ হয়ে পড়েছে: "অবিশ্রাম ভাবের পূজো আর রসের আরাধনায় বোধ করি এমনি পরিণামই ঘটে।"

শ্রীকান্তও এই পরিণামে কম প্রশ্রয় দেয়নি। যাবার সকালটায় কমললতা যখন তাকে বিদায় দিতে প্রস্তুত তখন শ্রীকান্ত বলল, সে যাবে না, সে অন্ধকার থাকতে এবং আর কেউ না উঠতেই কমললতার সঙ্গে ফুল তুলতে গেল। কমললতা ফুল তোলে আর কীর্তন গায়। গান শুনে শ্রীকান্ত এমন মুগ্ধ যে, তার ইচ্ছে হয়েছিল "দ্রুতপদে পাশে গিয়া কিছু একটা বলিয়া এই অন্ধকার পথটা তাহার হাত ধরিয়া" চলে। এর আগে শ্রীকান্ত কমললতাকে অনুরোধ করেছিল সে যেন আখড়া ছেড়ে না যায়, অর্থাৎ, সে আবার আসতে পারে, আখড়ার নয়, কমললতার আকর্ষণেই।

ফুল তুলে মঠে ফিরলে তাদের দু'জনকে দেখে "পদ্মার বয়স কম বলিয়া সে-ই কেবল একটুখানি হাসিয়া মুখ নীচু করিল।···কমললতা সস্নেহ কৌতুকে তর্জ্জন করিয়া বলিল, হাসলি যে পোড়ার মুখি?"

শ্রীকান্তর বিকেলেও যাওয়া হ'ল না, কমললতার নির্দেশে ঠাকুরঘর সাজাবার কাজে কমললতাকে সাহায্য করতে লাগল। এমনি প্রত্যহ। বৈষ্ণবী এসে গান

গেয়ে তাকে জাগায়। এমনই এক সকালে কমললতার শরীর ভাল নেই ব'লে ফুল তোলার ভার শ্রীকান্ত নিল। রাজলক্ষ্মীর বেলায় শ্রীকান্তর ভালবাসার প্রকাশ এমনটি কখনো হয়নি। কমললতারই জিত। এমন কি, সেদিন ঠাকুরের সেবার ভারও "অনেকখানি আসিয়া পড়িল আমার 'পরে। বৈষ্ণবী দেখাইয়া দেয়, আমি করি সব।···আজও যাওয়া বন্ধ রহিল।" এমনি আরও দুই দিন কাটিল। নবীন এসে পড়াতে, গহরের কোন সন্ধান নেই খবর পেয়ে শ্রীকান্তকে আশ্রম থেকে বেরোতে হ'ল।

আখড়া থেকে বেরিয়ে এসে শ্রীকান্ত একটা সত্য আবিষ্কার করল। "নবীনের কথাগুলো মনে মনে তোলাপাড়া করিতে করিতে অকস্মাৎ বিদ্যুৎবেগে একটা সন্দেহ জাগিল—বৈষ্ণবী কিসের জন্য চলিয়া যাইতে চায়। সেই ভুরুওয়ালা কদাকার লোকটার কণ্ঠিবদল-করা স্বামীত্বের হাঙ্গামার ভয়ে কদাচ নয়—এ গহর। ···অনতিক্রম্য বাধায় চিরনিরুদ্ধ প্রণয়ের নিস্ফল চিত্তদাহ হইতে এই শান্ত আত্মভোলা মানুষটিকে অব্যাহতি দিতেই বোধ করি কমললতা পলাইতে চায়।"

কিন্তু কমললতাও কি গহরকে ভালবাসে নাই? শ্রীকান্তর আশ্রম-ত্যাগের পর তার অনুপস্থিতিকালে গহরের মৃত্যু শয্যাপার্শ্বে সেবারতা রমণীটি কি সেই ভালবাসারই পরিচয় দেয়নি? গহরের চাইতে সেই নির্জ্জীব পুতুলের প্রাণ প্রতিষ্ঠার নিষ্ঠাই যদি তার আরও বড় হ'ত সে কি আখড়া থেকে নাম খারিজের ঝুঁকি নিয়ে গহরের কাছে থাকতে পারত?

পালানোর ইচ্ছাটা সে-কারণে নয়। শ্রীকান্তর ক্ষেত্রে সে অনতিক্রম্য বাধা ছিল না এবং স্পষ্ট করে শ্রীকান্তকে যা বলেছে তারপর গহরও মিথ্যে হয়ে গেছে। গহর আবার তখনই সত্য হ'য়ে উঠেছিল যখন শ্রীকান্তর ফিরে-আসা সম্পর্কে তার মন সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছিল। নারীরূপে রাধার একটি 'কান্ত' চাই।

এও কি সহজিয়ার একটা ধরণ? জানিনে। শরৎচন্দ্র কমললতাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, তার আচরণে যা প্রকাশ পেয়েছে, তার অতীত কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তা আদৌ মহত্তর বলা যায় না। গহরের কাছে ফিরে যাবার আগে সে শ্রীকান্তর কাছে একটা নিশ্চিত আশ্বাস চেয়েছিল।

"নতুন গোঁসাই, আবার আসবে ত?"

"তুমি থাকবে ত?"

"তুমি বলো কতদিন আমাকে থাকতে হবে?"

"তুমিও বলো কতদিনে আমাকে আসতে হবে ?"

কমললতা বলেনি। দশদিন পর শ্রীকান্ত আখড়া ছাড়ল। কিন্তু খুব যে একটা ইচ্ছায় তা নয়।

রাজলক্ষ্মী অনেকবার মিনতি ক'রে বলেছে, কেন বিদেশে যাবে? কিন্তু শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মী-নির্ভর হয়ে থাকতে চায় নি। অথচ কমললতার সঙ্গে প্রথম সন্ধ্যা থেকে, নবীনের তাগিদে দশম দিনান্তে, আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসে কলকাতার পথে ট্রেনে তার মনে হল: "কি করিব বিদেশে গিয়া ? কি হইবে আমার চাকরিতে ?·· কেবল কমললতাই ত বলে নাই, দ্বারিকা গোঁসাইও একান্ত সমাদরে অহ্বান করিয়াছিল আশ্রমে থাকিতে।" এবং আরও কিছু বলেছিল: "কমললতা কেঁদে কেঁদে সারা হ'য়ে যাবে।" সুতরাং শ্রীকান্ত স্থির ক'রে ফেলল "সমস্তই চুকাইয়া দিয়া কালই আবার আশ্রমে ফিরিয়া যাইব।" অর্থাৎ পিয়ারী গেল, অভয়া গেল, উষাঙ্গিনী কমললতাই শ্রীকান্তর জীবনে সর্বস্ব হয়ে দেখা দিল।

কলকাতায় এসে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে নতুন ক'রে পেল এবং রাজলক্ষ্মী নারী-চিত্তের স্বাভাবিক কৌতূহলে খুটিয়ে খুটিয়ে আখড়ার কমললতার সব খবর জেনে নিল, শ্রীকান্তর মুখে কথিত অকথিত কমললতার গুণগান শুনে ঈর্ষান্বিত হল। শ্রীকান্তর 'নতুন গোঁসাই' নামটাও পছন্দ করল এই কারণে যে, "তবু হয়ত আচমকা কখনো কমললতা বলে ভুল হবে। তাতেও স্বস্তি পাব।"

রাজলক্ষ্মী মুরারিপুর আখড়ায় যাবে শুনে শ্রীকান্ত শঙ্কিত। রাজলক্ষ্মী বলেছিল: "তোমাকে ভালবাসে কমললতা, আর তাকে ভালবাসে আমাদের গহর দাদা।····তোমাকে সে ভালবাসে এই নিয়ে তাকে লজ্জা দিতে যাব আমি? তোমাকে ভালবাসাটা কি অপরাধ? আমিও ত মেয়ে মানুষ।"

রাজলক্ষ্মী আখড়ায় এল। রাজলক্ষ্মী যখন কমললতাকে বলল, "এতদিন শুধু তোমার কথাই ওঁর মুখে শুনেছি, তখন কমললতার মুখ যেমন রাঙা হয়ে উঠল, পদ্মাও ফিক ক রে হেসে মুখ ফেরালো। পরিচয়ের জন্য সবাই উদগ্রীব হইয়া উঠিল।" বিশেষ কমললতা, তার ধারণা ছিল শ্রীকান্ত 'এ বয়সে সত্যিই কাউকে ভালবাসেনি' তার 'মনটা আসলে বৈরাগীর মন, উদাসীনের মন—প্রজাপতির মত বাঁধন তুমি কখনো কোনকালে নেবে না।" এহেন কমললতার কৌতূহলী চোখ রাজলক্ষ্মীর নজর এড়ায়নি। বৃন্দাবনে দেখা হবার কৌতুক সেরে রাজলক্ষ্মী পরিচয়টা সেরে ফেলল: "আমরা দু'জনে এক গাঁয়ে এক গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়তুম—ছুটিতে

যেন ভাই বোন এমনি ছিল ভাব।··· আমি বলি, ওগো, হ্যাঁগো, আজকাল বলচেন নতুন গোঁসাই বলে ডাকতে। বলেন, তবু স্বস্তি পাবো।···পদ্মা হঠাৎ হাততালি দিয়া উঠিল।"

রাজলক্ষ্মী যেন কোন কিছুতেই হারতে রাজি নয় কমললতার কাছে, অথবা কমললতাকে সব বিষয়ে পরাজিত করবার এবং শ্রীকান্ত সর্বতোভাবে ফিরে পাবার সঙ্কল্প নিয়ে এসেছিল। শ্রীকান্ত কবুল করেছিল, "তোমার আমি যোগ্য নই। রূপে, গুণে, রসে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, স্নেহে সৌজন্যে পরিপূর্ণ যে ধন অযাচিত পেয়েছি সংসারে তার তুলনা নেই।"

শ্রীকান্ত আত্মসমীক্ষায় বলল, কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের কথাটা কমললতা টের পাইল এবং আরও একজন বোধ হয় টের পাইলেন, তিনি বড় গোঁসাইজী নিজে। যেটুকু-বা আড়াল ছিল তাও কমললতা হৃদয়াবেগে কিন্তু কৌশলে উদ্ঘাটিত করল: "তোমাদের বিয়ের বছরটি মনে আছে, ভাই ?" হাতে ঠাকুরের প্রসাদী চন্দন আর মালা। জবাব সবই রাজলক্ষ্মী দিয়েছিল, মায় সেই বৈঁচিফলের মালা। বড় গোঁসাই আশীর্বাদ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি যেদিন এ প্রেম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করবে'। রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হয়ে বাধা দিয়ে বলেছিল, 'বরঞ্চ আশীর্বাদ করো, এমনি হেসে খেলেই একদিন যেন ওঁকে রেখে মরতে পারি।' কমললতা, নিঃসংশয় হয়ে গেল—নতুন গোঁসাইর দরজায় প্রহরী রাজলক্ষ্মী মোতায়েন। কিন্তু কমললতার প্রতি শ্রীকান্তর আকর্ষণ, কমললতা জানত, শ্রীকান্ত জানত, রাজলক্ষ্মীও জানত। কিন্তু নবীনের সাঙ্ঘাতিক চিঠি পেয়ে আবার যখন শ্রীকান্ত গহরের নামে মুরারিপুরের আখড়া মুখো হ'ল তখন রাজলক্ষ্মীর সংশয়ী মন শ্রীকান্তকে একা ছেড়ে দিতে সায় দেয়নি, কিন্তু ইতিমধ্যে সে যেভাবে শ্রীকান্তর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং শ্রীকান্তর দিক থেকে সাড়া পেয়েছে তাতে মনে এই বিশ্বাসও ছিল যে, সে প্রবঞ্চিত হবে না। ভদ্র স্বভাব রাজলক্ষ্মী তাকে একাই যেতে দেয়। কিন্তু ইতিমধ্যে কমললতাও তার নিজের অবস্থা বুঝে নিয়েছে এবং রাজলক্ষ্মীর কাছে মনে মনে পরাজয় মেনেছে ; আখড়াচ্যুত হবার ঝুঁকি নিয়েও গহরের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। কমললতা রোজ আসত ; "শেষ তিনদিন তিনি খান নি, শোন্ নি, বাবুর বিছানা ছেড়ে একবারটি ওঠেন নি।" শ্রীকান্তর রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে আখড়া ছেড়ে যাওয়া অবধি গহরই ছিল তার প্রেমের অবলম্বন। গহরও কমললতার জন্য কিছু টাকা রেখে গেছে, যদি সে নেয় নিতে পারে।

শ্রীকান্তর সঙ্গে কমললতার আখড়ায় যখন দেখা হল তখন কমললতা আশ্রমের

কেউ নয়। তার নামে অপবাদ শ্রীকান্ত বিশ্বাস না করায় কমললতাও রাজলক্ষ্মীর মত বলেছিল, "অন্তর্যামীকে তার ভয় ছিল না, ভয় ছিল শ্রীকান্তকে।" কেন? রাজলক্ষ্মীর মনে শ্রীকান্তকে হারাবার যে ভয়, কমললতার মনেও সেই এক ভয়। গহরের টাকা না নিয়ে সে বলল, "দরকার হয় তুমি আছ কি করতে? অপরের টাকা নিতে যাব কেন?"

দু'জনের দেখা হ'ল স্টেশনে, কমললতা বৃন্দাবনে যাবে। শ্রীকান্ত সেই টিকিট কিনে দিল। একই ট্রেনে তারা উঠল। শ্রীকান্ত "নিজের হাতে" পাশের বেঞ্চে তার বিছনা করে দিল। এ শ্রীকান্তর স্বভাব নয়। স্বীকার করেছে সে কমললতার কাছে, "যা কখনো কারো জন্য করিনি—চিরদিন মনে থাকবে বলে। ...সত্যিই মনে রাখতে চাই, কমললতা। তুমি ছাড়া যে কথা আর কেউ জানবে না।" কোথায় তার সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে শ্রীকান্ত তাও জানতে চেয়েছিল। তার জবাবে কমললতা সকলের অগোচরে লুকিয়ে একটা প্রণাম করল শ্রীকান্তকে—শ্রীকান্ত নর, সে নারী, শ্রীকান্ত মানব, কমললতা মানবী। কিন্তু পরক্ষণেই এই নরনারী সম্পর্ক অতিক্রমণের জন্য, দেহের সম্বন্ধ উত্তরণে নিরুপায়ের একটা প্রার্থনা জানাতে "হাত বাড়াইয়া এই প্রথম আমার হাত ধরিল: আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও।" শ্রীকান্ত অনুরূপ সদুত্তর দিল বটে কিন্তু এ নৈরাশ্যের হতাশার মিলন—অসম্ভাবনার অশ্রুতে বাষ্পাচ্ছন্নতা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। শ্রীকান্তর প্রথম পর্বের সেই বড় মুখ করে বলা, "বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে" —তাও নয়। আজ রাজলক্ষ্মীর দিক থেকে কোন বাধাই নেই, অভ্রভেদী বঙ্কুর মা নেই, সর্বস্ব-সমর্পিতা এক মমতাময়ী নারী, রূপে-গুণে কাছেই টানে, দূরে ঠেলে না। সেখানে কমললতার অস্তিত্ব, উপস্থিতি মানেই দ্বন্দ্ব। একজনকে যদি বিসর্জন দিতেই হয় তো সে কমললতা, রাজলক্ষ্মী নয় এবং তা ঠাকুরের নামে শপথ করার চাইতে নিরুপায় মানুষের আর তো সহজ কোনো পথ রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত-কমললতার সমাজে নেই।

অন্ধকার

মায়া বসু

সীতাংশু, এ গল্প তোমাকে নিয়ে লিখিনি।

এ গল্প শম্পা ব্যানার্জীরও নয়—

আমি কি কখনো স্বপ্নেও ভেবেছিলাম, এই গল্প আমাকে লিখতে হবে মীনাক্ষী দত্ত আর নীরেন মজুমদারকে নিয়ে?

জীবনের অনবদ্য অভিব্যক্তি নিয়েইতো গল্পের সৃষ্টি। কঠিন সত্যের সঙ্গে কিছুটা অলীক কল্পনা, কিছু কান্না কিছু ছায়া, কিছু আনন্দ কিছু বেদনা, কিছু আলো কিছু অন্ধকার, কিছু স্পষ্ট কিছু অস্পষ্ট সব কিছুর সম্পূর্ণ যোগ ফলই তো আমাদের এই জীবন!

কিন্তু যার সম্বন্ধে কিছু জানিনা, যাকে কোনদিনও দেখিনি, যার সঙ্গে এ জীবনে দেখা হবার কোন সম্ভাবনাই আমার আর নেই, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যাকে চিরদিনের মত হারিয়ে ফেলেছি, সেই মীনাক্ষী দত্তকে নিয়ে কেন আমার এই উদ্বেগ আকুলতা? সংশয় উৎকণ্ঠা? আশা নিরাশা? কেন মীনাক্ষী দত্ত তার কঠিন সমস্যার ঘন কালো ছায়াটা চিরস্থায়ী করে রেখে গেল আমার মনের মধ্যে? অবয়বহীন শুধু মাত্র একটা কল্পনার মূর্তি হয়ে মীনাক্ষী দত্ত এ কী একটা সুতীক্ষ্ণ যন্ত্রণার কাঁটা বিঁধিয়ে রেখে গেল আমার বুকের মধ্যে?

মানব জীবনের অনন্ত বৈচিত্রের একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের রহস্যময় প্রতিফলনে চিরদিন ধরে, চরম সংশয়ে সন্দেহে অবিশ্বাসে দ্বিধায় দ্বন্দ্বে আমি দুলে যাব একটা পেণ্ডুলামের মত। কোনদিনও সুস্থির হতে পারব না? না এদিকে, না ওদিকে। যে মুহূর্তে সীতাংশু, তোমার কথা আমার মনে পড়বে, তখনি নীরেন মজুমদারের অশরীরী কালো ছায়াটা তোমার আর আমার দুজনার মধ্যে আড়াল করে এসে দাঁড়াবে।

তারপর, হয়তো, হঠাৎ একদিন দেখতে পাব, সীতাংশু সরকার আর নীরেন মজুমদার, কখন দুই ব্যক্তিসত্তা এক অভিন্ন অখণ্ড হয়ে উঠেছে আমার অনুভবের পরিমণ্ডলে। শুধু ওই মীনাক্ষী দত্তের জন্যে।

হঠাৎ আসা প্রবল বন্যার মত মীনাক্ষী দত্ত আমার জীবনের ভিত্তিমূলে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফাটল ধরিয়ে দিয়ে গেছে। একটা আত্মবিস্মৃত ঘোরের মধ্যে, এক অতল শূন্যতার অন্ধকারের মধ্যে মীনাক্ষী দত্তের জটিল জীবনের শেষ পরিণতি, অসমাপ্ত উপসংহার একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত স্থির বিদ্যুতের, জলন্ত আগুনের অক্ষর হয়ে আমার বুকের ভেতর ক্ষোদাই হয়ে রইলো।

মীনাক্ষী অথবা নীরেন, 'কাউকেই আমি চিনি না। কখনো চোখেও দেখিনি। তবু ওদের দুটো সত্তার অস্তিত্ব আমার চেতন, অবচেতন অনুভূতির নিস্তরঙ্গ সরোবরে কী প্রচণ্ড অশান্ত উদ্দাম উত্তরঙ্গ ঢেউই না তুলেছিল?

সেদিন চৈত্রমাস। প্রহর শেষের আলোয় রাঙ্গানো নয়। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের আগুন ঝরানো রোদ, শানিত তরবারির মত ঝলসাচ্ছিল। ঝড়ের গতি নিয়ে গা-জ্বালানো বাতাস বইছিল। আকাশ মাটি, ইঁট কাঠের বাড়িগুলো, গাছপালা রাস্তাঘাট সব কিছুই পুড়ছিল। ওই সঙ্গে মনটাও পুড়ছিল। অপ্রকাশ্য আর এক দুঃসহ জ্বালায় যন্ত্রণায় অন্তর্দ্বন্দ্বে।

সমস্ত বাড়িটায় অস্বস্তিকর নৈঃশব্দ। আমার ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। বাইরে থেকে এতটুকু আলো বাতাস আসছিল না। বন্ধ দরজা জানলার কপাট-গুলোকে আমি চোখে দেখতেও পাচ্ছিলাম না। ওরাও যেন অন্ধকারের ছায়া হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছিল, এই ভর দুপুরে এই প্রখর দুপুরে, এখন আমি যদি আমার ঘরের সব কটা দরজা জানলাগুলো খুলেও দি, তাহলেও আমার ঘরে এতটুকু আলোবাতাসও আসবে না। এতটুকুও না। অন্ধকার হয়েই থাকবে।

আমি শুধু আমার চারদিকে চারটে সাদা কংক্রীটের দেয়াল দেখতে পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল. ওই দেয়াল চারটে অতি সন্তর্পণে ক্রমশ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমাকে জানতে, অথবা বুঝতে না দেবার জন্যে যদিও ওরা যথেষ্ট সচেষ্ট, তবু একথা আমি আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারছিলাম।

হঠাৎ আমি ভয় পেয়েছিলাম। ভীষণ ভয়। যে ভয়ের কোন সংজ্ঞা নেই। যে ভয়ের কারণ অন্য কাউকে বলে বোঝানো যায় না।

সীতাংশু, সেই মুহূর্তে আমার তোমার কথা মনে পড়েছিল, ছুটে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা কানে চেপে ডায়াল করেছিলাম। তোমারই পরিচিত নম্বরে।

কিন্তু ওপাশে রিং বাজার কোন শব্দ হল না। তার বদলে কানে এলো একটি রিনরিনে মেয়েলি কণ্ঠস্বর। "নীরেন, নীরেন মজুমদারকে চাই আমি।"

"আপনি কোথা থেকে বলছেন?"

"বলুন, ভীষণ দরকার—মীনাক্ষী দত্ত তার সঙ্গে একবার কথা বলতে চায়।"

ক্রশ-কানেকশন। হামেশাই যেমন হয়ে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি রিসিভারটা রেখে দিলাম।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর আবার রিসিভারটা কানের ওপর চেপে ধরলাম। আর এই দ্বিতীয়বার, অন্যায়, অনুচিত জেনেও, কোন মতে সেটাকে ছাড়তে পারলাম না।

সেই কণ্ঠস্বর! "নীরেন, এই শেষবারের মত তোমাকে ডাকছি। আমি আর সইতে পারছি না। আমি আর সইতে পারছি না নীরেন।"

একটা অন্ধ রুদ্ধ যন্ত্রণা সহসা যেন মীনাক্ষীর হৃৎপিণ্ডটাকে বিদীর্ণ করে রাশী রাশী কান্নার স্রোত হয়ে ফেটে পড়লো।

নিষ্প্রাণ নির্জীব যন্ত্রটার ভেতর দিয়ে একটি আহত তীরবিদ্ধ রক্তাক্ত হৃদয়, আর একটি হৃদয়ের তটভূমিতে আছড়ে পড়লো। দিশাহারা ব্যাকুলতায়।

"মীনাক্ষী, মিনু, এমন করছো কেন? শান্ত হও। ধৈর্য্য ধরো।"

একটা প্রচণ্ড স্রোতাবর্তকে শান্ত, সংযত করার জন্যে নীরেনের আশ্বাসভরা কণ্ঠস্বর যেন সমবেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

"বলতে পার, আর কতদিন ধৈর্য্য ধরে থাকবো? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, আর কত অন্যায় অত্যাচার লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করবো? আমার সহ্য শক্তি দেখে তুমিই না আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলে? আমার এই দুঃসহ অবস্থা দেখে তোমার দুচোখেই না জল এসে গিয়েছিল? আমাকে মুক্তির পথ তুমিই না দেখিয়ে দিয়েছিলে? এই নরক থেকে উদ্ধার করবার জন্যে টেনে তোলার জন্যে তুমিই না দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছিলে?"

"মিনু, তুমি আজ বড় অশান্ত, বিচলিত—উত্তেজিত—"

"না নীরেন না। তুমি ভুল বুঝো না। আজ আমি একেবারে শান্ত। আজ আমি আমার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েই তোমাকে ডাক দিয়েছি। এতদিন ধরে তুমিই আমাকে বার বার ডেকেছ। আমি সাড়া দিতে পারিনি। মন স্থির করতে পারিনি। আজ আমি মন স্থির করেই তোমায় ডাকছি। এই নরক থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার কর নীরেন। আমি মরে যাচ্ছি।"

"তুমি—তুমি কী বলছো মীনাক্ষী। তুমি কী করতে চাও?"

"এতদিন তুমি যা চেয়েছিলে, যা বলেছিলে; আজ আমিও তাই চাই। সারা মনপ্রাণ দিয়ে আমি মুক্তি চাই। এই ঘর সংসার আমার নয়। কোনদিনও ছিল না। এখান থেকে তুমি আমাকে নিয়ে চলো নীরেন।"

"কোথায়! তোমাকে আমি কোথায় নিয়ে যাব মিনু? তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যেতে চাও?"

"যেখানে তুমি আছো, যেখানে তুমি থাকবে, সেইখানে। তোমার কাছে। ওকে আমি আর সহ্য করতে পারছিনা নীরেন। ওই চরিত্রহীন ইতর লোকটা প্রত্যেক মুহূর্তে আমাকে একটু একটু করে মরণের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এখানে আর একটা দিনও থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। তুমি আমাকে অতবড় শাস্তি দিও না নীরেন। আমাকে বাঁচতে দাও। আমাকে বাঁচাও নীরেন। তুমি তো আমাকে ভালবাসো নীরেন।"

মীনাক্ষীর করুণ আর্ত হাহাকার আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে তুললো। প্রখর চৈত্রের নিদারুণ অগ্নি তরঙ্গ অস্বীকার করে আমার সমস্ত শরীর যেন বরফের মত শীতল হয়ে এলো।

ও কি মীনাক্ষী দত্তের কণ্ঠস্বর? না শম্পা ব্যানার্জীর?

কার দুঃসহ দুর্বহ জীবনের ব্যর্থ হাহাকারের প্রতিধ্বনি আমার এই নির্জন নিঃসঙ্গ ঘরের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত অনুরণিত হয়ে উঠলো?

সেই মুহূর্তে আমি যেন মীনাক্ষী দত্তকে স্পষ্ট ভাবে আমার দুচোখের উৎকণ্ঠ দৃষ্টির সম্মুখে দেখতে পেলাম। আমার মতই রিসিভারটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মীনাক্ষী দত্ত। অস্ফুট কান্নায় ওর সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। আর—আর—

আর, বোধ হয় যখন আমি আয়নার সম্মুখে দাঁড়াই, সেখানে প্রতিবিম্বিত আমার মুখের দিকে তাকাই, তখন চোখের কোলে যে কালির চিহ্ন, যে রেখাগুলো আমার নজরে পড়ে, মীনাক্ষীর বিবর্ণ মুখে চোখে সেই ক্লান্তির, আর্তির রেখা। হৃদয়ের গভীর থেকে, আত্মা থেকে উৎসারিত অসহনীয় যন্ত্রণার চিহ্নরেখা।

"তোমার দুঃখ আমি বুঝি মিনু। মনে করে দেখো, পাঁচ বছর আগেই আমি তোমাকে পালিয়ে আসতে—তোমার স্বামীকে ছেড়ে চলে আসতে বলেছিলাম। তখন যদি তুমি আমার কথা শুনতে, তাহলে এতকাল ধরে এই অপমান এই লাঞ্ছনা তোমাকে সহ্য করতে হত না।"

"নীরেন, সেদিন আমি বড় দুর্বল ছিলাম। অসহায় ছিলাম। দিনের পর

দিন, মাসের পর মাস তুমি আমাকে শক্তি আর সাহস জুগিয়েছ। সেদিনের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত এই এতগুলো বছর ধরেও কি শেষ হয় নি? তুমি আমাকে বাঁচাবে, আশ্রয় দেবে বলেই আজ আমার সব ভয় সব সংশয় সব দুর্বলতা ঘুচে গেছে। তুমি আছো, তুমি আমাকে ভালবাস বলেই আমি আজও আত্মহত্যা করিনি।"

"আমি তোমাকে চিরদিনই ভালবাসি মীনাক্ষী। পাঁচ বছর আগেও যেমন বাসতাম, আজ তেমনই বাসি।"

"জানি নীরেন। তাই আমি এতদিন পরে সব সংস্কার তুচ্ছ করতে পেরেছি। ওই নিষ্ঠুর অত্যাচারী লোকটাকে আর ভয় করি না। তোমার বাড়ানো হাত দুখানা আমি শক্ত করে ধরে আছি নীরেন। শোনো, তোমাকে ফোন করার জন্যে আমি এই ভর দুপুরের রোদ্দুরে বাড়ি থেকে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি। আমার বাড়িতে তো ফোন নেই। আজ কাশেম আলী অ্যাভেন্যুর রূপশ্রী সিনেমা হলের কাছাকাছি সেই শিরীষ গাছটার তলায় আমি ঠিক রাত নটার সময় তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবো। তুমি একটা ট্যাক্সি করে এসে আমাকে তুলে নেবে। মনে থাকে যেন, ঠিক রাত নটা। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। মনে থাকে যেন নীরেন—তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। রাত নটায় ঠিক এসো।"

ঝড়ের মত কথাগুলো শেষ করে, শেষ মুহূর্তে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মীনাক্ষী আবার বললো, "নীরেন আমাকে বাঁচাও।"

মীনাক্ষীর কথা শেষ হল। খট্ করে টেলিফোন কেটে দেবার শব্দ পেলাম ওদিক থেকে।

কিন্তু এ কী! এ কী কথা বলছে নীরেন!

বিকৃত ভীত উত্তেজিত কর্কশ কণ্ঠস্বর—"মীনাক্ষী শোনো, পাগলের মত হঠাৎ যা-তা একটা কিছু করে বোস না। আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই বলেছি—মিনু প্লীজ ধৈর্য্য হারিও না—আরো কিছুদিন সময় আমায় দাও—"

নীরেনের কথা শেষ হবার আগেই কানেকশন কেটে গেল। বিচিত্র সংলাপ শেষ হল।

একটা অতি বিচিত্র, অতি নাটকীয় ঘটনার, নাকি জীবন্ত অভিনয়ের দর্শক আমি, হতবুদ্ধি বিমূঢ় বিহ্বল মেয়ে আমি, এতক্ষণ পর রিসিভার ধরে রাখা হাতটায় ঝিন্ ঝিন্ অস্বস্তিকর বেদনা অনুভব করলাম।

আস্তে আস্তে ওটাকে টেলিফোনের ওপরে রেখে দিলাম।

আমার নির্জন ঘরের নিঃশব্দ পরিমণ্ডল সহসা যেন শব্দময় হয়ে উঠলো। মাথার ওপরকার ঘুরন্ত পাখার একটানা ক্ষীণ সুরেলা যান্ত্রিক আওয়াজটা এইবার যেন বড় বেশী করে কানে বাজলো। কানে এসে পৌঁছলো ছুটন্ত গাড়ির শব্দ, হর্ণের শব্দ, ফেরিওয়ালাদের হাঁক ডাক। এই সমস্ত বাইরের জগতের শব্দ তরঙ্গ ছাপিয়ে কোথায় কতদূরের দুটি অচেনা অজানা নরনারীর, প্রেমিক-প্রেমিকার বেদনাময় খণ্ড কাহিনী এতক্ষণ আমাকে সম্মোহিত, মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। এখন মীনাক্ষীর সকরুণ বেদনা আমার হৃদয়ের এক অদৃশ্য গোপন ক্ষতকে খুচিয়ে খুচিয়ে রক্তাক্ত করে তুলে আমাকে অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির করে তুললো।

আমার মনে হল, এতক্ষণ ধরে আমি এ কার কাহিনী শুনছিলাম? এ-কাহিনীর মধ্যে নতুনত্ব তো কিছুই নেই? সাতপাকে বাঁধা স্বামীত্বের খেয়ালী-পনায় চরিত্রহীনতায় অত্যাচারে একটি মেয়ের বিবাহিত জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে। এতকাল প্রাণপণে সহ্য করেছে। কিন্তু আর পারছে না। পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাইছে এই ব্যর্থ অসুখী জীবনের। পুঞ্জীভূত অসন্তোষের বারুদ এতদিন পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়েছে।

মীনাক্ষী নামের মেয়েটা অন্ধকূপ থেকে আলোর সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে।

কিন্তু নীরেন? সে ওকে বাঁচাবে তো?

এতদিন সে ওকে নতুন জীবন, নতুন সুখের সন্ধান দিয়ে প্রলুব্ধ করে এসেছে। তাকে ভালবেসেছে। তাকে ভরসা দিয়ে আশ্বাস দিয়ে এসেছ। কিন্তু এখন? সেই চূড়ান্ত মুহূর্তটিতে সে এসে অসহায় মীনাক্ষীর পাশে দাঁড়াবেতো?

মীনাক্ষীর নির্দেশমত ঠিক রাত নটার সময় ট্যাক্সি নিয়ে সেই শিরীষ গাছটার অন্ধকার ছায়ার তলায় উৎকণ্ঠ প্রত্যাশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মীনাক্ষীকে তুলে নিয়ে যাবে তো? তাকে আশ্রয় দেবে তো?

এই ভাবনা চিন্তাগুলো মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভয়ঙ্কর ভাবে অস্থির উত্তেজিত বিচলিত হয়ে উঠলাম। মনে মনে স্থির করলাম, যে অদৃশ্য বিচিত্র নাটকের আমি একজন অদৃশ্য শ্রোতা, সেই নাটকের শেষ অঙ্কের যবনিকা পেতনের দর্শকও আমাকে হতে হবে। প্রথমটা দেখিনি, শেষটুকু নিজের চোখে দেখতেই হবে।

মনে হল, মীনাক্ষীর জীবনের এই জটিল সমস্যা সমাধানের ওপর যেন আমারও ভবিষ্যতের সব কিছু কর্মপন্থা নির্ভর করছে।

সীতাংশু, তোমাকে টেলিফোন করা আমার হল না।

দুপুর শেষ হল। রোদ্দুরের আঁচ ক্রমশ নিস্তেজ ম্লান হয়ে এলো। সারাটা দিন সংসারের নানা কাজে অকাজের মধ্যে মীনাক্ষীর (নাকি আমারও?) ভবিষ্যতের চিন্তায় আমি আচ্ছন্ন আবিস্ট হয়ে রইলাম। ছ'টা বাজবার একটু আগেই গাড়িটা বার করে একাই বেরিয়ে পড়লাম। সিনেমা যাবার নাম করে।

জানতাম, এই কঠিন অপরাধের জন্যে আমার কপালেও অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সন্দেহ অবিশ্বাস তোলা আছে। শাস্তিও। তবু যা হবার হোক। যা বলে বলুক। মীনাক্ষীকে খুঁজে পেতেই হবে আমাকে।

কাশেম আলী অ্যাভেন্যুর সেই রূপশ্রী সিনেমা হলের সামনে গাড়িটা পার্ক করলাম। এটা বাঙ্গালী পাড়া নয়। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, মাদ্রাজী, গুজরাটী, নন বেঙ্গলী আরো অনেক জাতের সঙ্গে সাদা চামড়ার মানুষরাও এখানে পাশাপাশি বাস করে। অন্যান্য পাড়ার চেয়ে জায়গাটা অনেক নির্জন। ভীড়ও কম। শান্ত সংযত পরিবেশ। মীনাক্ষী কেন এই পাড়া এই জায়গাটি বেছে নিয়েছে, ভালকরেই বুঝতে পারলাম। এখানে পরিচিত মুখের সন্ধান চট করে পাওয়া যাবে না।

একখানা টিকিট কেটে বসে রইলাম হলের মধ্যে। আমার চোখের সামনের পর্দার ওপরে যে ছবিটা বিচিত্র ঘটনাবলী নিয়ে দ্রুতলয়ে এগিয়ে চললো, তার একবর্ণও আমার মনে অথবা মস্তিষ্কে রেখাপাত করল না। আর একটা নাটকের শেষ দৃশ্যের জন্যে আমি তখন সংশয় সন্দেহের দোলায় দুলে চলেছি। উত্তেজিত ভাবে অপেক্ষা করছি।

সিনেমা শেষ হবার একটু আগেই হল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় নির্জন পথে নেমে রাস্তার দুধারে তাকিয়ে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলাম সেই শিরীষ গাছটাকে।

সার সার অনেক গাছই তো আছে। ওর মধ্যে কোনটি সেই শিরীষ গাছ? দূর থেকে রাত্তিরের ম্লান আলোয় আমার চোখে সব গাছগুলোই যে এক রকম হয়ে যাচ্ছে?

আরো একটু এগিয়ে গেলাম। এই বার ভাল করেই চোখে পড়লো। না পড়ে উপায় ছিল না। ওই তো—ওইতো মস্ত বড় একটা শিরীষ গাছ। শেষ বসন্তের ঐশ্চর্যসম্ভার সর্বাঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করে বেহায়া গাছটা যে নির্লজ্জ ভাবে হাসছে।

মনে হল মীনাক্ষী ওই গাছটার তলাতেই দাঁড়িয়ে থাকবে।

সিনেমা ভেঙ্গে গেল। দর্শকেরা হল থেকে বেরিয়ে এলো। ট্রাম বাস স্টপে ভিড় জমলো। পুরুষদের সঙ্গে লাল নীল হলদে কালো সাদা সবুজ শাড়ি পরা মেয়েরা। মিনি ম্যাক্সি স্কার্ট লুঙ্গি সালোয়ার পাঞ্জাবী—অন্য কোন পোষাকের ওপর আমার লক্ষ্য ছিল না। আমি স্থির জানতাম, মীনাক্ষী ঠিক শাড়ী পরেই আসবে।

এই সমস্ত মেয়েদের মধ্যে আমি আমার কল্পনা দিয়ে গড়া মীনাক্ষীকে খুঁজে মরছিলাম। অল্প বয়সী পরমা সুন্দরী না হলেও, তার চেয়ে আরো একটু বেশী বয়সের সুশ্রী সুদর্শনা কোন শ্রীময়ী তরুণীতো নিশ্চয়ই হবে মীনাক্ষী দত্ত।

কেউ ট্রামে কেউ বাসে কেউ কেউ বা ট্যাকসিতে, যে যার পথে একে একে চলে যেতে লাগলো। কিছু কিছু নরনারী আবার সিনেমা হলটার ভেতরে ঢুকে গেল। নাইট 'শো'য়ের দর্শক। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাশেম আলী অ্যাভেন্যুর মস্ত চওড়া রাস্তাটা একেবারে জনবিরল হয়ে এলো। আমি গাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসে রইলাম।

পাড়াটা নির্জন বলেই বোধহয় ভাল নয়। গাড়ির ভেতর একা আমাকে ড্রাইভারের সীটে বসে থাকতে দেখে কয়েকজন মস্তান ছোকরা উঁকি মেরে চলে গেল। যারা আসা যাওয়া করছিল, তারাও বেশ কৌতূহলের সঙ্গে আমার দিকে তাকাতে লাগলো। এত রাত্রে, সিনেমা ভেঙ্গে যাওয়ার পরও একা একা একজন সুশ্রী যুবতী স্ত্রীলোককে এভাবে এই নিজন রাস্তায় বসে থাকতে দেখে ওরা বিস্মিত হয়েছে বোঝা গেল। বুঝতে পারলাম, বেশ কয়েকজন 'রসিক' ব্যক্তির প্রাণে বেশ একটু রসের সঞ্চারও হয়েছে।

মনে মনে একটু ভয় পেলাম। কিন্তু তবু গাড়িটায় স্টার্ট দিয়ে ওখান থেকে চলে আসতে পারলাম না।

কটা নেশা করায় অভ্যস্ত অসভ্য লোক গাড়ির আশে পাশে ঘুর ঘুর করতে লাগলো। চোখ টিপতে, শীষ্ দিতে লাগলো হাসতে লাগলো। 'দিল লে লিয়া'র গান গাইতে লাগলো। বুকের ভেতর শিরশির করতে থাকলেও আমি নির্বিকার ভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাস্তার দুধারেরই গাছগুলোর তলায় মীনাক্ষীকে খুঁজতে লাগলাম।

আকাশে রূপোলি একফালি বাঁকা চাঁদ। সেই ফুলন্ত যুবতী শিরীষ গাছটার মাথায় ক্ষীণ জ্যোৎস্না চিক চিক করছে। ঘুমন্ত লাল লাল ফুল আর সবুজ সবুজ

পাতাগুলো সেই আলোয় অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। স্টপের কাছেই গাছটার তলায় কটি মেয়ে পুরুষ পরবর্তী বাসের জন্যে অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ, কেন জানি না, তাদের মধ্যে একজনকে দেখে আমার মনে হল ওই মেয়েটিই মীনাক্ষী। ও ছাড়া আর কেউ নয়। আমি যদি শম্পা ব্যানার্জী হতে পারি, তাহলে ওকে নিশ্চয় মীনাক্ষী দত্ত হতে হবেই।

অথচ এতদূর থেকে ওকে খুব ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। শাড়ীর রংটা খয়েরী গোছের কালচে লাল। মাথার রুক্ষ চুলে একটা সাধারণ লম্বা বেণী। গায়ে কোন স্বর্ণালঙ্কারের বালাই নেই। প্রসাধনে, সাজ পোষাকে কোন পরিপাট্য নেই। রোগা লম্বা শ্যামাঙ্গী। বার বার ফিরে তাকাবার মত সুন্দর চেহারার মেয়ে নয়। হয়তো একদিন ছিল। হয়তো অনেক দুঃখকষ্ট অশান্তির আগুনে পুড়ে তারই আগুনে ঝলসে ও এমন অবস্থায় পৌঁছেছে।

মেয়েটি পর পর দুটো বাসই ছেড়ে দিল। ওর অস্থিরতা চাঞ্চল্য বার বার রাস্তার এদিক ওদিক তাকানোর মধ্যে দিয়েই আমি আমার নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলাম।

মীনাক্ষী ফুটপাথ ছেড়ে একবার রাস্তায় নেমে এলো। এদিক ওদিক দুদিকেই ভাল করে তাকালো। তারপর আবার সেই শিরীষ গাছটার নীচে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। মনে হল, মীনাক্ষী যেন ওর জীবন মরণ সমস্যার মাঝখানে এক অদৃশ্য বিন্দুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বিচারকের রায়ে হয় ওর ফাঁসী হবে, অথবা মুক্তি।

নীরেনের জন্যে ওর এই প্রতীক্ষা, আশা নিরাশার হৃদয় বিদারক যন্ত্রণা, আমি সব কিছুই অনুভব করতে পারছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, মাত্র একটা ভয়ঙ্কর ভাবনাই এখন মীনাক্ষীর সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আছে। নীরেন আসবে তো? কেন নীরেন ঠিক নটার সময় এলো না? ট্যাক্সি পেতে অসুবিধা হচ্ছে? তাহলে ট্রাম বাসে করেই তার কাছে চলে এলো না কেন? তবে কি নীরেন আসবে না? না-না-না। এ হতেই পারে না। নীরেন যে মীনাক্ষীকে ভালবাসে। নীরেন ছাড়া মীনাক্ষীর যে নির্ভর করার মত একান্ত আপনজন আর কেউ নেই।

একটা বাস এসে থামলো। স্টপে যে দু-একজন নরনারী দাঁড়িয়েছিল, তারা সবাই বাসে উঠে পড়লো।

মীনাক্ষী বাঁ হাতের রিস্টওয়াচটার দিকে তাকালে।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও আমার হাত ঘড়িটার দিকে তাকালাম। নটা বেজে একত্রিশ মিনিট।

কী সর্বনাশ! অনেক রাত হয়ে গেল যে!

মনে মনে আকুলভাবে নীরেনকে ডাকতে লাগলাম। নীরেন, তুমি আর দেরী কোরনা। মীনাক্ষীকে এমন করে রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে রেখনা। চলে এসো নীরেন, তাড়াতাড়ি চলে এসো।

মীনাক্ষী ছটফট করে আবার রাস্তায় নেমে এলো। ব্যাকুল চোখে চারদিকে তাকালো। চোখের ওপর উড়ে এসে পড়া রুক্ষ চুলগুলোকে নির্মম হাতে কানের পাশে ঠেলে সরিয়ে দিল।

রাস্তার এধারে আমি, ওধারে মীনাক্ষী।

একজন গাড়ীর ভেতর বসে। অন্যজন গাছতলায় দাঁড়িয়ে। দুজনের মনের অবস্থা প্রায় একই রকম। দুতিনটে লোক আমাদের দুজনের দিকে পালাক্রমে তাকিয়ে একটা বিশ্রী, অশ্লীল রসিকতা করলো।

মীনাক্ষী চমকে উঠলো। চমকে উঠলাম আমিও। আমাদের দুজনের শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতি সংস্কার দুজনকে যেন একই সঙ্গে চাবুক মেরে সচেতন করে তুললো। কোন ভদ্রঘরের মেয়েরা এত রাত্রে, একা একা নির্জন রাস্তায় এভাবে বসে, দাঁড়িয়ে থাকে না।

কিন্তু তবু মীনাক্ষী নড়লো না।

চলে যেতে পারলাম না আমিও।

নীরেন কেন আসছে না? নীরেন কেন এখনো আসছে না?

রাত বাড়ছে। সাড়ে নটার কাঁটা অবিরাম গতিতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে দশটার দিকে। চৈত্র সন্ধ্যার সেই শরীর জুড়োনো অলস মন্থর হাওয়া এখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। চারিদিকের নির্জন আবহাওয়া করুণ, নিঃশব্দ কান্নার মত থমথমে হয়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে।

সময় চলে যাচ্ছে। প্রত্যেক মুহূর্তগুলো মীনাক্ষী দত্তকে (সেই সঙ্গে আমাকে!) নিয়ে যেন একটা সাংঘাতিক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

একটা ট্যাক্সি, মন্থর গতিতে এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মীনাক্ষীও ফুটপাথের ওপর থেকে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়ালো। আমি এখান থেকেই ওর হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক দ্রুত আলোড়ন অনুভব করতে পারলাম।

পরম সার্থকতার আনন্দে উজ্জ্বল উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠা ওর চোখ মুখের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

কিন্তু না—নীরেন নয়—নীরেন নয়।

ট্যাকসিটা তার সমুখে থামলো না। দাঁড়ালোও না—যেমন এসেছিল তেমনই আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে সামনের দিকে উধাও হয়ে গেল।

শুধু মীনাক্ষী নয়। এবার ওর সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর, মনটাও অবসাদে হতাশার ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়লো।

ভয়ঙ্কর রকম শান্ত হয়ে মীনাক্ষী গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। পাষাণ প্রতিমার মত ওর শাড়ীর আঁচল, হাতের ব্যাগটাকেও আর নড়তে দেখলাম না। ওকে দেখে মনে হল, এতক্ষণ পর ওর সমস্ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আকুলতার অবসান হয়ে গেছে। প্রতীক্ষার, নৈরাশ্যের, চাঞ্চল্যের সমস্ত অধীরতা ও গুটিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে। বাইরের কোন কিছুই আর ওকে স্পর্শ করছে না। এমন কি নীরেনের না আসাটাও নয়।

এখন কী করবে মীনাক্ষী?

ওর সমস্ত নিরুদ্ধ ভাবনা চিন্তাগুলো আমাকে উতল করে তুললো। আমাকে উত্তেজিত অধীর অস্থির করে হঠাৎ মীনাক্ষী যেন একেবারে স্তব্ধ শান্ত হয়ে গেল।

এখন কী করবে মীনাক্ষী? যে নরক থেকে বেরিয়ে এসেছে, আবার সেই নরকেই ফিরে যাবে? সেই ক্লেদাক্ত পরিবেশ? আলোর সমুদ্র ভেবে ও যে অতলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, সেই সমুদ্র শুকিয়ে গিয়ে আবার ওকে ঠেলে ফেলে দেবে সেই আলোবাতাসহীন অন্ধকূপের মধ্যে? বিবর্ণ বিস্বাদ এক মরুভূমির মধ্যে?

ঝিরি ঝিরি শিরীষের ফুলন্ত শাখাপ্রশাখার ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো মেখে দাঁড়িয়ে থাকা মীনাক্ষীকে দেখে আমার বুকের মধ্যে এক সমুদ্র কান্না উথলে উঠলো। জলে ঝাঁপ দিয়ে মরবার আগে বুঝি মানুষ এমন ভাবেই নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকে!

ওকে এখানে একা ফেলে রেখে আমি কেমন করে বাড়ী ফিরে যাব!

ও আমাকে চেনেনা, জানেনা, কখনো চোখেও দেখেনি। কিন্তু সে সম্বন্ধ বিচার বিবেচনা আমার মাথায়, চিন্তার মধ্যেও এলোনা। গাড়ীর দরজা খুলে আমি রাস্তায় নেমে এলাম। পা বাড়ালাম ওধারের শিরীষ গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকা মীনাক্ষীর দিকে। আর সেই মুহূর্তেই সেই ঘটনাটা ঘটলো—

অথবা অবিশ্বাস্য রকম অঘটনটা!

হঠাৎ সমস্ত পৃথিবীটাই যেন অন্ধকার হয়ে গেল। পথঘাট দুধারের বড় বড় বাড়ীগুলোর সব আলো একসঙ্গে নিভে গেল। নিশ্ছিদ্র নীরন্ধ্র অন্ধকারের সমুদ্র আমাকে—মীনাক্ষীকে তার অগাধ অতল বুকের ভেতর ডুবিয়ে দিল। লোডসেডিং!

সেই ভয় জাগানো, আতঙ্ক ছড়ানো ভুতুড়ে অন্ধকারে আমি একা সেই লোকজনহীন পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভয়ে হিম হয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা একটা ভীত আর্তনাদ কোনমতে চেপে রেখে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে চললাম আমার গাড়ীটার দিকে।

কী করে, কেমন করে ভুলে গিয়েছিলাম, আমি একজন পুরুষ নই? একজন যুবতী সুশ্রী অসহায় স্ত্রীলোক মাত্র? গহন অরণ্যের মত হঠাৎ নেমে আসা এই ঘনঘোর অন্ধকারে আশে পাশেই ওঁৎ পেতে থাকা হিংস্র শ্বাপদদের হাত থেকে আমায় কে রক্ষা করবে? ওদের আক্রমণ থেকে কে আমাকে বাঁচাবে?

এই অরক্ষিত অপরিচিত জায়গায় এত রাত অবধি কেন আমি একা বসেছিলাম? এত রাত্রে বাড়ি ফিরে গিয়ে একথার কী জবাব আমি দেব? কে বিশ্বাস করবে আমার কথা?

যে সন্দেহ যে অবিশ্বাস যে বিষাক্ত ঘৃণা আমাকে দিনরাত জ্বালাচ্ছে পোড়াচ্ছে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমি তাকে কেন আরো বাড়িয়ে তুলতে গেলাম?

একা একা ড্রাইভার সঙ্গে না নিয়ে, এত রাত অবধি গাড়ি নিয়ে বাইরে থাকার কী কৈফিয়ৎ আমি দেব? সিনেমা? কিন্তু রাত নটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তো সিনেমা শেষ হয়ে গেছে। আর এখন তো দশটা—না সাড়ে দশটাই বুঝি বেজে গেছে।

ঝড়ের মত গাড়ির দরজা খুলে উঠে বসেই স্টার্ট দিলাম। গর্জন করে উঠলো ইঞ্জিনটা। শিরীষ গাছটার তলায় এসে মুহূর্তের জন্যে ব্রেক কষে সবকটা ইন্দ্রিয় এক করে মীনাক্ষীকে দেখতে চাইলাম। কিন্তু সেই গভীর অন্ধকারে একটা কালো ছায়ার মত মিশে থাকা মীনাক্ষীকে আলাদা করে দেখতে পেলাম না।

নীরেন কি এসেছিল? নীরেন কি শেষ পর্যন্ত এসেছিল?

কী অন্ধকার কী অন্ধকার!

সেই দিন থেকে, সীতাংশু, সেই রাত থেকে আমিও অন্ধকার হয়ে গেলাম।

মন যারে চায়

সরসী সরকার

আরো কাছে সরে এলো পর্ণা। অসীমের হাত নিজের হাতে নিলো। আঙুলগুলোর সঙ্গে খেলা করতে লাগলো একমনে।

আকাশের গায়ে সোনালী মেঘের ঝাঁক। ভেসে ভেসে অভিসার করছে তারা। পড়ন্ত সূর্যের কিরণ লুটোপুটি খাচ্ছে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের গম্বুজের গায়ে। ঝকঝক করছে, মনে হচ্ছে গলিত সোনা ঢেলে দিয়েছে কে যেন তার অঙ্গে।

ভিক্টোরিয়ার এককোণে নরম ঘাসের ওপর বসে বসে পর্ণা তখনও খেলা করছে অসীমের আঙুলগুলো নিয়ে। অসীমের দৃষ্টি পর্ণার চোখে মুখে। সে দেখছে আকুল আগ্রহে পর্ণার মুখের কমনীয়তা আর চোখের মায়াভরা চাউনি। হাসি-খুশীতে উপচে পড়ছে পর্ণার অন্তর, মন। আনন্দের বন্যায় সে ভেসে চলেছে। অসীমের স্পর্শ আবেশ বুলিয়ে যাচ্ছে তার শিরায় শিরায়, অস্থিমজ্জায়। মন প্রাণ দিয়ে এটা উপলব্ধি করছে পর্ণা। মুখে কোন কথা নেই। একমনে অসীমের আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করছে—এ এক খেলা, পরম তৃপ্তির খেলা।

অসীম দুহাতে পর্ণার মুখ উঁচু করলো, চোখের সামনে তুলে ধরলো। পর্ণা তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে মুখে জিজ্ঞাসা। অসীম কিছু বললো না। নীরবে পর্ণাকে দেখতে লাগলো। পর্ণা মুচকি হাসলো। ফিসফিস করে বললো, কী দেখছো?

তোমাকে।

না, অমন করে দেখো না।

কেন?

আমি পারি না। অমন করে দেখলে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না একেবারে।

ধরে রাখতে কে বলেছে? নিয়ে চলো না তোমার কাছে আমাকে আপন করে?

তার চেষ্টা তো আমার মনে প্রাণে।

দুজন চুপচাপ। একটা নীরবতার আবেষ্টনীতে তারা বসে আছে।

পরীক্ষা এসে গেলো। ইউনিভারসিটি আলা শেষ হবে শিগ্‌গিরি, কী করে দিন কাটবে তখন? অসীমের গলার স্বর নিঃস্তব্ধতা ভেঙে দিলো।

দেখি, কোন একটা উপায় খুঁজে বার করতেই হবে। পর্ণার আশ্বাস কানে এলো।

উপায়টা কী শুনি?

পরে বলবো। জানো, আমাদের এস্টেটের ম্যানেজার আসছে মাসে রিটায়ার্ড করছে। নতুন ম্যানেজার আসবে একজন। কেমন হবে কে জানে, তা নিয়ে মার চিন্তা-ভাবনার শেষ নেই।

তাই নাকি? কিন্তু চিন্তার কী আছে?

তোমাকে তো আগেই বলেছি, বাবা দশ বছর আগে মারা গেছে! এখন মা আর আমি মিত্র এস্টেটের মালিক। আমরা নামে মাত্র, আসলে আমাদের হয়ে মিত্র এস্টেট চালান আমাদের ম্যানেজার। খুব বিশ্বাসী, সৎ লোক, বয়স হয়েছে, ওকে এবার ছুটি দিতে হবে। যিনি নতুন ম্যানেজার হয়ে আসবেন, তাঁর ওপর আমাদের অনেকখানি নির্ভর করতে হবে। অবশ্য ইতিমধ্যে আমরা এস্টেটের কাজকর্ম বেশ কিছুটা শিখে গেছি। তবুও কেমন যেন লাগছে।

ও ঠিক হয়ে যাবে।

এতোদিন তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাইনি কেন বলতো?

কি করে জানবো?

আসলে যাতে পারমানেণ্টলি তোমাকে রাখতে পারি আমার কাছে তারই ব্যবস্থা করবো বলে।

সত্যি? আত্মহারা হয়ে উঠলো অসীম, পর্ণাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

আঃ। ছাড়ো, ছাড়ো। দেখছো না আশেপাশে কত লোকজন।

ও সরি। ভুলেই গিয়েছিলাম।

তখন সন্ধ্যে হয় হয়। পর্ণার ইম্পালা মিত্রসদন-এ এসে ঢুকলো। দোতালার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন নীলিমা মিত্র, পর্ণার মা। মেয়ের ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে তিনি উদ্বিগ্ন। এতোক্ষণ ছটফট করছিলেন।

প্রাসাদের মতো বাড়ি। চারিদিকে উঁচু কম্পাউণ্ড ওয়াল। ভেতরে ফুলের বাগান, ফুলে ফুলে সাজানো গোছানো, ঝকঝকে তকতকে। কতকটা বাগান বাড়ীর মতো, অথচ ঠিক বাগান বাড়ি নয়।

গেটে দুটো ফলক জল জল করছে—একটাতে লেখা 'মিত্র-লজ' অপরটিতে 'নীলিমা মিত্র, পর্ণা মিত্র। দেখে শুনে মনে হয় কোনো রাজরাজাদের প্রাসাদ যেন।

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই নীলিমা মিত্র অভিযোগ করে বললেন, পর্ণা, তোর কি জ্ঞানবুদ্ধি হবে না কোনকালে? তোর ফেরার সময় চারটে, এখন ঘড়িতে বাজে ছটা।

বা! কী করবো? বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে দেরী হয়ে গেলো যে।

তা হোক। একটা ফোন করে দিলেই তো চুকে যেতো। জানিস্ তুই সময় মতো না ফিরলে আমার কত ভাবনা হয়।

ওহো, ভুলেই গিয়েছিলাম।

নীলিমা মিত্র চুপ করে রইলেন। মেয়ের দিকে তাকালেন একবার। মনে মনে নিজে ফিরে গেলেন পর্ণার বয়সে। চোখের সামনে অনেক মিষ্টি মিষ্টি দৃশ্য ভেসে উঠলো। নীলিমা মিত্রও মাঝে মাঝে অনেক দেরী করে কলেজ থেকে ফিরতেন। আহা, কী সুন্দর, কী অপরূপ ছিলো সে দিনগুলো! রোমান্সে ভরা। ভাবলেই মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়। পঁয়তাল্লিশ বছরের দেহমনে কামনা প্রবল হয়ে ওঠে। সেদিনের চিন্তা-ভাবনার আনন্দের হিল্লোলে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিতে ইচ্ছে করে।

পর্ণাকে দেখে নীলিমা মিত্র তাঁর তেইশ বছর আগের যৌবনকে ফিরে পান যেন। পর্ণার মধ্যে তাঁর কলেজ জীবনের সুখানুভূতি ছড়িয়ে আছে। আপনমনে নিজেই কখনো সখনো পর্ণায় রূপান্তরিত হয়ে যান তিনি। তেইশ বছর আগের সবকিছু তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাঁকে নিয়ে যায় অতীতের স্বপ্নালোকে। তিনি অতীতের কল্পনায় বিভোর হয়ে যান। মানস চোখে দেখতে পান অনেক কিছু। অতীত বাস্তবে এসে ধাক্কা খায়। অতীতের সুখ দুঃখ হৃদয়ে জ্বালা ধরায়। তিনি ছটফট করে মরেন। অশান্তির বোবা কান্নায় বুক ভরে ওঠে।

মা জানো, এবার কিন্তু আধুনিক, মার্জিত রুচিসম্পন্ন একজন ইয়াংম্যানকে আমাদের ম্যানেজার করবো।

মেয়ের কথা শুনে নীলিমা মিত্রের চমক ভাঙলো। তাঁর স্বপ্ন শেষ হলো। তিনি মাটির পৃথিবীতে নেমে এলেন। বাস্তবের সামনে দাঁড়ালেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী বলছিলি তুই?

এবার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তোমার আমার পছন্দসই একজন ম্যানেজারকে অ্যাপয়েন্ট করবো।

ঠিক আছে। আমার কোনো আপত্তি নেই। তোরই তো সব। তুই যদি চাস তাই হবে।

আর একবার মেয়ের দিকে তাকালেন নীলিমা মিত্র। তারপর আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

মনে মনে হাসলো পর্ণা। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো। তারপর স্বগতোক্তিতে বললো, অসীম, দেখ না, তোমাকে রাজা করে আনবো এ রাজপুরীতে। তুমি আমার হৃদয়ের রাজা। এখানে এসে মিত্রলজ-এর একচ্ছত্র অধিপতি হবে।

রাতে ডানলোপিলোর বিছানায় শুয়ে শুয়ে কতো কথা ভেবে চলে পর্ণা। তার সব কথা, তার সব ভাবনা অসীমকে নিয়ে—অসীমের প্রেম-ভালবাসাকে নিয়ে। অসীম তার আত্মার আত্মীয়, হৃদয়তম। তাকে না ভাবলে কাকে ভাববে পর্ণা?

অসীম বসিরহাটের ছেলে। লেখাপড়াতে খুব ভাল। বাংলা অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। কলকাতায় তার কেউ নেই। হোস্টেলে থেকে এম এ পড়ে। অসীম যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি মার্জিত রুচিসম্পন্ন—অত্যন্ত ভদ্র ও সংস্কৃতিবান। ইউনিভারসিটির সে হলো হিরো, যুক্তিতর্কে সে অদ্বিতীয়। ডিবেটে অসীম কখনো হারেনি। তার বক্তব্য যেমন সরল, তেমনি যুক্তিপূর্ণ। এককথায় অসীম ছাত্র সমাজের আদর্শ। অধ্যাপকগণ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ক্লাসের ছেলে-মেয়েরা অসীমের গর্বে গর্বিত। এহেন অসীমকে ভালবাসে পর্ণা মিত্র।

পর্ণা নিজেকে হাসিমুখে তুলে দিয়েছে অসীমের হাতে। কোনো কিছু ভাবেনি, কোনো কিছু বিচার করেনি। সে অসীমকে ভালবেসে ধন্য হয়েছে। অসীমের ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেই অসীমের চিন্তা যদি পর্ণা মিত্রের চোখের ঘুম কেড়ে নেয়, তাহলে অবাক হবার কী আছে?

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ছটফট করছে অসীম। আগে দিনে সাত আট ঘণ্টা পর্ণাকে দেখতে পেতো। আর এখন মাত্র দু তিন ঘণ্টা। না, এত কম সময়ে অসীমের চলবে না। যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

একদিন পর্ণা একটা দৈনিক কাগজ তুলে ধরলো অসীমের চোখের সামনে। অসীম অবাক হলো। কিছুই বুঝতেই পারছে না। পর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

পড়ো। এখানটা পড়ে দেখো। আঙুল দিয়ে কাগজের একটা জায়গা দেখিয়ে দিলো পর্ণা।

"এস্টেট চালাবার উপযুক্ত একজন যুবক ম্যানেজার চাই। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রভৃতি উল্লেখ করে দরখাস্ত করুন। পোস্টবক্স নং ৬৩২৫, কলিকাতা-১।"

পড়ে চুপ করে রইলো অসীম।

পর্ণা অসীমকে একটা ধাক্কা মারলো। বললো, এই, একটা দরখাস্ত করো না?

করে কী হবে?

আরে বাবা দেখো না, তোমাকে রাজা বানিয়ে ছাড়বো।

রানী কে হবে? তুমি তো?

নিশ্চয়ই।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কী ব্যাপার বল দেখি?

আরে বুদ্ধু, এটা আমাদের এস্টেটের বিজ্ঞাপন। আমি কায়দা করে তোমাকেই আমাদের ম্যানেজার করবো।

হুররে! তোমার মাথায় এতো বুদ্ধি পর্ণা!

আজ্ঞে হ্যাঁ, থোড়া থোড়া বুদ্ধি না থাকলে এতো বড় এস্টেট চালাবো কী করে? তাছাড়া বোকা হলে প্রেম করাও চলে না এ যুগে মনে রেখো।

কিন্তু আমি কি পারবো তোমাদের এস্টেটের কাজ চালাতে?

কাজ না ঘেঁচু। চলো না, আমি সব ম্যানেজ করে দেবো। তাছাড়া তোমার চাকরি খাবে কে? নীলিমা মিত্র? তাহলে হয়েছে? আমি বেঁচে থাকতে মা তা পারবে না।

কয়েকদিন পরে ইণ্টারভিউ লেটার হাতে মিত্রলজ-এর সামনে এসে দাঁড়ালো অসীম রায়। অবাক হয়ে গেলো। এতবড় বাড়ি, রাজপ্রাসাদের মতো, ভাবতেই পারেনি। দারোয়ান সেলাম ঠুকলো। গেটের ভেতর যেতে বললো। ফুলের বাগান, তার মাঝখান দিয়ে ছিমছাম রাস্তা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সে-রাস্তা ধরে মিত্রলজ-এর মেইন বিল্ডিং-এ ঢুকলো অসীম। তাকে নিয়ে বসানো হলো একটা ঘরে। শ্বেত পাথরের মেঝে, তার ওপর কার্পেট বিছানো। বিদেশী দামী কার্পেট, রঙের বাহার দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। আধুনিক সজ্জায় সাজানো গোছানো সমস্ত ঘরখানা। সেখানে আরো কয়েকজন যুবক বসে আছে। সবাই স্যুটেড বুটেড। মনে মনে একটু হাসলো অসীম।

এতোটা ভাবেনি সে। পর্ণারা ধনী জানতো, কিন্তু এতো ধনী তা সে অনুমানই করতে পারেনি। অসীমের চোখ ঘুরে যাওয়ার উপক্রম।

ইণ্টারভিউ শুরু হয়ে গেছে কিছুক্ষণ! একজন বাইরে এলো, মুখে হাসির রেখা, আত্মতৃপ্তির লক্ষণ। চাকরিটা তারই হবে, এমন ভাব আর কি!

ঘরের দরজা জানলাগুলো বড় বড়। অনেকদূর অবধি দেখা যায়। অসীম জানলার ধারে সরে গেলো। বাইরে তাকালো। মিত্রলজ-এর পশ্চিম দিক এটা। জানলার নিচে থেকে ফুলের বাগান শুরু হয়েছে। নানা জাতের মরশুমী ফুল। রঙে রঙে রাঙিয়ে তুলেছে গোটা বাগানটা। কী সুন্দর দেখতে! প্রজাপতিরা ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে, আনন্দে মধু পান করছে। বাগানের মালিরা কাজ করছে আপন মনে। চারিদিকে একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতা, নীরবতা। কোনো হৈচৈ, চেঁচামেচি নেই। শান্তশ্রী ভাব ছড়িয়ে রয়েছে।

আপনিই তো অসীম রায়?

চমকে উঠলো অসীম। মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

ভেতরে যান। দরজা দেখিয়ে দিলো লোকটা!

ঘরে ঢুকে তাজ্জব বনে গেলো অসীম। মস্ত বড় হলঘর। তারই মাঝখানে সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের একপাশে আছেন একজন মহিলা। বয়স চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে, গায়ের রঙ টকটক করছে। তারই পাশে বসে আছে পর্ণা রাজেন্দ্রানীর মতো। দেখে চোখ ফেরাতে পারছে না অসীম। এতো সুন্দর দেখতে পর্ণাকে তা সে আগে জানতে পারেনি।

সামনে এসে দাঁড়ালো সে। নীলিমা মিত্র তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। অসীমও বিস্মিত হলো। নিরুপায়, অসহায় চোখে তাকালো পর্ণার দিকে। পর্ণাও হতবাক, চিন্তিত। তার মা এমন করে তাকিয়ে আছে কেন অসীমের দিকে। কিছুই বুঝতে পারছে না।

বসুন আপনি। পর্ণা মিত্রের গলার স্বর গমগম করে উঠলো। বড় হল ঘরের নীরবতা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলো।

চমকে উঠলেন নীলিমা মিত্র। মুহূর্তে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠলেন। বললেন, দেখুন, যিনি আমাদের ম্যানেজার হবেন, তাকে সবকিছু করতে হবে। তিনিই হবেন আমাদের চালক। আমাদের এস্টেটকে মনে করতে হবে তার নিজেরই এস্টেট। নিজেকে মাইনে করা কর্মচারী ভাবলে চলবে না।

উপরন্তু এখানেই থাকতে হবে তাঁকে। ডে অ্যাণ্ড নাইট তার ডিউটি। খাওয়া দাওয়া সব এখানেই। বলেই অসীমের দিকে চোখ টিপে হাসলো পর্ণা।

আমার কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই। সব সর্তে রাজী। পর্ণার দিকে তাকালো অসীম।

পর্ণা চোখের ইংগিতে বললো, ঠিক আছে।

আপনি এখন যেতে পারেন। পরে খবর দেওয়া হবে। নীলিমা মিত্র বললেন গম্ভীর গলায়।

অসীম উঠে দাঁড়ালো। নমস্কার জানিয়ে গটগট করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

নীলিমা মিত্র তাকিয়ে রইলেন অসীমের চলে যাওয়ার পথের দিকে। পর্ণার চোখে এড়ালো না এটা।

কেমন দেখলে অসীম রায় বলে ও লোকটাকে? পর্ণা প্রশ্ন ছুড়লো।

খারাপ না তো। এ-ই বোধহয় সবচেয়ে উপযুক্ত। কী বলিস?

আমারও তাই মনে হয়।

তবে একেই এ্যাপয়েণ্ট কর।

ঠিক আছে।

ভেতরে চলে গেলেন পর্ণার মা। বুকে অসহ্য বেদনা, মনে দুশ্চিন্তা। অসীম রায়! আশ্চর্য! ছেলেটা নীলিমা মিত্রের পরম বিস্ময়। তার মুখের দিকে তাকালে চোখ আর নেমে আসতে চায় না। তিনি হারিয়ে যান, তলিয়ে যান অতীতের সুখ-স্মৃতিতে। মন ভরে ওঠে আনন্দে, আবার সঙ্গে সঙ্গে একটা জ্বালা অনুভব করেন। অসীম রায়কে তাঁর একান্ত আপনজন বলে মনে হয়? সে যেন নীলিমা মিত্রের জন্ম জন্মান্তরের চেনা—জানা। তাঁর হৃদয়ে অসীমের মুখচ্ছবি কেটে কেটে বসে আছে। তিনি দিশেহারা হয়ে যান। চিন্তা-ভাবনার কূলকিনারা পান না, তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছরের মন ঘুরে ফিরে পাড়ি জমাতে চায় বাইশ বছরের জীবন-যৌবনে। যৌবনের প্রথম অভিষেকের রাজ্যে বিচরণ করতে থাকেন তিনি। এক অপূর্ব মিষ্টি মধুর আবেশ ছড়িয়ে পড়ে তাঁর দেহমনে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিমলেন্দুর ছবি। বিমলেন্দু যেন হাসছে, আর নীলিমাকে ডাকছে বারবার। না, না। সেদিনের কথা আজকে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না তিনি। বিমলেন্দুর স্মৃতি তাঁকে চঞ্চল করে তুলছে। আগে তো এমন হতো না। অসীম

রায় ছেলেটি তাঁকে কোথায় নিয়ে ফেললো! তিনি তো বিমলেন্দুকে ভুলে ছিলেন কিন্তু একী হলো! অসীম রায়কে দেখেই তার ফেলে আসা দিনগুলোর কথা হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের কথা আর ফুরিয়ে যাওয়া প্রেম-ভালবাসার কাহিনী এত বেশী করে মনে পড়ছে কেন?

অবশেষে অসীম এলো একদিন। মিত্রলজ-এ এলো মিত্র এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে। নতুনভাবে তার অফিস ঘর সাজানো হলো, আধুনিক সাজসজ্জায় সুন্দর করে তোলা হলো। আগের ম্যানেজারের চাল-চলন, কায়দা কানুন সম্পূর্ণ পাল্টে গেলো। নতুন আর আধুনিক নিয়ম পদ্ধতি চালু হলো এখন থেকে।

অসীমের বেডরুম সাজিয়ে গুছিয়ে ছিমছাম করে তুললো পর্ণা। নিজের মনের মতো করে আসবাবপত্র প্রভৃতি রাখলো যেখানে যেটা রাখলে ঘরের সৌন্দর্য বাড়ে ঠিক সেভাবে।

পর্ণা অসীমকে গাইড করতে লাগলো সব কিছুতে। বা! পর্ণা না করলে করবে কে? অসীম রায় তাদের এস্টেটের ম্যানেজার। তার সুযোগ সুবিধে তাকে দেখতে হবে বৈকি!

দেখুন মি. রায় আপনি লজ্জা করবেন না। যখনই কোন অসুবিধে ফিল করবেন, আমাকে খবর দেবেন। আমি আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করবো। নীলিমা মিত্রের সামনে পর্ণা বললো অসীমকে।

আজ্ঞে ঠিক আছে।

নীলিমা মিত্রের মুখে কোন কথা নেই। তিনি ভাল করে দেখছেন অসীম রায়কে। তেইশ বছর আগের চোখ দিয়ে খুঁজছেন বিমলেন্দুকে অসীমের মধ্যে। বিমলেন্দু আর অসীম যেন এক হয়ে যাচ্ছে বারেবারে। দুজনকে কিছুতেই আলাদা করতে পারছেন না।

না। আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব না। তিনি ধীরে ধীরে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে মেয়েকে বলে গেলেন অসীমকে দেখতে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো অসীম। পর্ণার দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো। চোখ আর নামায় না কিছুতেই।

পর্ণা কাছে সরে এলো। নিচু গলায় বললো, কী? বলেছিলাম না, তোমাকে রাজা বানাবো? হয়েছে তো?

অসীম মুখে কিছু বললো না। দুহাত বাড়িয়ে পর্ণাকে বুকে টেনে নিতে চাইলো।

উহুঁ। বলেই পর্ণা পিছিয়ে গেলো কয়েক গজ। অসীম এগিয়ে যেতে চাইলো পর্ণার কাছে। কী যেন বলতে চায় সে।

চুপ। মুখের ওপর একটা আঙুল রেখে সাবধান করলো পর্ণা। তারপর চাপা গলায় বললো, কেমন লাগছে বলো না? তোমার অফিস, তোমার ঘর আর তোমার এ মালিককে?

মারভেলাস। এমনটা ভাবতেই পারিনি।

এবার পর্ণা আস্তে আস্তে সরে এলো অসীমের কাছে। ফিসফিস করে বললো, আর তোমার শাশুড়িকে?

সবচেয়ে ভাল। এমনটি আর হয় না।

তোমাকে পেয়ে মা খুব গ্লাড। নিশ্চিন্তে থাকো। রাজত্ব আর রাজকন্যে তোমার বাঁধা।

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ। জানো, মা তোমাকে এ্যাপয়েণ্ট করতে বলেছিলো। তোমার হয়ে আমাকে আর সাফাই গাইতে হয়নি।

তাজ্জব ব্যাপার!

তুমি যে মিত্রলজ-এর উপযুক্ত তা বোধহয় মা তোমাকে দেখেই বুঝে নিয়েছেন।

বাস্তবিক নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে আমার। তোমাকে এমন করে একান্তভাবে পাবো আমি কল্পনাও করিনি।

আমি কি করেছিলাম? না। অথচ আপন থেকে এসুযোগ এসে গেলো।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো পর্ণা। কী যেন ভাবলো। তারপর বললো, তোমার জন্যে আমি সবকিছু করতে পারি অসীম। আমার রূপ-যৌবন, ধন-সম্পত্তি, টাকা কড়ি সব তোমার জন্যে। বলতে বলতে পর্ণা চলে এলো অসীমের একেবারে কাছাকাছি। তার মাথা আস্তে আস্তে রাখলো অসীমের বুকে।

অসীম চুপ করে রইল। পর্ণাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

দিন যেতে লাগল। অসীম ধীরে ধীরে মিত্রলজ-এর একজন হয়ে উঠলো। তার সর্বত্র অবাধ গতি। কাজকর্মে সে বেশ সুনাম করে ফেলেছে। নীলিমা মিত্র অসীমের ওপর ভারী খুশী।

অসীমের তুলনা হয় না। তার অমায়িক ব্যবহার, মার্জিত রুচি আর উদার দৃষ্টিভঙ্গী সবাইকে সন্তুষ্ট করে তুলেছে।

পর্ণা অবাক হলো। এতটা সে আশা করে নি। অসীম অসম্ভব সম্ভব করেছে। সবাই অসীমকে প্রশংসা করে, ভাল বলে। গর্বে পর্ণার বুক ভরে ওঠে।

পর্ণা আগের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আগের মতো আর ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় না। সে ইচ্ছে মতো অসীমের কাছে আসে যায়। অসীমের চোখের ওপর চোখ রেখে বসে থাকে। তাকে দেখে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দেয়। কে কী বলবে সে কথা ভাবে না।

অসীম আর পর্ণা দুজনে রোজ সকাল সন্ধ্যায় ঘুরে বেড়ায় মিত্রলজ-এ ফুলবনে। তারা ফুলের সৌন্দর্য দেখে নয়ন ভরে। নানা ফুলের নানা বর্ণ, নানা গন্ধে তাদের হৃদয়ে আবেশ ছড়ায়, দেহমন ব্যাকুল করে তোলে। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে গোটা বাগান। লাল, নীল, সাদা, গোলাপী বিভিন্ন ফুলের অপূর্ব সমাবেশ—চোখ জুড়িয়ে যায়, প্রাণ ভরে ওঠে। দুজন হাত ধরাধরি করে ধীরে ধীরে হেঁটে বেড়ায়। তারা যেন স্বর্গপুরীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা হলো তাদের ভালবাসার কানন। তাদের প্রেম-অভিসারের আনন্দভূমি।

একজন কিন্তু দূর থেকে দেখেন তাদের দুজনকে নির্নিমেষ নয়নে। পর্ণা আর অসীম যখন ঘুরে ফেরে হাতে হাত রেখে, নীলিমা মিত্র তখন দেখেন তাদের প্রাণভরে। তাঁর মন চনচন করে ওঠে। বুকে না পাওয়ার বেদনা অনুভব করেন। নিজেকে পর্ণার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলেন। তিনি যেন ঘুরছেন অসীমের সঙ্গে, প্রেম অভিসার করছেন ঠিক পর্ণার মতো। বিমলেন্দু, অসীম, পর্ণা সবাই যেন তাঁর কাছে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

ডিনারের পর অসীম আসে তার শোয়ার ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢোকে পর্ণা। বেশ কিছুক্ষণ গল্প করে দুজনে। গল্পে গল্পে তারা সব হারিয়ে ফেলে। নিজেদের মধ্যে এক হয়ে যায়। পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাইরে হয়তবা সাদা ফুটফুটে জ্যোৎস্না। চাঁদের আলোয় গোটা বাড়িটা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দুটি নরনারীর হৃদয়ও প্রেমের আলোতে জলজল করছে।

পর্ণা অসীমের কাছে সরে এলো। তার চোখে চোখ রেখে বললো, এবার আমাকে যেতে হবে। শুয়ে পড়ো। অনেক রাত হয়েছে।

না, তুমি যেও না। এখানেই থাকো।

ছিঃ। দুষ্টুমি করো না। এখন আমার এখানে থাকতে নেই। মা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

আরো একটু বসো। আমাকে ঘুম পাড়িয়ে তারপর তোমার ছুটি।

বিছানায় শুয়ে পড়লো অসীম। পর্ণা বসলো। আস্তে আস্তে অসীমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

জানো পর্ণা, মনে হয় আমি স্বর্গপুরীতে বাস করছি। সব সুখ-শান্তি, স্বস্তি আমার হাতের মুঠোয়।

পর্ণা একহাতে অসীমের মুখ চেপে ধরলো। বললো, না, আর কোনো কথা না। চোখ বোজো। এবার ঘুমুতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকে পর্ণা। প্রাণভরে দেখে ঘুমন্ত অসীমকে। তারপর এক সময়ে নিজের ঘরে চলে যায়।

ভোর হয়। পাখি ডাকে। মিত্রলজ-এর পেছনে কৃষ্ণচূড়া গাছ থেকে তাদের কিচিরমিচির কানে আসে। পর্ণা অসীমের ঘরে ঢোকে পা টিপে টিপে। জানালাগুলো খুলে দিয়ে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়। মায়াভরা চাউনিতে তাকিয়ে থাকে, অসীমকে দেখে। অসীম তখনও ঘুমোচ্ছে, অকাতরে ঘুমোচ্ছে ছোট ছেলের মতো।

একটু পরেই ঘুম ভেঙে যায় অসীমের। পর্ণার হাত নিজের হাতে নেয়। পর্ণার মুখ দেখতে থাকে একদৃষ্টিতে।

পর্ণা বলে, ওঠো এবার। বেলা হয়েছে।

অসীম কোন জবাব দেয় না। তার চোখ তখনও পর্ণার চোখে।

পর্ণা জোর করে বসিয়ে দেয় অসীমকে। এখুনি চায়ের টেবিলে যেতে হবে। সময় নেই আর। ওঠো, ওঠো শিগগির। তুমি না ম্যানেজার, তাড়াতাড়ি বিছানা না ছাড়লে সবাই কুঁড়ে বলবে যে। উপহাস করে বলে পর্ণা।

অসীম উঠে দাঁড়ায়। পর্ণা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তখনও গোটা বাড়িটা ঘুমে অচেতন। পর্ণা ভাবলো, মা বোধহয় ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু না। নীলিমা মিত্রের ঘুম অনেক, অনেক আগে ভেঙে গেছে। আর তিনি সব দেখেছেন।

এরকম চলে প্রতিদিন। রাতে ঘুম পাড়ানো আর ভোরে ঘুম ভাঙানো পর্ণার নিত্যকার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পর্ণার ভাল লাগে এ কাজ। অসীমকে সবার আগে দেখতে চায় সে। আবার রাতে শুতে যাওয়ার আগে অসীমকে না দেখে গেলে পর্ণার চোখের পাতায় ঘুম নামে না।

অসীম আর পর্ণার সবকিছু দেখে চলেন নীলিমা মিত্র দিনের পর দিন। তাদের প্রেম-অভিসার তার মনে শান্তি দেয়, আনন্দ দেয়। তিনিও একজন প্রেমিকা হয়ে ওঠেন মনেপ্রাণে। তেইশ বছর আগের নানা রঙের দিনগুলোর কথা মনে

করে তিনি আনন্দ পান। আবার পরক্ষণে দুঃখে তাঁর মনপ্রাণ ভরে ওঠে। কি যেন একটা জ্বালায় তিনি জ্বলতে থাকেন।

পর্ণা আর অসীমের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা বাঞ্ছনীয় নয়। একথা নীলিমা মিত্র খুব ভালকরেই জানেন। তিনি কোনো দিনই এ সম্পর্ক মেনে নিতে পারবেন না। তবুও তাদের কিছু বলতে মন চায় না। নীলিমা মিত্র ভাবেন পর্ণা আর অসীমকে নিয়ে, তাদের প্রেম-ভালবাসাকে নিয়ে। এটা অন্যায়, অশোভন তাও তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু তা সত্বেও চুপচাপ থাকেন। কিছু বললে অসীম যদি এবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তাহলে তাঁর খুব খারাপ লাগবে। অসীমকে না দেখে তিনি থাকতে পারবেন না। অসীম তাঁর যৌবনের কামনা-বাসনা, প্রেম-ভালবাসার স্মৃতিচিহ্ন। প্রথম যৌবনের সুখানুভূতির ধারক ও বাহক। এ সুখানুভূতিতে আছে সুখ শান্তি, আছে চোখের জল, দুঃখ-বেদনা, জ্বালা যন্ত্রণা। কিন্তু তবুও ভাল লাগে, অতীতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে নীলিমা মিত্রের ভীষণ ইচ্ছে করে। অসীম আর পর্ণাকে দেখতে দেখতে বিমলেন্দু আর তার প্রেম-অভিসারের কথা মনে পড়ে। সুখ এবং আনন্দের বন্যা বয়ে যায় তার দেহমনে। নিজেই পর্ণা হয়ে যান নিজের অজান্তে।

নীলিমা মিত্র দুচোখ ভরে দেখেন অসীম আর পর্ণার প্রেম-অভিসার। এটা পাহারা দেওয়া নয়। এ হলো অতীত প্রেমের সুখাস্বাদন। ফুরিয়ে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া ভালবাসাকে হৃদয়ের মণিকোঠায় আর একবার নতুন করে উপলব্ধি করার এ হলো আকুল প্রয়াস। এটা অতীত প্রেমের স্মৃতিচারণ।

আজকাল নীলিমা মিত্র অসীমকে প্রায়ই ডেকে পাঠান। তাঁর কাছে বসতে বলেন। এস্টেট সম্পর্কে নানা কথা, নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। নীলিমা মিত্রের চোখে মুখে কেমন যেন একটা ভাব ফুটে ওঠে। তিনি আকুল আগ্রহে অসীমকে দেখতে থাকেন। তার মধ্যে কী যেন খুঁজে ফেরেন।

অসীম অবাক হয়। ভয় পায়। শিউরে ওঠে। পর্ণার মা তারও মা। শ্রদ্ধার আর ভক্তির পাত্রী। তাঁর চোখে এমন দৃষ্টি কেন? তাঁর চোখে কামনা-বাসনা কেন?

একদিন পর্ণাকে বললো, জানো, তোমার মা যে ভাবে আমার দিকে তাকান আমার ভয় করে।

কেন?

আমার মধ্যে কী যেন খোঁজেন?

তোমাকে জামাই করবে তো। তাই বোধহয় যাচাই করে নিচ্ছে। তোমার ভয় নেই।

আজকাল কারণে অকারণে তাঁর কাছে আমাকে অনেক সময় বসিয়ে রাখেন।

বা! ভাবী জামাই। তোমাকে বসিয়ে রাখবে না কাকে রাখবে? আসলে তোমার সান্নিধ্য মার বোধহয় ভাল লাগে।

আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। ভয় করছে।

চাকরি যাওয়ার ভয়?

না। তোমাকে হারানোর ভয়।

পাগল হয়েছো। আমাকে হারাতে হবে না কোনদিন। গ্যারান্টি।

পর্ণার কথা শুনে অসীম আশ্বস্ত হলো। কিন্তু তার মনের আশঙ্কা গেলো না। কোথায় যেন সে ডুবে যাচ্ছে। দিনদিন জটিল জালে জড়িয়ে পড়ছে।

নীলিমা মিত্র তার মায়ের মতো। তাঁর চোখে এরকম ভাব ফুটে উঠবে কেন? মনের শান্তি খুঁজতে এসে দুঃখের জ্বালায় জ্বলতে হবে নাকি অসীমকে।

না, এভাবে আর দিন কাটানো সম্ভব না। ছমাস হোলো অসীম মিত্রলজ-এ এসেছে। এবার একটা ব্যবস্থা করে ফেলা দরকার। পর্ণাকে আর ফেলে রাখা যায় না। বিয়েটা অসীম সেরে ফেলতে চায় তাড়াতাড়ি।

এর মধ্যে নীলিমা মিত্র একদিন তলব করলেন অসীমকে। অসীম এলো। আজকের নীলিমা মিত্র অন্যদিনের মতো নয়। আজ তাঁকে অন্যরকম লাগছে। এরকম বেশবাসে এর আগে কোনদিন তাঁকে দেখেনি অসীম। নীলিমা মিত্রের পরনে বটলাগ্রিন শাড়ি, নাভির কাছে পাটকরা। গায়ে একই ব্লাউজ পিসের জামা। নাভির কাছে খোলা বেশ কিছুটা মেদবহুল। ডানহাতের মনিবন্ধে হাতঘড়ি। নতুন স্টাইলে চুল বাঁধা। দেখে মনে হলো বয়স যেন তাঁর অনেক কমে গেছে।

মুখে হাসি টেনে বললেন তিনি, একটু মার্কেটে বেরোবো। কিছু কেনা কাটা আছে। আমার সঙ্গে যেতে পারবে?

অসীম হতভম্ব হলো। কেমন যেন অস্বস্তির মধ্যে পড়লো। এর আগে অনেকবার নীলিমা মিত্রের সঙ্গে সে মার্কেটে গেছে। কিন্তু এরকম সাজ পোষাকে নয়। তাই এবার অসীম প্রচণ্ড ভাবে ধাক্কা খেলো। তবে কি তার আশংকাই ঠিক? নীলিমা মিত্র কি তাহলে তাকেই......? না, না, না। তা কেন হবে? উনি কি বুঝতে পারেন না, উনি আমার মায়ের মতো, ওঁর মেয়ে পর্ণা আমাকে ভালবাসে? নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন। তবে?

কি, কোন জরুরী কাজ আছে তোমার? নীলিমা মিত্র জানতে চাইলেন।

না। আমি গাড়ি বার করতে বলছি। আপনি আসুন।

অসীম চলে এলো। পর্ণাকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু কোথায় পর্ণা? এমন বিপদের সময় পাওয়া যাবে না তাকে? আশ্চর্য! কোথায় যে গেলো!

মার্কেট থেকে ফিরে এলো অসীম। কাজ তার শেষ হলো, কিন্তু ভাবনার ইতি হলো না। খুব খারাপ লাগছে। মনে মনে ঘৃণাও হচ্ছে। অসীমের সব রাগ পর্ণার ওপর পড়লো। কেন মিথ্যে রহস্যের মধ্যে ফেলে রাখা তাকে? বলে দিলেই হয় বিয়ের কথা। মিটে যায় ঝঞ্ঝাট।

কিন্তু না। পর্ণা কিছুতেই তা করবে না। কেন তা কে জানে? বিয়ের কথা বললেই পর্ণা বলে দাঁড়াও না আর কিছুদিন। বেশ তো আছি।

কিন্তু আমি যে শেষ হয়ে যাচ্ছি দিন দিন। একজনের চোখের চাউনি আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। ওই চাউনি আমার অশান্তির, দুঃখের আর মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একথা কে বুঝবে? মনে মনে বললো অসীম।

না। আর দেরী নয়। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। পর্ণাকে রাজী করাতে হবে যে কোনো উপায়। নইলে আর পারা যাচ্ছে না। দিনদিন অশান্তির জালে জড়িয়ে পড়ছে অসীম। এ জাল থেকে সে মুক্তি চায়। এ চিন্তা ভাবনার হাত থেকে রেহাই পেতে চায় চিরতরে।

পর্ণাও অবাক হয়। ভাবে আজকাল, একী রূপ তার মার চোখে মুখে! দেহমনে যেন তাঁর কামনা বাসনা ঝরে পড়ছে। অসীমের কাছ থেকে সব কিছু লুটেপুটে নিতে চায় যেন তার মা। অসীমের পুরুষ সত্তা বোধহয় কিনে ফেলতে চায়। তাই এক লোলুপ দৃষ্টি তাঁর চোখে মুখে, তাঁর সাজ সজ্জায়, তাঁর হাসিতে, তাঁর চলার গতিতে আর ছন্দে। না না। এ অসম্ভব। এ কিছুতে হতে দেবে না পর্ণা। তাড়াতাড়ি অসীমকে সে আপন করে নেবে। মার ওপর ঘৃণা, আক্রোশ যাতে আর না বাড়ে তার চেষ্টা করবে।

নিজেকে শক্ত করে তুললো পর্ণা। তৈরী হলো মনে মনে।

না। এ একেবারেই অসম্ভব। এ কিছুতেই হতে পারে না। নীলিমা মিত্রের গলার স্বর গমগম করে উঠলো। ঘরের স্তব্ধতা কোথায় যেন মিলিয়ে গেলো।

কেন? তির্যক হাসি টেনে জিজ্ঞাসা করলো পর্ণা।

না, অসীমের সঙ্গে তোমার বিয়ে আমি দেবো না, দিতে পারি না।

কেন? সেটাই তো জানতে চাইছি?

তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তুমি কি আটকাতে পারবে আমাদের বিয়ে?

পারবো। যে করে হোক এ বিয়ে আমি বন্ধ করবোই। তার জন্যে যে মূল্য দিতে হয় দেবো, যত নিচে নামতে হয় নামবো। এটা জেনে রেখো।

আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না সেখানে নীলিমা মিত্র। ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

পর্ণা অবাক হলো। তাহলে অসীমের ধারণাই ঠিক। তার মা অসীমকে অন্যদৃষ্টিতে দেখে এসেছে এতোদিন। আশ্চর্য্য! তার মা এতো নীচ, এতো জঘন্য। ভাবতে ঘৃণা হয় পর্ণার। মা তার সুখের ও শান্তির পথের কাঁটা, তার পরম শত্রু।

রাতে ঘুমুতে পারে না পর্ণা। ছটফট করে।

জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। আকাশে চাঁদ উঠেছে। আলোর প্লাবনে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। পৃথিবীর রূপরস গন্ধ-বর্ণ সবই আছে। সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে প্রকৃতি যেন দরজায় দাঁড়িয়ে। সব ঠিক আছে। ঠিক নেই শুধু পর্ণা। তার মনে আনন্দ নেই, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। দুঃখের জ্বালায়, অবিশ্বাসের আগুনে পর্ণা জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার দেহের শিরায় শিরায় এক প্রচণ্ড অনুভূতির দাবদাহ-যন্ত্রণা। শত চেষ্টা করেও এ যন্ত্রণা থেকে সে মুক্তি পাচ্ছে না।

সবকিছু শুনলো অসীম পর্ণার কাছে। অবাক না হয়ে পারলো না। এ কি বিগত যৌবনের লালসা, না অন্যকিছু? এ কি ব্যর্থ প্রেম-ভালবাসা চরিতার্থ করবার অসাধ্য সাধনা, না হারিয়ে যাওয়া জীবন-যৌবনের অদম্য কামনা বাসনা? না, আর কিছু—ভাবতে পারছে না অসীম। এরা যে এতো নোংরা, এতো জঘন্য তা সে আগে বুঝতে পারেনি। এখন কী করবে অসীম? কোথায় যাবে?

মা ও মেয়ের অবিশ্বাস, আত্মকলহই দিন দিন বেড়ে চলতে থাকলো। সামান্য বিষয় নিয়ে তাদের মতভেদ দেখা দিলো। তারা পরস্পরের ওপর আস্থা হারালো। একই বাড়িতে বাস করেও মা ও মেয়ে অনেক দূরের মানুষ হয়ে উঠলো।

এ মনোভাবের চরম প্রকাশ ঘটলো একদিন। পর্ণা যথারীতি ভোরে অসীমের ঘুম ভাঙাতে এলো। অসীমের বিছানায় বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে

লাগলো। অসীমের চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। তার মন বিষণ্ণ। হঠাৎ পর্ণার চোখ চলে গেলো জানলার দিকে। পর্ণা শিউরে উঠলো, তাজ্জব ব্যাপার। নীলিমা মিত্র চুরি করে দেখছেন অসীম আর পর্ণাকে। ছিঃ ছিঃ লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করলো পর্ণার।

মা তাহলে অনেক দূর এগিয়েছেন। মনে মনে বললো পর্ণা।

পর্ণা মাকে দেখেও দেখলো না। অবিশ্বাস আরো বেড়ে গেলো।

অসীমকে বললো ব্যাপারটা। অসীম শুনলো। কোনো মন্তব্য করলো না। কী যেন ভাবতে লাগলো।

না, আর দেরী না। এবার মার সামনেই তোমাকে বিয়ে করবো আমি। এস্টেট ভাগ করে নেবো। দেখি কী করে মা। পর্ণা অসীমকে বললো দৃঢ়কণ্ঠে।

অসীম চমকে উঠলো। দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেলো। একটা কিছু করতে হবে। মা ও মেয়ের মধ্যে তাকে নিয়ে অবিশ্বাস, আত্মপ্রতারণা, এস্টেট ভাগাভাগি, রাগারাগি, মনোকষ্ট আর অশান্তি। এসব আর বাড়তে দেবে না অসীম। যে করে হোক একটা বিহিত করার প্রয়োজন। এর জন্যে তার জীবন বরবাদ হবে, তা হোক। দুঃখ করে লাভ নেই। মা ও মেয়ে বরং সুখে থাক, শান্তিতে বসবাস করুক। মা মেয়েকে স্নেহ করুক, ভালবাসুক। মেয়ে মাকে ভক্তি করুক শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াক মায়ের কাছে ঠিক আগের মতো। নইলে ভগবান অসীমকে ক্ষমা করবে না। নিজের কাছে নিজে অপরাধী হয়ে থাকবে সে চিরকাল।

এক সপ্তা পরের ঘটনা। ভোরবেলা অসীমের ঘরে এলো পর্ণা। কিন্তু একী! বিছানা খালি! অসীম নেই! এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো পর্ণা। না, কোথাও দেখা যাচ্ছে না অসীমকে। বড় আলোটা জ্বাললো। বিছানায় একটা চিঠি পড়ে আছে। পর্ণাকে লেখা। অসীমের চিঠি।

"পর্ণা, চললাম। আমাকে খোঁজ করো না। করলেও কোনদিন আমার সন্ধান পাবে না। আমাকে নিয়ে তোমাদের মা ও মেয়ের দ্বন্দ্ব এমন নোংরা স্তরে এসে পৌঁছেছে, সেখানে আমার আর থাকা চলে না। আমি ভেবে দেখলাম, সবকিছুর জন্যে দায়ী আমি। মাকে অবিশ্বাস করা মহাপাপ যা তুমি ইদানিং করতে শুরু করেছো। মেয়ের প্রেমিকের প্রতি প্রেমাসক্ত হওয়া জঘন্যতম অপরাধ; তোমার মা বোধহয় তাই করতে চলেছেন। এরকম পরিস্থিতিতে

আমাকেই সরে দাঁড়াতে হলো। এ ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলাম না। এতোদিন যা ঘটেছে তা ভুলে যাও। তোমরা দুজন সুখী হও, শান্তিতে থাকো। আর যদি পারো আমাকে ক্ষমা করো। ইতি—অসীম।”

চিঠি পড়ে হতভম্ব হয়ে গেলো পর্ণা। গলা ছেড়ে কেঁদে উঠতে চাইলো। কিন্তু পারলো না। শুধু চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো। নীরব কান্নায় ভেঙে পড়লো।

বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলো পর্ণা। কী যেন ভাবলো। তারপর চিঠিটা নিয়ে ধীর পদক্ষেপে মার ঘরে ঢুকলো। চোখে তার ঘৃণা আর প্রতিহিংসা। রাগে, দুঃখে, অভিমানে ফুলে ফুলে উঠছে সে।

নীলিমা মিত্র অবাক হলেন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালেন পর্ণার দিকে।

পর্ণা কোনো কথা না বলে অসীমের চিঠিটা তুলে ধরলো মার চোখের সামনে।

চিঠিটা পড়লেন নীলিমা মিত্র। দুঃখে কাতর হলেন। লজ্জাও পেলেন। তাঁর মুখমণ্ডল পাংশু হয়ে উঠলো। মুখে কিছু বললেন না। পর্ণার দিকে একবার তাকালেন।

তোমার লালসা আর কামনা-বাসনার জন্যে আমি অসীমকে হারালাম। মা হয়ে মেয়ের এতো বড় সর্বনাশ কেউ যে করে তা আমার জানা ছিলো না। পর্ণা ক্রুদ্ধ নাগিনীর মতো ছোবল মারলো তার মাকে।

নীলিমা মিত্র চুপ করে রইলেন। মেয়েকে ভাল করে দেখলেন আর একবার। এ হলো সেই ছোট্ট পর্ণা, যাকে তিনি তিলে তিলে স্নেহ মায়া মমতা দিয়ে বড় করে তুলেছেন, মানুষ করেছেন।

কী? জবাব দিচ্ছো না যে? কেন তুমি আমার এমন সর্বনাশ করলে? কেন তুমি অসীমকে এখান থেকে তাড়ালে? কান্নায় ভেঙে পড়লো পর্ণা।

নীলিমা মিত্র একটু ভাবলেন। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধরা গলায় বললেন, তোর সব প্রশ্নের উত্তর আমি আজ দেবো পর্ণা। শুনে তুই দুঃখ পাবি, বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবি। আমাকে কী ভাববি তা জানি না। তবুও নিজেকে আজ তোর কাছে খুলে না ধরে উপায় নেই আমার। পর্ণা কোনো কথা বললো না। মার দিকে একবার চেয়ে দেখলোও না।

নীলিমা মিত্র বলতে লাগলেন, আজ থেকে তেইশ বছর আগের কথা। আমি তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। বাবা আমার জন্যে একজন প্রাইভেট টিউটর রাখলেন।

নাম বিমলেন্দু সেন। জাতিতে বৈদ্য। আমাদের বাড়িতে থাকতো, আমাকে পড়াতো আর নিজে এম. এ. পড়তো। বিমলেন্দুর মধ্যে আমি কী দেখতে পেলাম জানি না। ওকে আমি ভালবেসে ফেললাম। আমার বাইশ বছরের জীবন যৌবন বিনাদ্বিধায় ওর হাতে তুলে দিলাম। বিমলেন্দুর এচোখের অসহায়ভাব আর করুণ চাউনি আমাকে পাগল করে তুললো, আমি সব ভুলে ওর প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। আমি প্রায়ই কলেজ পালাতাম। কতদিন সুন্দর বিকেলে আমরা দুজন পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে গেছি ইডেনের ঝাউবনে, ময়দানের আবছা আবছা অন্ধকারে, চৌরঙ্গী রোডের জনারণ্যে আবার কখনো বা নিউ এম্পায়ারের দোতলার সেই একান্ত কোণে। আমরা অভিসার করে ফিরতাম আরো কতো জায়গায়। প্রেমের গানে গানে ভরে উঠতো আমাদের হৃদয় মন। আমাকে বিমলেন্দু লাল রঙের শাড়ি পরতে বলতো। কেননা, লাল রঙ বসন্তের রঙ, আনন্দের রঙ। এ রঙ ছিলো ওর ভীষণ পছন্দ। বিমলেন্দুর সঙ্গে আমি ঘুরতে ঘুরতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম, ভবিষ্যতের মধুর স্বপ্নে বিভোর হতাম। একটা একটা করে দিন কেটে যেতো : কখন সুরু হতো নতুন দিন, কখন শেষ হতো, বুঝতে পারতাম না। শুধু একবুক আনন্দ, হাসি আমাদের ঘিরে থাকতো। খুশীর ঝাঁক ঝাঁক অনুভূতিতে, গভীর সুখের তরঙ্গে ভেসে ভেসে সময় কেটে যেতো আমাদের।

এতে কিন্তু আমার মন ভরতো না। আরো বেশী করে পেতে ইচ্ছে করতো বিমলেন্দুকে। রাতের বিছানায় চঞ্চল হয়ে উঠতাম, ছটফট করতাম। নিচের ঘরে বিমলেন্দু থাকতো। ওর কাছে যাওয়ার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠতাম।

একদিন রাতে পা টিপে টিপে বিমলেন্দুর ঘরে চলে গেলাম। বিমলেন্দুকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। দেহমন ভরে উঠলো। বিমলেন্দু অবাক হলো। ও বললো, না, না, এ অন্যায়। এতে বিপদ আছে নীলিমা।

আমি শুনিনি। আমি তখন কেমন যেন মোহগ্রস্ত। বিমলেন্দুকে বুকে পাওয়ার জন্যে পাগল। তাই বিপদের কথায় ভয় পাইনি।

সাহস আমার বেড়ে গেলো। একটা অদম্য নেশা আমায় পেয়ে বসলো। প্রতিরাতে আমি অভিসারে বেরুতে লাগলাম। হ্যাঁ নৈশ অভিসারে। বিমলেন্দুর ঘরে আসতাম আমি চুপি চুপি রাতের অন্ধকারে।

এরপর যা হওয়ার তাই হলো। একদিন ধরা পড়ে গেলাম। বাবার চোখে

ক্রোধের আগুন। জ্বলজ্বল করছে। বংশের মুখে কালি মাখাতে দেবে না বাবা। এখুনি এ প্রেমের শিকড় তুলে ফেলবে।

এখন থেকে তেইশ বছর আগের ঘটনা। ভেবে দেখ্ ব্যাপারটা একবার। আমি জানতাম বাবা বিমলেন্দুকে কী শাস্তি দেবে। তাই বারবার মিনতি করে বললাম, বাবা, ওকে তুমি ছেড়ে দাও। ওর কোনো দোষ নেই। সব কিছুর জন্যে দায়ী আমি। যে শাস্তি দিতে চাও, আমাকেই দাও।

বাবা আরো রেগে গেলেন। তার চোখ মুখ লাল টকটক করছে। গম্ভীর গলায় আদেশের স্বরে আমাকে বললো, ভেতরে যাও, আজ থেকে বাইরে বেরোনো তোমার বন্ধ।

আমি জানতাম বিমলেন্দুকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। যে লোক বোস-বাড়ির মুখে কালি দিয়েছে তাকে বাঁচতে দিলে ভবিষ্যতে এ বাড়ির অনেক ক্ষতি হতে পারে।

বিমলেন্দুর আর কোনো খবর পাইনি। বাবা বিমলেন্দুকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন। কিন্তু আমার মন থেকে বিমলেন্দুর স্মৃতি কেউ কোন দিন মুছে দিতে পারলো না।

তারপর পনেরো দিনের মধ্যেই বোস বাড়িতে শানাই বেজে উঠলে। আমার বিয়ে হয়ে গেলো। আমি এ মিত্রলজ এর বৌ হয়ে এলাম। কিন্তু বিমলেন্দুকে কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি কাজে, চিন্তায়, ভাবনায় আমি ওকে খুঁজে বেড়াতাম। অপূর্ব সুন্দর চোখ দুটো তুলে বিমলেন্দু যেন আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। ওর ঠোঁটের কোণে, চোখের পাতায় লাজুক হাসি ঝিলিক মারতো। চোখ বুজলেই আমি বিমলেন্দুকে স্পষ্ট দেখতে পেতাম।

মিত্রলজ-এর ভোগবিলাসের মধ্যে আমি হাঁপিয়ে উঠতাম। মনে প্রাণে দুঃখ অনুভব করতাম। কোথায় যেন একটা মস্ত অভাব লুকিয়ে আছে। সেটা কিছুতেই পূরণ হচ্ছে না, হবেও না আর এ জীবনে।

আমি কলেজ জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতাম। আমার দেহের কামনা মনের বাসনা মূর্ত হয়ে উঠতো বিমলেন্দুর ভাব ভাবনায়।

ও ছিলো আমার স্বপ্নের রাজকুমার, আমার হৃদয়ের পরম আত্মীয়, আমার মনের সুখ শান্তির চাবিকাঠি।

এ পর্যন্ত বলে চুপ করলেন নীলিমা মিত্র। একটু যেন জিরিয়ে নিতে

চাইলেন। হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে প্রতিটি শব্দ বার হয়ে আসছে, তাঁর কথায় বেদনা ঝরে ঝরে পড়ছে।

হাজার রকমের সুযোগ সুবিধা, আনন্দ বিলাসিতার মধ্যেও আমি মনের সুখ শান্তি খুঁজে পেলাম না। নীলিমা মিত্র টেনে টেনে বলতে লাগলেন। আমার মন প্রাণ বিমলেন্দুর বিদেহী আত্মার জন্যে কেঁদে ফিরতে লাগলো। ওর মৃত্যুর কারণ আমি। আমার হঠকারিতার জন্যে, নির্বুদ্ধিতার জন্যে বিমলেন্দু এ সুন্দর পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলো, মুছে গেলো—একথা কিছুতেই ভুলতে পারতাম না। অসহ্য বেদনায় আমি অস্থির হতাম।

প্রথম যৌবনের স্বপ্নে আমি বিভোর হয়ে থাকতাম। মনে মনে, কল্পনায় আমি বিমলেন্দুর সঙ্গে অভিসার করে বেড়াতাম। আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেতো আমার সারা অঙ্গে।

এভাবে দিন কাটছিলো। আমার মনের খবর কেউ রাখতো না। মিত্রলজ-এর সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যে আমি অস্বস্তিতে দিন কাটাতাম, জ্বালা যন্ত্রণায় কাতর হতাম। তোর কলেজ জীবন দেখে, বারবার আমি আমার কলেজ জীবনে ফিরে যেতাম। আমার ক্ষুধার্ত মন, পিপাসিত আত্মা নিজের বয়সের কথা ভুলিয়ে দিতো। আমি তোর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হতাম।

এরপর অসীম এলো। ওকে দেখে আমি অবাক হলাম। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই অবয়ব। অসীম ঠিক বিমলেন্দুর মতো দেখতে। ও বিমলেন্দুর প্রতিচ্ছবি। বিমলেন্দুর ছায়া নিয়ে অসীম এলো আমার সামনে। আমি চোখ ফেরাতে পারলাম না। আমি কেমন হয়ে গেলাম। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আবার প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেলাম। একবার ভাবলাম অসীমকে চাকরি দেবো না। কিন্তু পরক্ষণে আমার মন-প্রাণ হাহাকার করে উঠলো। বিমলেন্দুর কাছে আমি মহাপাপ করেছি। বিমলেন্দুরই প্রতিমূর্তি অসীম। ওকে আমি অবহেলা করি কী করে? আমি পারলাম না অসীমকে দূরে সরিয়ে দিতে।

অসীম এলো মিত্রলজ-এ ম্যানেজার হয়ে। এক অদৃশ্য শক্তি অসীমের কাছে আমাকে টেনে আনতে লাগলো বারবার। তোর আর অসীমের প্রেম অভিসার দেখতাম আমি প্রাণ ভরে। এতেই আমার আনন্দ, এতেই ছিলো আমার সুখ, আমার পরম তৃপ্তি। অনেক ভেবেছি, অসীমের সঙ্গে তোর এত মেলামেশা উচিত নয়, তোকে বারণ করবো। কিন্তু পারিনি। পাছে অসীম যদি এ বাড়ি

ছেড়ে চলে যায় সে ভয়ে। বুদ্ধির দোষে বিমলেন্দুকে হারিয়েছি। তাই কোনো কিছুতেই বিমলেন্দুর ছায়া অসীমকে হারাতে মন চাইতো না আমার।

তুই প্রতিদিন ভোরে যখন অসীমের ঘরে যেতিস ওর ঘুম ভাঙাতে, আমি তোর পিছু নিতাম। মনে হতো আমি যেন তেইশ বছর আগে বিমলেন্দুর ঘরে যাচ্ছি নৈশ অভিসারে। অন্তর আনন্দে ভরে যেতো। দুচোখ ভরে তোদের প্রেম অভিসারের সাক্ষী হতাম।

অসীমকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করতো। তাই নানা কাজের অছিলায় ওকে ডেকে পাঠাতাম আমার কাছে। আটকে রাখতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ওর সান্নিধ্য আমার ভাল লাগতো। আমার চোখ বারবার সার্ভে করতো অসীমকে। তখন আমি তো আর আমি থাকতাম না। আমি তেইশ বছর আগের নীলিমা বসু হয়ে যেতাম। আর অসীম হয়ে উঠতো বিমলেন্দু সেন কেন জানি না, তেইশ বছর বয়সে যেমন আমি ছিলাম, ঠিক তেমনি হতে ইচ্ছে করতো, ঠিক তেমনি সাজগোজ করতে মন চাইতো। শত চেষ্টা করেও সংযত করতে পারতাম না নিজেকে।

হাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। বললেন নীলিমা মিত্র। একটু কী যেন চিন্তা করলেন আপন মনে। পর্ণা মার মুখের দিকে তাকালো। তার চোখে মুখে জিজ্ঞাসা।

আমি মিত্রলজ-এ বৌ হয়ে এলাম। নীলিমা মিত্র খেই ধরলেন। আসার ন'মাস পরে তুই এ পৃথিবীর আলো দেখলি। কেউ কিছু সন্দেহ করলো না। কেননা, এরকম অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। দশমাসের পরিবর্তে নমাসে অনেকের বাচ্চা হয়। কাজেই কারো মনে কোনো সন্দেহ জাগলো না। কিন্তু আমি? আমি তো জানতাম ব্যাপারটা! আসলে আমার যখন বিয়ে হলো এ মিত্রলজ এর ছেলের সঙ্গে, তুই তখন আমার পেটে। আর বিমলেন্দু, হাঁ, বিমলেন্দু সেনই তোর বাবা।

ঘরে যেন বজ্রপাত হলো। পর্ণা চমকে উঠলো। তার চোখ মুখ অস্বাভাবিক রকমের লাল হয়ে উঠেছে! দৃঢ়কণ্ঠে বললো, একী বলছো তুমি ??

সব কিছুই সত্যি। আমার একটা কথাও মিথ্যে নয়। অসীম বিমলেন্দুর মতো দেখতে। বিমলেন্দু তোর বাবা। অসীম তোর বাবারই ছায়া, প্রতিমূর্তি। ওর সঙ্গে তোর বিয়ে। এ বিয়েতে কী করে আমি মত দিই, বল্? তুই হয়ত বলবি এটা নিছক গোঁড়ামি। হয়তবা তাই-ই। তবুও আমি দাঁড়িয়ে থেকে তোদের বিয়ে দেবো এটা একেবারেই অসম্ভব। বারবার ভেবেছি সব কিছু

তোদের দুজনকে খুলে বলি। কিন্তু পারিনি। সব শুনে অসীম যদি পালিয়ে যায়, সে আশঙ্কায়। অসীম এখানে থাক। ও বিমলেন্দুর প্রতিচ্ছবি, আমার প্রথম যৌবনের স্মৃতি, প্রেম-ভালবাসার গঙ্গোত্রী। ওকে কি আমার কাছ থেকে তাড়াতে পারি?

অসীমকে আমি হৃদয়ের এক আসনে বসিয়েছিলাম। ওকে দিয়ে আমার কামনা বাসনা চরিতার্থ করতে চাইনি। অসীমকে পেয়ে আমি বিমলেন্দুর খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছিলাম। বিমলেন্দুর কাছে আমি অপরাধী, ওর মৃত্যুর জন্যে দায়ী আমি। এ ভাবনা আমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে মারতো, আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিতো। অসীমকে কাছাকাছি রেখে সে-অশান্তির আগুন থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম শুধু। বিমলেন্দুর বিদেহী আত্মার কাছে আমি প্রায়শ্চিত্তের পথ খুঁজে পেয়েছিলাম।

সে-ই অসীমকে আমি তাড়াতে পারি কখনো? ওর সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চাইনি। তা বলে অসীমকে এ বাড়ি থেকে আমি তাড়িয়ে দেবো? এটা কী করে সম্ভব?

তোর বাবার মতো দেখতে একটা ছেলের সঙ্গে কী করে তোর বিয়ে দিই, বল? আমি নিজে তা পারি না, কিছুতেই পারি না, কিছুতেই পারি না। কোথায় যেন একটা প্রচণ্ড বাধা মাথা উঁচু করে উঠতে চায়। এ বাধা দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয়ের মতো। আমার ক্ষমতা নেই একে অতিক্রম করা। তুই আমাকে ক্ষমা কর পর্ণা।

চুপ করলেন নীলিমা মিত্র। নিজেকে হাল্কা করলেন তিনি। চোখের জলে তাঁর দুচোখ ভেসে যাচ্ছে। তিনি ফুলে ফুলে কাঁদছেন।

পর্ণার মুখে কোনো কথা নেই। তারও চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে অবিরল।

ঘরের আবহাওয়া বিষণ্ণ, করুণ। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ। তারই মধ্যে দুটি নারী-হৃদয় একটি পুরুষের জন্যে বোবা কান্নায় কেঁদে ফিরছে। এ কান্নার শেষ নেই, এ কান্নার সীমা নেই। এ কান্না প্রেমের কান্না, এ কান্না ব্যর্থতার কান্না। যুগযুগ ধরে এ কান্না চলে আসছে আর চলতে থাকবে বোধহয় চিরকাল।

সুখের আকাশ

নির্মলেন্দু গৌতম

সামনের কাঁচটাও নামিয়ে দিয়েছে দীপেন। বাতাসে এখন শুধু চুল আর শাড়িই নয় সুমিত্রা নিজেই যেন উড়ে চলেছে।

সন্ধ্যে হতে হতেই শহর ছাড়িয়ে এসেছে দীপেনের জীপ। এখন জঙ্গলের ভেতরের আশ্চর্য অন্ধকারে জীপের হেড লাইটের তীব্র আলোয় ছুটন্ত জীপের শব্দ রোমাঞ্চিত করে তুলেছে সুমিত্রাকে। দীপেন আর নিখিলের মাঝখানে সীটের পেছনে একটুখানি পিঠ ঠেকিয়ে বসেছে সুমিত্রা। সীটের ওপর দীপেনের ড্রাইভিং সীট পর্যন্ত চলে গেছে নিখিলের হাত। সে হাতের উষ্ণ স্পর্শ মাঝে মাঝেই ছুঁয়ে যাচ্ছে সুমিত্রাকে।

বাঁ দিকে একটু ফিরে সামনে চোখ রেখেই দীপেন হঠাৎ বললো, 'আচ্ছা, হঠাৎ যদি দেখতে পান একটা দেয়ালে ঠেকে গেছে হেড লাইটের আলো দুটো —তাহলে কি ভাববেন?'

'সেকী', দেয়াল আছে নাকি পথের ওপর?' অবাক হয়ে বললো সুমিত্রা।

'নেই ভাবছেন? আছে। রাস্তা জুড়ে যখন একটা হাতি দাঁড়ায়। তখন দেয়াল ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।' দীপেনের মুখে সামনের হেড লাইট থেকে অস্পষ্ট আলোর আভাস।

মুহূর্তের জন্যে হাতখানা বাড়িয়ে নিখিলের মধ্যে আশ্রয় খুঁজলো সুমিত্রা। তারপর বললো, 'হাতি দেখেছেন কখনও?'

'উহু, আমি দেখিনি। কিন্তু অনেকেই দেখেছে। লরীগুলো নাকি প্রায়ই ক্যানেস্তারা পিটিয়ে হাতিকে জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়।' দীপেন বললো আস্তে আস্তে।

সভয়ে চারদিকে তাকালো সুমিত্রা। বললো, 'এখন কিন্তু ভয় হচ্ছে আমার।'

নিখিল বললো, 'তার ওপর আবার খোলা জীপ। শুঁড় বাড়িয়ে তুলে নিলেই হলো।'

দীপেন হেসে বললো, 'কথাটা মিথ্যে নয়।'

সুমিত্রা সভয়ে ফের একবার চারদিক দেখে নিলো তারপর ভয়টুকুকে হাল্কা

করে দেবার জন্য বললো, 'তাহলে তো তোমার ভালোই হয় নিখিল। আর একবার বিয়ে করে ফেলতে পারবে।'

নিখিল কিছু বলতে চেষ্টা করলো। তার আগেই সুমিত্রা দীপেনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি তো এই পথ দিয়ে এমনি হুডখোলা গাড়িতেই নিয়মিত যান?'

'যেতে হয়।' হাসলো দীপেন।

সুমিত্রা বললো, 'সত্যি সাহস আছে আপনার।'

'ঐ একটাই আছে জীবনে।' সহজ গলায় বললো দীপেন।

'আপনার কাছ থেকে একটু ধার নিতে ইচ্ছে হয়।'

নিখিল হাসলো শব্দ করে। বললো, 'সে ধার শুধবে কি করে?'

হেসে সুমিত্রা বললো, 'সব ধার শুধতে হয় না। তাহলে সৌন্দর্য থাকে না তার।'

'কি জানি সব ধার বলতে কি বলছো তুমি!' নিখিল উদাস ভঙ্গি করলো।

'তোমরা সে সব জানতে চাও না। চাইলে ঠিক বুঝতে পারতে।'

দীপেন মৃদুস্বরে বললো, 'ঠিক বলেছেন।'

নিখিল আর কিছু বললো না।

সুখের ভঙ্গি করে সুমিত্রা কপালে উড়ে পড়া চুল সরালো, অনুভব করলো উড়তে থাকা আঁচল। কাঁধের কাছে নিখিলের হাতের উষ্ণতাটুকুও অনুভব করলো। তারপর পরিপূর্ণভাবে তাকালো অরণ্যের দিকে।

হেডলাইট দুটো নিবিয়ে দিলে বোধহয় আরো ভালো লাগতো। মনে হলো সুমিত্রার। নিবিড় হয়ে উঠতো ভয় আর ভালোলাগা। নিখিলের অস্তিত্ব সেই ভয় আর ভালোলাগার মধ্যে নিবিড় হয়ে উঠতো আরো।

দীপেনকে বলবে নাকি হেডলাইট দুটো নিবিয়ে দিতে!

না, বলবে না। কথাটা শুনলে নিশ্চয়ই হাসবে দীপেন। অরণ্যের ভেতরের এই ঘন অন্ধকারে জীপ চালানো যায়! রাস্তার পাশের খাদে গাড়ি সুদ্ধ গড়িয়ে পড়তে কতোক্ষণ! আর একবার গড়িয়ে পড়লে!

দীপেন হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললো, 'কেমন লাগছে এখনো বললেন না তো!'

'খুব ভালো লাগছে।' উচ্ছ্বসিত গলায় বললো সুমিত্রা।

'এজন্যেই খোলা জীপে নিয়ে এসেছি। ফিরবোও খোলা জীপে।' দীপেন বললো।

নিখিল বললো, 'তোমার বন্ধু আজ রাতে ফিরতে দেবে না নিশ্চয়ই।'

'তবু চেষ্টা করবো ফিরে আসতে। গভীর রাতে বনের ভেতরটা আরো জমজমাট মনে হয়। সেটা না দেখলে আর কি দেখালুম।'

এই অরণ্যের গভীর রাতের ছবি চোখে ভাসলো সুমিত্রার। আরো জমজমাট বন—অন্ধকার আরো গভীর—গাছপালাগুলো আরো দীর্ঘ আরো ঘন! বনের জন্তু জানোয়ারের শব্দ পাতায় পাতায় প্রতিধ্বনি তুলে ফিরছে!

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো সুমিত্রার।

দীপেন আজ অন্ধকার বনের ছবি দেখতেই নিয়ে এসেছে তাদের দুজনকে। নিখিলের ঘনিষ্ঠবন্ধুদের একজন দীপেন। এখানে এসেই দীপেনের সঙ্গে নিখিলের প্রথম আলাপ হয়েছিলো। তখুনি অরণ্যের গল্পে ভরিয়ে রেখেছিলো সময়। বলেছিলো 'একদিন আপনাকে বন দেখাবো। দিনের বেলায় নয় রাত্রে।'

অসম্ভব উৎসাহে সুমিত্রা বলেছিলো, 'আপনার গল্প শুনে এখুনি যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

আর তখুনি অরণ্য দেখবার দিনক্ষণ সব ঠিক হয়ে গিয়েছিলো। নিখিলও তেমনি করে অরণ্য দেখেনি বলে তারও উৎসাহ কম ছিলো না। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলো সুমিত্রা।

আজ শেষ দুপুরে দীপেনের জীপের শব্দ দরজায় বেজে উঠতেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো সুমিত্রা। ছেলে মানুষের মতো খুশীতে ছুটে এসে দরজা খুলে হুডখোলা জীপ দেখে বলেছিলো, 'একী, হুডখোলা জীপ কেন?'

'না হলে আনন্দ হয় না। বন্ধ জীপে চারদিক দেখবেন কি করে?' দীপেন বলেছিলো সঙ্গে সঙ্গে।

'ভয় করবে না?' চোখ বড়ো বড়ো করে বলেছিলো সুমিত্রা।

দীপেন সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলো, 'ভয় করবে কেন? বন তো শুধু ভয় করবার নয়, ভালো লাগবারও।'

'কিন্তু রাতে যে ওসব জায়গা ভয়ংকর হয়ে ওঠে।' তেমনি চোখ বড়ো বড়ো করেই সুমিত্রা বলেছিলো।

দীপেন হেসে বলেছিলো, 'তা সত্যি কিনা বুঝতে পারবেন।'

সত্যিই, এখন সুমিত্রা বুঝতে পারছে অরণ্য ভয়ংকর নয়। কিন্তু সে কথাটা ইচ্ছে করেই বললো না দীপেনকে।

হঠাৎ জীপের গতি কমে এলো।

'কি হলো ?' নিখিল বললো অবাক হয়ে।

ভারি গলায় খানিকটা আত্মমনস্কভাবে দীপেন বললো, 'মনে হচ্ছে একটু গোলমাল হয়েছে ইঞ্জিনে। দাঁড়াও, দেখছি।'

'দাঁড়াতে হবে নাকি ?' নিখিল শুধালো।

'হ্যাঁ।'

বলে জীপ থামালো রাস্তার ধার ঘেঁসে। হেডলাইট নিবিয়ে দিলো। নেমে পড়লো তারপর।

নিখিলও নেমে পড়লো।

দীপেন সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি বসুন ওখানেই। আমরা দেখছি কি হলো।'

নিখিল বললো, 'ভয় লাগবে নাকি ?'

'আমি কি ছেলেমানুষ ?' বলে হাসলো সুমিত্রা।

একাই জীপের ওপর বসে রইলো সুমিত্রা। ওরা ইঞ্জিনের ডালা তুলে দিয়ে আড়াল হয়ে গেলো সুমিত্রার চোখের সুমুখ থেকে।

অন্ধকার বনের দিকে তাকালো সুমিত্রা। সত্যিই অদ্ভুত লাগছে। স্বপ্নেও এমনি একটা ছবি ভাবতে পারেনি সুমিত্রা। ভাগ্যে গাড়িটা খারাপ হয়েছিলো।

পেছনে খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। কেউ যেন শুকনো পাতা মাড়িয়ে আসছে। সমস্ত শরীর শির্ শির্ করে উঠলো।

চমকে পিছনে ফিরলো সুমিত্রা।

ফিরেই স্থির হয়ে গেলো। গাড়ির পেছনের লাল আলোয় বাঘের বিরাট আর ভয়াবহ একখানি মুখ জেগে উঠেছে।

অন্ধকারে মিশে আছে তার বিরাট শরীর। অরণ্যের অন্ধকার শরীরই যেন বাঘ হয়ে এসেছে.।

প্রবল ভয়ে চীৎকার করতেও ভুলে গেলো সুমিত্রা।

শক্ত হয়ে বসে রইলো সুমিত্রা। মৃত্যুর মতো একটা অনুভব ক্রমশ যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে সুমিত্রাকে। সেই অনুভবের মধ্যেই সুমিত্রা স্পষ্ট বুঝতে পারছে, যে কোনো মুহূর্তে বিরাট জুটো থাবা তার কাঁধের ওপর পড়বে। তারপর লাল আলোয় ভয়ংকর হয়ে ওঠা দাঁত গুলো আমূল বসে যাবে তার শরীরে। অরণ্যের গভীরে তার অসহায় শরীর মিলিয়ে যাবে বাঘের মুখে।

কতোক্ষণ অমনিভাবে ছিলো সুমিত্রা, জানে না। হঠাৎ গর্ গর্ করে উঠলো ইঞ্জিন—আর মুহূর্তে বাঘটা উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ একটা লাফে উধাও হয়ে গেলো বনের মধ্যে। তীব্র একটা বিদ্যুতের মতো বুঝি জ্বলে উঠলো তার শরীর।

তবু সুমিত্রা তেমনি শক্ত হয়েই বসে রইলো।

কে যেন স্পর্শ করলো সুমিত্রাকে। সুমিত্রা চমকে উঠলো। 'কে' বলে চেঁচিয়ে উঠলো ভয়ংকরভাবে। ফিরে তাকালো তারপর।

ফিরেই দেখলো নিখিলকে। নিখিল ঝুঁকে আছে তার দিকে। সুমিত্রা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। দুহাতে শক্ত করে ধরলো তাকেই।

'কি হয়েছে?' ভয়ার্ত গলায় শুধালো নিখিল।

দীপেন নিঃশব্দে ঝুঁকে পড়লো এবার।

সুমিত্রা কোনো কথা বললো না।

'কি হয়েছে?' ফের শুধালো নিখিল। কী আশ্চর্য মমতা নিখিলের কণ্ঠস্বরে। এই অরণ্যে যেন সে আর নিখিল ছাড়া আর কেউ নেই—যেন ভয়ংকরের ছবিটি বিন্দুর মতো হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে কোথায়!

এবারও কিছু বলতে পারলো না সুমিত্রা। ছেড়ে দিলো নিখিলকে। সোজা হয়ে বসলো। সমস্ত শরীর কান্নায়, সুখে থির্ থির্ করে কাঁপছে। তবু নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখলো ভেতরে ভেতরে।

দীপেন কি বুঝে যেন ড্রাইভিং সীটে উঠে এলো। সুমিত্রার সঙ্গে ঘন হয়ে বসলো নিখিল। কেউ আর কিছু বললো না।

হেডলাইট দুটো জ্বলে উঠলো। গাড়ি ফের ছুটতে শুরু করলো বিদ্যুৎবেগে।

দুপাশে সরে যাচ্ছে অরণ্য। সামনের পথ, অরণ্য আবার ঝল্‌মল করে উঠছে আলোয়। সামনের আলোর আভাসে বলিষ্ট দেখাচ্ছে দীপেন আর নিখিলের মুখ।

হাত বাড়িয়ে নিখিলের একটা হাত মুঠোয় নিয়ে ক্রমশ উষ্ণ হতে চেষ্টা করলো সুমিত্রা। অরণ্য ক্রমশ হালকা হয়ে এলো। সামনেই গ্রাম শুরু হয়েছে। ছড়িয়ে পড়ছে গাড়ির হেডলাইটের আলো। সুমিত্রা ফুঁপিয়ে উঠলো আরেকবার।

'কি হয়েছে এবার আমায় বলো?' ফের শুধালো নিখিল। তার কণ্ঠস্বরে অশ্চর্য মমতা সমস্ত ভয়টুকুকে ছাপিয়ে এবার অথৈ হয়ে গেলো।

স্বপ্নের মধ্যে বোধহয় এমনি কোনো সুখের মুহূর্ত প্রার্থনা করেছিলো সুমিত্রা। দারুণ ভয়ের মুহূর্তে গভীর মমতায় তাকে ভাসিয়ে দেবে নিখিল। সুখের আকাশ তখনই ভাস্বর হয়ে উঠবে আলোয়। সে-ই হবে সুমিত্রার সব চাইতে বড়ো পাওয়া।

না, কিছুই বলতে পারলো না সুমিত্রা। অনুভব করলো, অরণ্যে জেগে ওঠা ভয় দুর্লভ সুখের মুহূর্তে পৌঁছে দিয়েছে তাকে। স্পষ্টই সুখের আকাশ আলোয় ভাস্বর হয়ে উঠতে দেখলো সুমিত্রা।

সুমিত্রা এবার নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরলো নিখিলের উষ্ণ হাতখানি।

গোত্রান্তর

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রত্যন্তর নেই আর, হতে হবে জেনো গোত্রান্তর,
যে মুহূর্তে যাযাবর
বেরিয়েছ জীবনের পথে
সে মুহূর্তে প্রতিশ্রুত হয়েছ বৃহতে।
আনন্দে প্রজ্ঞানে প্রেমে হতে চাও আরো আরো বড়ো
কোথাও রয়েছে তবে কোনো বৃহত্তর
প্রতিপদে করেছ স্বীকার—
অনন্তেই অন্তরের প্রশান্তি-বিস্তার।
আঘাতে-ব্যাঘাতে-দ্বন্দ্বে এ জীবন শুধু এক জ্যোতিরুত্তেজনা
সংঘর্ষেই প্রহর্ষ-চেতনা
উন্মীল-উন্মনা।
শুধু করো ত্বরা
আকাশ আশ্বাসভরা
হৃদয়ের আকৃতিরে ক'রে তোলো সাগর-জাগরা।
বাধায় অপরাভূত, অচঞ্চল সমস্ত বিরোধে
ভ'রে থাকো সর্বক্ষণ বৃহতের বেদনার বোধে
উত্তরণে সে-বোধের হবে উদ্‌যাপন
কুরুক্ষেত্র শেষ নয়, তার পরে আছে বৃন্দাবন॥

পরিধি বাড়ে নি মোটে

গোপাল ভৌমিক

পরিধি বাড়ে নি মোটে বেড়েছে বয়েস
প্রতিদিন পেয়ে তাই তারুণ্যের শ্লেষ
বুঝি দিন কাল গেছে, তবু থাকে ক্ষোভ
কেন আজ ভুলে যায় অতীত সৌরভ !

আমি ভাবি উগ্র গন্ধে ভরা বুঝি আজ
ওরা পায় পচা কটু অতীতের ঝাঁঝ।
ভবিষ্যৎ পড়ে থাকে ফাঁকা অসহায়
সেতুবন্ধ বাস্তুকার এখন কোথায় !

পরিধি বাড়ে নি মোটে বেড়েছে বয়েস
বুকে তাই বোধ করি ভয়ানক ক্লেশ
করোনারি থ্রম্বোসিস একেই কি বলে ?
তারুণ্যের অহমিকা দুরূহ অচলে
হাতছানি দিয়ে ডাকে, বোঝে সমরেশ
পরিধি বাড়ে নি মোটে বেড়েছে বয়েস।

বদমাশের মুখোশ

(The mask of Evil—Bertolt Brecht)

অনুবাদ : অমিয়কুমার হাটি

একটি জাপানী মূর্তি ঝুলছে দেয়ালে আমার,
বদমাশ এক দানোর মুখোশ, সোনা-বার্নিশে সজ্জিত যে এ।
সহানুভূতিতে দেখলাম চেয়ে
কপালের ফোলা শিরাগুলি তার—,
বোঝা যায় ওতে,
কতটা কষ্ট লাগে বদমাশ হতে॥

সময় ছিল না তবু

কৃষ্ণ ধর

সময় ছিল না বলে কথাগুলো বুকে ছিল গাঁথা
অথচ নদীও ছিল অন্তরঙ্গ বহমান স্রোত
নিবিড় আকাশে ছিল আরক্তিম গোধূলির ডানা
চেয়েছিল হতে সেও আমারই মতন স্বেচ্ছাচারী।

সময় ছিল না বলে যাই নাই তোমাদের কাছে
নিষিদ্ধ উত্তর দিকে ছিল তবু যাবার বাসনা
ঝড়ের সংকেত ছিল, বিজলীর ঝলসানো পাজামা
আমাকে দেখালো সে অন্য এক ঘরের ঠিকানা।

সময় ছিল না বলে দেখিনি পাহাড়ে বাজ পড়া
অরণ্যের সর্বনাশ, দেখিনি পথের মাঝখানে
আত্মহননে কভু ছিল না আমার কোন স্পৃহা
সময় ছিল না তবু কথাগুলো বুকে আছে গাঁথা॥

কৈশোর থেকে যৌবনে

আইভি রাহা

কৈশোরের দিনগুলো আমার
একেবারে অন্য রকম ছিল ।
শরতের তাপহীন খুসী রোদ্দুর
ধান ক্ষেত, ভরা দিঘি
আকাশের বৃষ্টি ধোয়া মুখ
অনুক্ষণ সুখ-সুখ ;—
চারিদিকে বহমান, আনন্দের সুর ।
ক্যাক ভোরে ছুটে যাওয়া
শিউলির খোঁজে
লাল-সাদা দোপাটি আর
শিউলির ঘ্রাণ
ঘাস ফুলে শিশিরের রূপোলি আলো
পাখিদের অফুরন্ত প্রাণ ।
দাগহীন, দাহহীন মন
ছিল না কো লুকোনো অসুখ
কাউকে দুঃখ না দেওয়া
অপূর্ব নরম
ভোরের শিউলির মত পবিত্র, শুদ্ধ
এক মুখ ।
এখন আর খোঁজ রাখি না কোন
দোপাটি পদ্ম কিংবা শিউলি ফোটার
ওরাও হয়তো বিস্মৃত হয়েছে সব
ভুলেছে আমাকে ;—
বর্তমানে দাঁড়িয়ে দেখি
মুছে গেছে স্মৃতি যত
শৈশবের ব্যস্ত কলরব ।

এতদিন পরে শুধু উন্মনা করে
শিউলি ফোটানো ভোরে
মন্থর বিকেলে
শরতের তাপহীন উজ্জ্বল রোদ
উদাসীন করে মন, ভরন্ত যৌবন
বিষণ্ণ আলোয় দেয়, স্থির নির্বাসন ॥

তুমিই জীবন

শ্যামা দে

তুমি অসীম অনন্ত দুর্বার
তাই নদী হয়ে—
ডেকেছি তোমায় বহুবার।

তুমি কখনও কখনও
স্থবিরের মতো ব্যর্থতার গান গাও,
আমি তাই বৈরাগী সেজে
একতারা হাতে গাই গান
মনের দুয়ারে তোমার।

তুমি রং-এর সাগরে
পাড়ি দিয়ে যাও
ঠিকানা বিহীন—
আমি গোপনে গোপনে
জীবনের রং-এ হতে বলি রঙীন

এই আমি

কামাল উদ্দিন মাহ্‌মুদ

চিত্রকল্প ভালবাসি ইদানিং এই আমি ভালবাসি
ক্ষয় জরা জীবনের ক্রমক্ষীণগতি, অন্যরকম উৎসারণ

শোভন বারান্দা জুড়ে হেঁটে যায় স্বজন-স্বজন, আমি
পতন ভালবাসি। কিঙ্কিনী পতন-শব্দ ভালবাসি
দেহ থেকে জীবনের নিষ্কাষণ ভালবাসি কিশোরীর চুলের গন্ধ
সোঁদা সোঁদা মিষ্টি বাতাস!

সবুজ লতার দেহে বাদামী আঁচর এক পরম বন্ধুর ছোঁয়া
নগ্ন নারী হাসে-গায় সমুদ্রের নোনা সন্নিকটে, ঢেউ আসে
পত্র আসে নোনা নীল রোদ মেখে কর্কশ চাবুক
তুমি কোথায় ঘুমিয়েছিলে কোন সহবাসে ছিলে এতক্ষণ
আমি গতকালও সেই মাতাল ঘোড়াকে দেখে শুধিয়েছি :
কোথায় তুমি?

গীর্জার ঘণ্টা শুনে দৃষ্টিকে ছুড়ে দেই সাগরের মাঝে
সেখানে অনেক নারী, লাল-নীল-গোলাপী শাড়ী এলোচুল
শেষ বিকেলের রোদ সেখানেও তাকিয়ে ত্যাখে তুমি নেই
তুমি নেই—করুণ কাতর সুর তুমি নেই—পলিমাটি পড়ে আছে।

বিচ্ছেদে বিরহ নেই, নেই শোক অশ্রুর শুকনো কণা, ব্যক্তিগত
সংস্কার!

ওখানেও জীবিত আছে অন্যরকম অন্তর্গত রক্তক্ষরণ
এখানে সোহাগ নেই সত্য সহানুভূতি, নেই প্রেম হালকা মমতা
চৌদিকে ক্লেদজ কীট চৌদিকে রুক্ষরোদ হরিৎ হরিৎ আমি
মাছের চোখের মতো মুক্তায় মালা গাঁথি ছিঁড়ে ফেলি
ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেই বন্ধুর
বিদেশী মাদক সুর টুং টাং ছুটে আসে—ভালোবাসি ইদানিং
বত্রিশ বুকের শার্ণ এই আমি কামাল মাহ্‌মুদ।

হ্যাঁ-না

দুর্গাদাস সরকার

নিম্ন মধ্যবিত্ত নিজে বেমানান সৌখিন সমাজে,
তবু তাকে নিতে হয় ভদ্রবেশ,
চাই তার টি. ভি.। প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট।
মগজ বিপন্ন করে দাসখত লিখে দিতে হয়।

হ্যাঁ-কে না, না-কে হ্যাঁ করতে হয়,
দেশ জুড়ে ওলট-পালটে পোষমানা|পাখির মতন
শেখানো বুলিতে তাকে বলতে হয় কথা,
কখনো সে করে না অন্যথা।

চাষী নয়, মজুরও সে নয়।
চাকরিজীবী কি সে? অথথা
অধ্যাপক? জন্মদিনে হয় যদি সভা
তিনি হন প্রধান অতিথি।

এঁরা যদি কবি হন নামী দামী, অথবা লেখক;
সাবধান চতুর পাঠক।

দ্রষ্টার বিবেকে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

বৃন্ত আজ পরিপূর্ণ। বেদনার তিক্ত নীল ফল
গুচ্ছ গুচ্ছ ফলিয়াছে—অবনত উজ্জ্বল মঞ্জরী,
নতুন ভোরের রৌদ্রে সে এখন পল্লবিত কুসুমিত নিবিড় শরীর।
কুয়াশা-শিশির-সূর্য, বহু বৃষ্টি, মেঘের মাদল
বেজেছে চৌদিকে, পায়ে বিকেলের জরী
সাজায়ে গিয়েছে তাকে, ঘন পাতা স্বপ্নে ঝিরঝির।

এ তবে ভালোই হল ; জীবনে অনেক রৌদ্র জানি পলাতক,
সূর্যের সোনালী ছুঁয়ে আমরা শেষে হারিয়ে যাবই ;
মোটামুটি সময়ের হাতে সেই একই বাঁধা ছক।
জীবন যৌবন সব একই অর্থে কী ছলনাময়ী,
অথচ জীবন-তৃষা থেকে যায় মৃত্যুর পরেও।
তাছাড়া কী পাওয়া গেল তার কোনো হিসেব এখানে
পেতে মানা আছে বলে, হৃদয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও
স্মৃতিকে বিস্মৃতি করে হারিয়ে গিয়েছি অন্ধকারে।
প্রকাশ মানেই তার পরিণতি থাকবে বিজ্ঞানে।
পরিচিত অন্ধকারে তবু আজ অন্তিম নির্বেদ।

আমরা সবাই খুশী হয়ে থাকি আত্মপ্রচারে,
অহমিকা ভালোবাসি ; তাই এত পরাজিত খেদ।
তা না হলে অনায়াসে ক্ষমা করা যেত আজ তাকে ;
ভালোবেসে যা দিয়েছে তাই ঢের। সেই সব স্মৃতির দুয়ারে
যদি চ নির্জন ছায়া ; তবু সে তো ভোরের প্রভাকে
বলীয়ান করেছিল। আজ যদি তিক্ত ফল ফলেছে এখানে,
তাতে কি এমন হল ? তারও কিছু রূপ থেকে গেছে !
দ্রষ্টার বিবেকে যদি ভ্যাখো তবে জীবনের অন্য স্বাদ আছে !

আমার অসুখ থেকে সেরে উঠে কিছুদিন জামিনে মুক্তির
মতো ঘুরে ফিরে আসি, তার নাম সুখ
পরোয়ানা নিয়ে আসে পরবর্তী নবীন অসুখ
তার
তেজ ও স্বাস্থ্যের প্রভা চোখ ধাঁধায়
নতুন অসুখ আমি ভালোবাসি
আমার জীবনভোর ভালোবাসা
রোগ থেকে রোগমুক্তি প্রার্থনায়
নিমগ্ন রয়েছে।

একনিষ্ঠ প্রেমিকেরা দ্রুত মরে, আমি বেঁচে আছি
কেননা আমার
ভালোবাসা ছটফটে, ঘন ঘন বদলে যায়—সুখ ও অসুখ
লুকোচুরি খেলে যায় এক জীবন পরম কৌতুক।

বেঁচে আছি

আবদুর রশীদ চৌধুরী

কানে বাজে দুর্বোধ্য চিৎকার
বাঁচাও বাঁচাও……
তবু আমি না শোনার জন্যে
অন্যমনস্কতার ভান করি।

এখানে এ শব্দ নিত্য সঙ্গীই শুধু নয়
চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-ধর্ষণ—
যেন বাঁধা রুটিন এখন
যখন কর্তব্যরা নিয়েছে জরুরী বিদায়
মানবতা চালডালের বস্তার নীচে পড়ে
হারিয়েছে নিজের অস্তিত্ব পুনর্বার।
শান্তি শৃংখলা রক্ষাকারীর ঠিকানা
পায়না ডাক পিওন ………।
তবু কেমন সুন্দর বেঁচে থাকার অভিনয়-
বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলে
ধুঁকে ধুঁকে হলেও……।

নারীকে

কবিতা সিংহ

অবনত হয়ে থাকো চিরদিন এই তোর নিয়তি রমণী
ঝুলে থাকো কিম্বা সতত
পায়ের তলায় যেন মাটি নেই, মাথার উপরে কোনো ছাদ
থাকলেই যথেষ্ট পুরুষের উৎসৃষ্ট প্রসাদ !

সে প্রসাদও সর্বদা মেলেনা নারী ছড়ায় গড়ায় চতুর্দিকে
সে প্রসাদও ধূলায় ধূলায়
ম্লান হয়,—একই মূল্য বার বার দিতে হয়
একই মহাপাপে !

পুরুষ রেখেছে তাই আছো,
এ ভাবে ছায়ার মত নিজের অস্তিত্বে ক্রীতদাসী
জানতে পারো না তুমি কি ভাবে যে চিত্ত চমৎকার
আরাম, অলংকার, নিদ্রা ও মৈথুনে বাঁধা আছো।

সন্ধিপত্র

হেনা হালদার

সমস্ত অত্যাজ্য প্রেম স্মৃতি পরাজিত
সময়ের নির্দেশানুযায়ী
জেনে শুনে বিষপানে কেউ মৃত্যু ঠেকাতে পারে কি ?
যা কিছু সুন্দর সুস্থ স্থায়ী নয়, বর্ণময় মেঘ।
স্বচ্ছতোয়া নদীটাও ক্রমে বালিয়াড়ি।
পল্লবিত সুখগুলি চিরদিন মরণোন্মুখ ······
মুহুর্মুহু ভূমিকম্প আর নৌকোডুবি।

তুমি সব জেনে শুনে তবু এই ইন্দ্রজালে
বিশ্বাস রেখেছ। রুমালকে হাঁস ভেবে
হৃদয় হারাও। শূন্য আতরের শিশি
জেনে শুনে অভ্যাস বশতঃ হাত শোঁকো
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

তার চেয়ে এস একটা সন্ধিপত্র সই
দেওয়া যাক। ক্রুদ্ধ সিংহের মত জীবনের ভয়ঙ্কর
মুখের ভেতর মাথা গলিয়ে উত্তেজনা
আর নয়। বরং ওটাকে চাবুকের ঘায়ে ঘায়ে
অগ্নিবলয়ের মধ্যে দিয়ে
ছুটিয়ে নিয়ে চল। এবং মৃত্যুর ক্ষণে
ওটাকে সঙ্গে নিয়ে যেও।

তোমাকে ঘিরে

রোস্তম আলী মণ্টু

তোমাকে ঘিরে আর কবিতা লেখা হয়ে ওঠে না
যেমন আগে লিখতাম।
তোমার নিটোল চোখ এখন আমার
চোখের তারায়। কথা বলে, হাসে, অথবা
বলে দেয় 'ওগো আর এগিওনা
কবিতার পাহাড় বয়ে।'
তোমার কাজল টানা ভুমর আমার মনকে
ইসারায় নাচায়।
চেয়ে দেখি তাই উষ্ণ মন কোন গহীন মনে
লুকোচুরি খেলে—নেচে বেড়ায়।
আর তেমন কবিতা হয়ে ওঠে না
যেমন আগে লিখতাম।
তোমার নিটোল বেণীতে এক মুঠো বেলীফুলের মালা
সুভাস তোমার সারা তেপান্তর ঘিরে।
আমার মন খেই হারিয়ে ফেলে তোমার সুভাসে,
তাই কবিতা লেখা হয়ে ওঠে না
তোমাকে ঘিরে।

বাইশে শ্রাবণ

নারায়ণ বসু

তবুও তোমার নামে
শব্দ, গীত, বাদ্যে কাঁপে মঞ্চ
তুমি ফিরে আস বোধে, স্মৃতিতে
কখনো বৈশাখে, শ্রাবণে
মৃত হও প্যাণ্ডেলে পোস্টারে
যেন অকস্মাৎ মনে পড়ে যায়
তুমি ছিলে এবং তুমি ছিলে

তুমি কি সেই কবি
প্রজ্ঞায় ঋষি, মননে মনীষি এবং
কবিত্বের ধ্যানে সন্ন্যাসী।
কেন ভেসে যাও রবীন্দ্রসন্ধ্যায় তবে
'আরাধনা' 'অমানুষ'এর স্রোতে ?

অতএব ললিত লেখনী নয়, শক্ত তুলিকায়
হে কবি আর একবার জন্ম নাও আমাদের মাঝে

এবারের শ্রাবণ বাইশে হোক সেই পুণ্য জন্মদিন।

সারা দিনমান মেঘে

সুভাষ পাল

মেঘে মেঘে জাপটে ধরে আছে
সারা দিনমান !
কোনদিকে ফিরে চেয়ে বলো
জ্বালাবো প্রদীপ ঠোঁটে স্মিত সল্‌তে ?
ব্যর্থ তুমি খুঁজে ফের
নষ্ট জীবন পাত্রে
নির্ভেজাল আনন্দ কুসুম !

এখন সময় বড়ো
রুক্ষকেশী মাতাল পথিক
প্রচণ্ড ঘূর্ণির সাথে করে কোলাকুলি
হিংস্র নখর ত্যাখো
ছিঁড়ে নিতে চায়
প্রস্ফুটিত নিষ্পাপ গোলাপ

রঙ্গমঞ্চে নায়ক

সুচেতা মিত্র

খরতাপে দগ্ধ নও, বিষণ্ণ প্রদীপে ম্লান নও তুমি।
সুখী জীবনের সম্ভাবনা রেখেছ সরিয়ে
তোমার সহ্যের সীমা।
দীর্ঘ পরাভব তবু নয় ভ্রম,
বঞ্চনাও নয়।

মন্ত্র দীক্ষা তোমারই বিশিষ্ট গুণ ;
প্রশ্রয়ে ধৃষ্টতা নয়, গৌরবে দীনতা
রহস্যের কুলুঙ্গি তো উন্মোচিত নয়
কোথায় গোপন চাবি ?
লুকিয়ে রয়েছে বরাভয়।

মধ্যাহ্নের অবক্ষয়ে সকালী ফুলের মৃত্যু
তোমাকে ছোঁবে না। রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যমান
তুমি পরাভব থেকে উঠে আস রোজ
হে নায়ক, রঙ্গমঞ্চে একাগ্রতা তোমার স্বরূপ।

আমার সম্রাজ্ঞী

নয়ন কুমার রায়

কল্পনা, আমার সম্রাজ্ঞী সেজে তোমার সিংহাসনে বসো।
প্রজা শাসনের বহু যুগ সঞ্চিত দুরূহ অভিজ্ঞতায়।
আমি তোমার শাসিত প্রজার যোগ্য অধিকারে
শান্তির নীড় রচনা করতে চাই তোমার রাজ্যের সমস্ত প্রান্তে।
আমি বাঁচতে চাই বাঁচার মতো কাঞ্চন জংঘার গৌরবে।
নিষ্পাপ জীবন হবে গোলাপ ফোটা সুন্দর
পবিত্রতার অমৃত পান, দীর্ঘায়ু জীবন লাভ।
এটাই আমার কামনা! মাথা তোলা হিমালয়।
আমি বাঁচতে চাই বাঁচার মতো কাঞ্চন জংঘার গৌরবে।

পেছনপানে তাকিয়ে

অনুপ ঘোষাল

ফেলে আসা দিনগুলির ঘটনাসমূহ সাজিয়ে গুছিয়ে লিপিবদ্ধ করার নামই হল ইতিহাস রচনা। আমার ফেলে আসা জীবনের নানা রঙের দিনগুলি থেকে বলতে গেলেও আমার সেই জীবন ইতিহাসের কয়েকটি পাতা থেকেই কিছু বলতে হবে।

আমার সংগে আপনাদের প্রথম পরিচয় (অর্থাৎ শ্রোতাদের) পৃথিবী বিখ্যাত পরিচালক শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায়ের বিশ্ববিখ্যাত ছায়াছবি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'এর মাধ্যমে। এই ছবির বিখ্যাত গানগুলির মধ্য দিয়েই আমি শ্রোতাদের সংগে একাত্ম হয়ে উঠি। ১৯৬৯ সনের পঁচিশে বৈশাখ এই ছবি Release করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সময় আমি দিল্লীতে আমার জাতীয় স্কলারশিপের বাৎসরিক পরীক্ষা দিয়ে আমেদাবাদে গিয়েছিলাম আমার দিদি গীতা সেনগুপ্তার কাছে। অনেক স্বপ্ন এবং আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে এবং ছন্দে মন বিক্ষিপ্ত নানা চিন্তায় অস্থির হয়েছিল। সেদিন (২৫শে বৈশাখ) আমেদাবাদে 'Bengal Culture Association'-এর হলে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে গান গাইছিলাম। কিন্তু আমার মন পড়েছিল কলকাতার ইট-কাঠ-পাথরে তৈরী শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আমার গান আপনাদের কাছে কেমন লাগবে সে বিষয়ে নিশ্চিত না থাকলেও সত্যজিৎবাবুর এ ছবি যে Super Hit করবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম। এর প্রমাণ আমার এক বন্ধুর কাছে আমেদাবাদ থেকে লেখা আমার একটি চিঠির মধ্যে। বন্ধুর নাম প্রবাল সেনগুপ্ত—বর্তমানে গ্রামোফোন কম্পানীর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান Phonographic Performance Concern-এর সংগে যুক্ত। প্রবালকে আমি লিখেছিলাম: 'যদিও আমার গান লোকের কেমন লাগবে জানিনা—তবুও একথা ঠিক এ ছবি যদি Hit না করে তাহ'লে মনে করব বাংলা দেশের (পশ্চিমবংগ—কারণ তখনও বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়নি)

বারোটা বেজে গেছে। আমি খুব আশাবাদী, তাই মনে করি যে বাংলার মানুষের মানসিকতার ঠিক অতটা Down Swing হয়েছে।"

আজ দেখুন ঐ চিঠিখানাই একটি ইতিহাস বা ঐতিহাসিক উপকরণ। তাই না?

গুপী গাইনের আমার গাওয়া গানগুলো (দেখরে নয়ন মেলে, ভূতের রাজা দিল বর, ও মন্ত্রীমশাই, মহারাজা তোমারে সেলাম, ওরে বাঘারে, ওরে বাবা দেখ চেয়ে কত সেনা) অসাধারণ জনপ্রিয় হয়। এমনকি পাঁচ/ছয় বছর হ'য়ে গেলেও আজও বিভিন্ন বিচিত্রানুষ্ঠানে ঐ গানের ২।১টি আমাকে গাইতে হয়। তা না হ'লে আপনারা (অর্থাৎ আমার শ্রোতাগণ) আমার ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে যান—তাই না?

গুপী গাইনের রেকর্ড'গুলোও অসম্ভব বিক্রী হয়। আপনাদের কাছে এখানে একটি কথা বললে নিশ্চয়ই অপ্রাসংগিক হবে না ঐ ছবির গানের সিঙ্গলস্ এবং এক্সটেনডেট প্লে রেকর্ডে'র সংগে ছবির বিভিন্ন গান এর আবহ সংগীত সহ একটি অতি মনোরম লং প্লেইং রেকর্ড' প্রকাশিত হয় গ্রামাফোন কম্পানী থেকে। আর গুপী গাইনের লং প্লেইং রেকর্ড'খানিই হ'ল বাংলা ছায়াছবির সর্বপ্রথম লং প্লেইং রেকর্ড'। গুপী গাইন ছবির গানের রেকর্ডে'র চাহিদা আজও বিদ্যমান।

গ্রামাফোন কম্পানীর সংগে আমার প্রথম যোগাযোগ ১৯৬৬ সালে। ঐ বছর বিখ্যাত গায়ক সন্তোষ সেনগুপ্ত (গ্রামাফোন কম্পানীর তৎকালীন প্রডিউসার) মহাশয়ের প্রযোজনায় 'বর্ষামঙ্গল' লং প্লেইং রেকর্ড হয়। সন্তোষদা আমাকে দিয়ে ঐ লং প্লেইং রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান—'কোথা যে উধাও হ'ল মোর প্রাণ উদাসী'—গানটি গাইবার সুযোগ দেন। এ ছাড়া ১৯৬৯ সনে নজরুল জন্মজয়ন্তীতে আমার সর্বপ্রথম Basic disk প্রকাশিত হয় (রেকর্ড' নম্বর 45N 83362)। দু'খানা গানই শ্রোতাদের ভাল লেগেছিল এবং গান দুটি খুব জনপ্রিয় হয়। গান দুটি নিশ্চয়ই আপনাদের জানা—ক) করুণ কেন অরুণ আঁখি, খ) মা মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়। এরপর ১৯৭০-এ শারদীয়া বন্দনায় আমার প্রথম আধুনিক গান প্রকাশিত হয়। রেকর্ড' নম্বর 45N 83382। গান দুটি আপনাদের কাছে খুব ভাল লেগেছিল। আজও গানদুটি অসাধারণ জনপ্রিয়। গানদুটির প্রথম লাইনেই আপনাদের গানদুটির

অনুপম সুর তাল ও ছন্দ এবং কথা মনে পড়ে যাবে। ক) আর তো [illegible] বাইরে। খ) মনদী বিবের কাঁটা।

গানদুটিতে সুরারোপ করেছিলেন বিখ্যাত সুরকার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুধীন দাশগুপ্ত মশাই। প্রথম গানটির কথা লেখেন সুধীনদা নিজেই আর দ্বিতীয় গানটি লেখেন সুনীল বরণ।

১৯৭০ থেকে নিয়মিত প্রত্যেক বছরই আমার কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম দিনে একখানা নজরুল গীতির রেকর্ড এবং শারদীয়া পূজায় একখানা আধুনিক গানের রেকর্ড প্রকাশিত হচ্ছে। ভগবানের আশীর্বাদে আপনাদের শুভেচ্ছায় প্রত্যেক বছরই ঐ রেকর্ড সংগীতের কোন না কোন গান আপনাদের ভাল লাগছে। আমার গাওয়া গ্রামাফোন কম্পানী থেকে প্রকাশিত Basic disk এর কয়েকটি জনপ্রিয় গানের লাইন এখানে তুলে দিলাম—আধুনিক গান :

১। এমনি চিরদিন তো কভু যায় না / হায় ফাগুণ দিন। সুর ও কথা—সলিল চৌধুরী ২। বনলতা সেন/হায় চিল। কথা—জীবনানন্দ দাস। সুর—আমি নিজেই দিয়েছি। ৩। শুকনো শাখার পাতা, ঝরে যায়। সুর অনুপম ঘটক। কথা—হীবেন বসু। ৪। জীবনে যাবে তুমি দাওনি মালা। কথা—প্রণব রায়। সুর—শৈলেশ দত্তগুপ্ত। ৫। এ শুধু একই কথা/সংগিনী তোর সুন্দরী মন। সুর—রঞ্জু সেন। কথা—পুলক ব্যানার্জী ও বরুণ বিশ্বাস। নজরুলগীতি : ১। ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির সুরভি—/আজি নন্দ দুলালের সাথে। ২। চোখের নেশার ভালবাসা/এ আঁখি জল মোছ পিয়া/নন্দন বন হ'তে কে গো/দিতে এলে ফুল। ৩। অঞ্জলি লহ মোর সংগীতে/কত রাতি পোহায়/বসিয়া বিজনে কেন একামনে/সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি। ৪। মেঘে মেঘে অন্ধ অসীম আকাশ/তোমারি আঁখির মত আকাশের দুটি তারা/ম্লান আলোকে ফুটলি কেন/মাধবীলতার আজি/আমার ঘরের মলিন দীপালোকে/ছাড় ছাড় আঁচল বধু।

এ হ'ল গত বছর পর্যন্ত হিসেব। এ বছর নজরুল জন্মজয়ন্তীতে একটি চারখানা গানের EP রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে। ঐ রেকর্ডের (7EPE 3089) চারখানা গানই আপনাদের কাছে মনে হয় ভাল লাগবে। গানের প্রথম লাইন গুলো হ'ল : চাঁদ হেরিছে চাঁদমুখ তার/শ্মশানে জাগিছে শ্যামা/আনমনে জল নিতে/আমি চিরতরে দূরে চলে যাব।

এ বছর শারদীয়া বন্দনায় আমার চারখানা গানের একখানা EP রেকর্ড

প্রকাশিত হয়। ঐ চারখানা গানের একটি গান বহু পুরানো। কিন্তু আজও গানটি সমান জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তার কারণ ঐ গানের অনবদ্য কাব্য সৌন্দর্য এবং সুর ব্যঞ্জনা। ঐ গানটি ১৯৭০ সনে গ্রামাফোন কম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত 'Down Memory Lane'—নামক লং প্লেইং রেকর্ডে আমি গেয়েছিলাম। গানটি আপনাদের কাছে খুব ভাল লাগবে। ২৫/৩০ বছরের পুরানো বাংলা গান আবার এই যুগেই শ্রোতাদের কাছে অসাধারণ জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে। ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে অনেক শ্রোতা এই গানটির একটি SP (single) রেকর্ড করতে বলেন। তাই আপনাদের অনুরোধ এবং চাহিদার দিকে তাকিয়ে এই বছরের পূজার চারখানি গানের মধ্যে ঐ গানটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছি! এবং বলাবাহুল্য নতুন করে গেয়েছি। কারণ একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন ১৯৭০ সনের চেয়ে আজ ১৯৭৫-এর শেষাশেষির অনুপ ঘোষাল অনেক বেশী Matured এবং Romantic। গানটির অসাধারণ বিরহ মেশানো প্রেমের কথা এবং সুর আমার মনে হয় এইবারের রেকর্ডে অনেক সুন্দর এবং সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। তবে জানি একথার সঠিক উত্তর দেবেন আপনারাই। আপনাদের কাছেই এই কথার সত্যতা বিচারের দায়িত্ব দিলাম।

এই গানের সুরকার শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত অনেক দিন আগেই গত হয়েছেন, আর গীতিকার আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রণব রায় কিছুদিন হল আমাদের ছেড়ে অমৃত-লোকের পথে যাত্রা করেছেন। তাঁকে হারিয়ে বাংলার জনসাধারণ একজন যথার্থ গুণী এবং বিদগ্ধ গীতিকার কবি এবং সাহিত্যিককে হারালেন। প্রণবদা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খুব স্নেহ করতেন। মাঝে মাঝেই বাংলার কাব্য সংগীতের ব্যাপারে কোন অসুবিধায় পড়লে তাঁর কাছে যেতাম এবং নানা আলোচনার মাধ্যমে নিজের সমস্যার সমাধান করতাম। প্রণবদাকে হারিয়ে আজ আমি সত্যি নিজেকে অনায়াসে একজন ভাগ্যহীনের দলে ফেলে দিতে পারি। এছাড়া বাকি তিনখানা গানের একখানায় আমার নিজের সুর। গানটি হল—আরও কিছুক্ষণ ও মাধবী বুকেতে আমায় বেঁধে রাখ। গানটি লিখেছেন কামাক্ষা ঘোষ। আর দুখানা গান লিখেছেন পুলক ব্যানার্জী (ক) বললেই কি মন দেওয়া যায় (খ) কে তুমি ভিনদেশী ঝরণা। গান দুটিতে সুরারোপ করেছেন রঞ্জু সেন। আমার বিশ্বাস এবারকার পূজার চারখানা গানের সংকলনটি আপনাদের কাছে ভাল লাগবে।

আসুন গ্রামাফোনের Basic-disk এর কথা ছেড়ে আবার ফিল্মের ব্যাপারে

ফিরে আসি। গুপী গাইনে গান করার পরই ঐ ছবি Release করার আগেই বিখ্যাত পরিচালক তপন সিংহ মশাইয়ের সাগীনা মাহাতো ছবিতে আমি গাইবার সুযোগ পাই। তাও ১৯৬৯ সনের কথা। তপনদার সংগে দেখা করতে যাই নিউ থিয়েটার্স ডু নম্বরে। প্রথম দিনই তপনদার ভদ্র ও বিনয়ী ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলাম, যেন নিমেষের মধ্যে আমাকে কাছে টেনে নিলেন। কাজ ভাল করার জন্য যেমন সত্যজিৎবাবুর মধ্যে নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা দেখেছিলাম গুপী গাইনের সংগীত গ্রহণের সময় তেমনি আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখলাম তপনদার মধ্যে। সত্যজিৎবাবু খুব ভাল পিয়ানো বাজাতে পারেন। গুপী গাইনের গান উনি আমাকে শিখিয়েছিলেন পিয়ানো দিয়ে। অপূর্ব গান গাইবার ভংগী সত্যজিৎবাবুর। সাগীনা মাহাতোর রিহারসালে তপনদা গান শেখাতেন হারমোনিয়াম দিয়ে। খুব ভাল গলা তপনদার। আর গানের ষ্টাইল বেশ সুন্দর। আমার বেশ মনে আছে তপনদার কাছে যখন দ্বিতীয় দিন গেলাম তখন সেখানে রিহারসালে গীতিকার শ্যামল গুপ্ত মশাই এলেন। উনি আপনাদের সকলের প্রিয় 'ছোটিসী পঞ্ছি ছোট্ট ঠোটেরে' গানটি লিখেছিলেন। রিহারসালে হেমেন গাঙ্গুলী (প্রডিউসার) মশাই উপস্থিত থাকতেন। ঐ একটি গান আমাকে এবং আরতি মুখার্জীকে নিয়ে প্রায় ৪।৫ দিন রিহারসাল হয়েছিল। তাই গানটি সব দিক দিয়েই আমার মনে হয় এত সুন্দর হয়েছিল। সাগীনা মাহাতোতে দিলীপ কুমারের মুখে আমার গান আমার জনপ্রিয়তা আরও রাতারাতি বাড়িয়ে দেয়। এই গানের রেকর্ড'ও অসম্ভব হিট করে। এই ছবির গানের জন্য আমি BFJA-এর শ্রেষ্ঠ পুরুষ কণ্ঠ শিল্পীর সম্মান পেয়েছিলাম ১৯৭২-এ। ঐ সংস্থারপুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে (রবীন্দ্রসদনে) আমি ঐ গানটি গেয়েছিলাম। গানটি সংবাদ বিচিত্রা থেকে পরে রীলে ক'রে শোনান হয়। সেদিন আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। আর আমার মনে হ'য়ে ছিল এটা আমার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নয়—সবই ভগবানের, সংগীতগুরু এবং বাবা-মা ও গুরুজনদের আশীর্ব্বাদ এবং আমার অগণিত শ্রোতা ও বন্ধুদের শুভেচ্ছা এবং ভালবাসারই ফলপ্রাপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়। ছায়াছবিতে এর পরই আমি স্বদেশ সরকার পরিচালিত 'শাস্তি' ছবিতে একটি গান গাইবার সুযোগ পাই। স্বদেশদা আমাকে খুব স্নেহ করেন। গানটি খুব হিট করে, 'সাধ কইরে পুষিলামরে আদরের ময়না'। ছবিটির গান লিখেছিলেন প্রণব রায় এবং

সুরকার হলেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। এর মধ্যে আরেকটি ছবিতে একটি হিন্দী ভজন গেয়েছিলাম। ছবির নাম 'মৃগয়া'। ছবিটির সংগীত এবং পরিচালনা অরুন্ধতী দেবীর। গানটি হ'ল .সুরদাসের একটি ভজন 'আঁখিয়া হরি দরশন কি পিয়াসী'। খুব ভাল হয়েছিল ছবিটির গান। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছবিটি খানিকটা আরম্ভের পর কোন কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এ ছবিটির এই গানটির কথা মনে হ'লে আমার সেদিনকার একটি সুন্দর ঘটনা মনে পড়ে যায়। মৃগয়ার গান রেকর্ডিং-এ চিত্রজগতের অনেক বিখ্যাত গুণী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ছবির ক্ল্যাপ্‌ স্টিক দিয়েছিলেন চিত্র পরিচালক অজয় কর মশাই। সেদিনের এক জনের কথা আমার বিশেষ ক'রে মনে হচ্ছে। তিনি আপনাদের সকলের কাছেই পরিচিত এবং অতি প্রিয় শিল্পী আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় পাহাড়ী সান্যাল মশাই। পাহাড়ীদা গান টেকিং এর সময় আমার গলা শুনে বললেন—'বাঃ! বাঃ! ছেলেটির গলাটিতো বড় চমৎকার।' —পাহাড়ীদা গুটি গুটি পায়ে আমার সামনে এসে পিঠে হাত দিয়ে বল্লেন—'বড ভাল লাগলো রে তোর গান। তুই কার কাছে গান শিখিসরে?' আমি বল্লাম, সুখেন্দু গোস্বামীর কাছে। বল্লেন, 'বাঃ! খুব ভাল গুরু পেয়েছিস্‌। তুই প'রিশ্রম কর একদিন তুই খুব বড হবি রে।' সেদিন পাহাড়ীদার মধ্যে যে আন্তরিকতা পেয়েছিলাম তাতে আমার চোখে জল এসেছিল। তারপর থেকে পাহাড়ীদার সংগে ভীষণ 'My dear' সম্পর্ক হয়ে যায়। আপনারা যাঁরা পাহাড়ীদাকে চিনতেন তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন ওরকম দিলখোলা হাসিখুশী উদার উদাত্ত মনের মানুষ আজকের দিনে পাওয়া খুব শক্ত। কোন সংগীত আসরে পাহাড়ীদা উপস্থিত না থাকলে যেন তা খুব নিরিমিশ বা নিস্তেজ বলে মনে হ'ত। পাহাড়ীদা কোন অনুষ্ঠানে যেন একাই ছিলেন একশো। তিনি গায়কের গানের সুন্দর সুন্দর অংশের তারিফ করে একাই আসর মাতিয়ে রাখতেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও তিনি আমার নজরুল ইসলামের গানের একক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। গানের মাঝখানে এবং গানের শেষে সর্বপ্রথম একটা সার্বিক প্রশংসা করতেন— তারপর যেখানে যেখানে বকুনি দেবার সেটাও দিতেন একদম আপনজনের মত। পাহাড়ীদাকে কোন দিন ভুলতে পারব না। বিভূতি লাহা পরিচালিত 'ছদ্মবেশীতে' আমার একখানা গান ছিল। গানটি হ'ল 'ক্যায়া সুন্দর ক্যায়া রাত বরকা ঝড়কি ভাগে তেরাইতার কি সাথ'। গানটি পুরোনো

ছদ্মবেশী ছবিতেও ছিল। গানটি গেয়েছিলেন বিখ্যাত শিল্পী [illegible]। তখনকার ছদ্মবেশী ছবির সুরকার ছিলেন শচীন দেব বর্মন। আর বর্তমান ছদ্মবেশী ছবির সুরকার হলেন সুধীন দাশগুপ্ত। আমার গাওয়া গানটি খুব হিট করে।

এছাড়া অরবিন্দ মুখার্জির 'নায়িকার ভূমিকায়' ছবির 'এক যে আছে কন্যা' গানটিও আমার একটি খুব সুন্দর গান। গানটি সুপার হিট। রচয়িতা প্রণব রায় এবং সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। স্বদেশ সরকার পরিচালিত এবং অভিজিৎ সুরারোপিত 'হারায়ে খুঁজি' ছবির গানটিও কম যায় কিসে? গানটি একটু ক্ল্যাসিকেল ধরণের। কথা ও সুর খুব মিষ্টি। গানের কথা লিখেছেন পুলক ব্যানার্জী। বহুলোক এই গানটির জন্য আমাকে প্রশংসা করেছেন। তরুণ মজুমদারের জনপ্রিয় ছায়াছবি 'ফুলেশ্বরী'তে আমার গাওয়া 'হাদেগো পদ্মরানী' গানটি খুব জনপ্রিয়। গানটি রেকর্ডের সময় ঐ ছায়াছবির সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মশাই আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। শিল্পীকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে হেমন্তদার তুলনা পাওয়া খুবই কঠিন। তিনি নিজেও বিরাট একজন শিল্পী। তাই তিনি নিজেও বোঝেন যে স্বাধীনতা ছাড়া কোন শিল্পী কখনও ভাল গাইতে পারেন না। ছবিতে গানটির situation-ও ছিল সুন্দর। ফুলেশ্বরীর গানটির জন্য আমি এই বছর বাংলা চলচ্চিত্র পুরস্কার সমিতির পক্ষ থেকে এ বছরের শ্রেষ্ঠ নেপথ্যসংগীত শিল্পীর পুরস্কার পাই। ১৯৭৪ সনের প্রথম দিকে আমার সংগীত-জীবনে একটি নতুন দিকের সূচনা হয়। ঐ সময় তপনদা (তপন সিংহ) আমাকে একদিন বললেন, 'অনুপ উর্দু শিখতে আরম্ভ কর। কারণ আমার পরবর্তী ছবি 'রাজা'তে তোমার দুখানা গজল গাইতে হবে। উর্দু ভাষা ঠিক মত উচ্চারণ করতে না পারলে গজলের কোন আকর্ষণ নেই।' তপনদার কথা মত আমি আমাদের Industry-র পরিচিত মাষ্টারজীর (অমানুল হক, ৩৫/বি, আনোর শা রোড) কাছে নিয়মিত উর্দু শিখতে আরম্ভ করি এবং আজও শিখছি। এই উর্দু গজলের মধ্যে আমি নতুন এক দারুণ Romance সৌন্দর্য এবং রস পেলাম। রাতারাতি গজল গানের প্রেমে পড়ে গেলাম। কে শাহিদ খাঁর কাছে গজল শিখতে আরম্ভ করলাম।

উর্দু এবং গজল শেখার ব্যাপারে আমার দুজন মাষ্টারই অনবদ্য। আমাকে দারুণ ভালবাসেন। মাষ্টারজী আমাকে আদর করে বলেন 'হিরো'।

'রাজা'র সংগীত গ্রহণের আগে বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা প্রায় ছ মাস অমানুসিক পরিশ্রম করেছিলাম। এই ব্যাপারে তপনদা খুব প্রেরণা দিয়েছিলেন।

এই ছবির দুখানা গান 'যসবে দিল খসবে বাক্‌া' এবং 'যো কমসিন মা উসপর' শ্রোতাদের ভাল লেগেছে। খুব পরিশ্রম এবং যত্নের সঙ্গে চেষ্টা করে [বড়ি 'খ'], [বড়ি 'কাফ'], এ্যান, এগ্যাম ইত্যাদির উচ্চারণ করতে পেরেছিলাম এবং বলাবাহুল্য এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে উর্দু গানের উচ্চারণের ব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক গুপী গাইনের সময় বাংলা গানের উচ্চারণের ব্যাপারে সত্যজিৎ রায় মশাই আমাকে বাংলা উচ্চারণের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'দেখ হে! বাংলা কথার উচ্চারণ বাংলা গানে যদি ঠিকমত না হয়, তবে এ গানের বাঙালী শ্রোতার কাছে কোন মূল্যই থাকে না। কারণ বাংলা ভাষা-প্রধান গান।' ওনার 'schooling' যে আমার জীবনে কতটা কাযকরী হয়েছিল তা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করি। এ কথা বললে নিশ্চয়ই খুব বাড়িয়ে বলা হবে না— আমার গানের কথার উচ্চারণ খুব স্পষ্ট এ কথা সবাই বলেন। এবং এ ব্যাপারে আমি সত্যজিৎবাবু এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী বিজয়া রায়ের কাছে ঋণী। এ প্রসংগে আপনাদের কাছে একটি হাস্যরসাত্মক (হাসির) গল্পের অবতারণা করছি। আমি পূর্ববংগের ছেলে। (অধুনা বাংলাদেশ) অর্থাৎ এক কথায় বাঙাল। আপনারা জানেন কিনা জানিনা, আমাদের 'ড' উচ্চারণ এ দেশীয় (পশ্চিমবঙ্গ) লোকের মত হয় না। আমাদের সব সময়ই 'র' উচ্চারণ হয়। এ ব্যাপারে সন্টু মাসিমা (বিজয়া রায়) আমাকে দিনের পর দিন সাহায্য করেছেন এবং উচ্চারণ ঠিক করিয়েছেন। এঁদের আন্তরিকতা এবং ভালবাসা আমি কোনদিনও ভুলতে পারবো না।

আপনারা আগামী যে ছায়াছবিতে আমার গান শুনতে পাবেন সেগুলো হ'ল—'অসময়ে' (ইন্দর সেন) অর্জুন (ইন্দর সেন) 'মোহনবাগানের মেয়ে' (মানু সেন) -হারমোনিয়াম (তপন সিংহ), জটায়ু, স্পর্শপরশ ইত্যাদি আরও কয়েকটি ছায়াছবিতে।

এই হল মোটামুটি আমার শিল্পী জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত হিসেব নিকেশ। যা আমার জীবনখাতা থেকে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এর মধ্যে বিভিন্ন বিচিত্রানুষ্ঠানে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে—এমনকি বিদেশে

পূর্ব জার্মানীর বারলিন শহরেও গান করতে গিয়েছি। এই গান করার সুবাদেও নানা বিচিত্র রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে, যা আমার জীবনের অমূল্যধন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গান করতে গিয়ে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে পেয়েছি বুকভরা আদর ও ভালবাসা। দুঃখও পেয়েছি! কিন্তু আনন্দের বা সুখের কাছে দাড়িপাল্লায় তার ওজন এত কম যে সেই দুঃখ মনেও থাকে না সব সময়। তবে সময় সময় এই দুঃখ যখন বেশী করে বুকে বাজে তখন খুব কষ্ট হয় কিন্তু ভাবি এটাও নিশ্চয়ই আমার জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী—যিনি সর্বনিয়ন্তা—সকল সুখ দুঃখের সর্বময়কর্তা তিনি দুঃখ দিয়ে বাজিয়ে দেখে নেবেন না! মনকে মজবুত ক'রে নেবেন না! যাতে সুখের সময় ঐ স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে শুধু আনন্দ উপভোগ না করি। আমার তাই মনে হয় জীবনে সুখের যেমন প্রয়োজন তেমন সমভাবে দুঃখেরও প্রয়োজনীয়তা আছে বই কি?—কারণ দুঃখ না পেলে সুখকে সঠিকভাবে চেনা যায় না।

গ্রামাফোন এবং ফিল্মের সংগে আকাশবাণীতেও নিয়মিত অনুষ্ঠান করে যাচ্ছি। রেডিও-র সংগে আমার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। আমি যখন বছর পাঁচেকের শিশু তখন থেকে আমি এবং আমার ছোড়দি নমিতা ঘোষাল (রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী) শিশু মহল-এ নিয়মিত অনুষ্ঠান করতাম। অনুষ্ঠান পরিচালিকা ছিলেন ইন্দিরাদি। উনি আমাকে এবং আমার দিদিকে খুব স্নেহ করতেন এবং আজও করেন। আজও এভার গ্রীন সেই ইন্দিরাদি শিশুমহলের পরিচালিকা আছেন। শিশুমহলের পর আমরা গল্প দাদুর আসরে গান গাইতাম। তখন জয়ন্তদা (জয়ন্ত চৌধুরী) ছিলেন ঐ আসরের পরিচালক। তারপর বড় হয়ে ১৯৬৭ থেকে আবার সাধারণ ভাবে রেডিওর আসরে (General Secton) গাইতে আরম্ভ করি। সাধারণতঃ রেডিও-তে আমি আধুনিক বাংলা গান, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসংগীত এবং লোকসংগীত অনুষ্ঠান করে থাকি। বর্তমানে আকাশবাণী কলকাতার আমি একজন প্রথম সারির শিল্পী। রেডিওর সংগে সংগে অধুনা পশ্চিম বাঙলায় টেলিভিশন সার্ভিস চালু হ'য়ে গেছে। আমি টেলিভিশনেও একটি পনের মিনিটের অনুষ্ঠান করেছি। আমার অনুষ্ঠানটি নাকি খুব উপভোগ্য হয়েছিল—এমন কথা আমাকে বহুলোক বলেছেন। অনেক অনুরাগী শ্রোতা আমাকে টেলিফোনের মাধ্যমে Congratulate-ও করেছেন।

রেডিও, টেলিভিশন, ফিল্ম এবং গ্রামাফোনের ডিস্কের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত বেশ কিছু গান গেয়েছি। যদি আমাকে জিজ্ঞাস করেন—'অনুপবাবু আপনি কোন্ গান গেয়ে সবচেয়ে বেশী ভাল গেয়েছেন?'—এর উত্তরে আমি বলব—'দাদা! আজ পর্যন্ত কোন গান গানই আমার আশা অনুযায়ী গাইতে পারলাম না।' সত্যি এটা বিনয় নয়। এটা আমার মনের কথা। অনেকেই বলেন এই অতৃপ্তির বেদনাই নাকি শিল্পীর সারাজীবনের সবচেয়ে বড় কথা। এঁরা বলেন এই অতৃপ্তির বেদনা যতদিন শিল্পীর মধ্যে থাকবে ততদিনই শিল্পীর শিল্পের সার্থক সৃষ্টি এবং তার যথাযথ রূপায়ণের জন্য তাঁর মধ্যে একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকবে। এই 'Urge'ই হ'ল শিল্পীর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। এই প্রসংগে একটি ঘটনার কথা এখানে বললে তা নিশ্চয়ই খুব অপ্রাসংগিক হবে না। গুপী গাইনের সংগীত গ্রহণের পর (১৯৭১ সনে তখন আমার বয়স বছর কুড়ি ছিল) সত্যজিৎবাবু খুব প্রশংসা করলেন। 'বা! অনুপ খুব ভাল গান হয়েছে। উপস্থিত সবাই আমাকে Thanks দিলেন। কিন্তু, বিশ্বাস করুন আমি কিন্তু খুশী হইনি। আমার মুখ দেখে সত্যজিৎবাবু তাঁর অসাধারণ শিল্পী মন দিয়ে সব বুঝতে পারলেন, বিরাট দিল খোলা হাসি দিয়ে বললেন—'আরে মুখ গোমরা ক'রে আছ কেন?—কী হ'ল?' আমাকে উনি বললেন—'তোমার নিজের গান কেমন লাগছে?' আমি বললাম—'আরেকটু যেন ভাল হলে ভাল হোত।'—উনি হেসে বললেন—'বা! এই তো প্রকৃত শিল্পীর কথা। যতদিন এই ভাব থাকবে মনের মধ্যে ততদিন বড় হ'তে পারবে। কারণ এই অতৃপ্তিই হ'ল শিল্পীর জীবনের শিল্প সৃষ্টি এবং সৃজনি প্রতিভার উত্তরোত্তর বিকাশের সবচেয়ে বড় জিনিস।' তাঁর ঐ কথা আজও আমি ভুলিনি। শিল্প সৃষ্টির ব্যাপারে বা শিল্পীর প্রকৃত মানসিকতার পরিপূর্ণ বিকাশের পথে যেমন ঐ অতৃপ্তির বেদনা থাকা উচিৎ, তেমনি আমি মনে করি আরও কয়েকটি জিনিস থাকা উচিৎ। তাহল শিক্ষা, সাধনা, নিষ্ঠা, পরিমিতিবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, অধ্যবসায় এবং প্রেরণা। সব শেষ কথাটি বাদে বাকি সব কটি গুণই শিল্পীর ব্যক্তিগত গুণাবলীর মধ্যে পড়ে, যদিও উপযুক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সংগে সংগীতের ক্ষেত্রে সংগীতগুরুর গুণাবলী ব্যক্তিত্ব এবং পাণ্ডিত্য শিল্পীকে অনেকটা সাহায্য করতে পারে। এই ব্যাপারে আমি ভাগ্যবান। আমার সংগীত গুরুর নাম শ্রীযুক্ত সুখেন্দু গোস্বামী। উনি অত্যন্ত বিনয়ী, শিক্ষিত এবং সংগীত বিদ্যায় পারদর্শী একজন সংগীত শিল্পী।

আমি খুব ছোট বয়সে (চার বছর) আমার বড়দি গীতা [illegible] কাছে সংগীত শিক্ষা আরম্ভ করি। উনি দীর্ঘদিন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষা করেন। ওনার গানের গলা অপূর্ব। কয়েক বছর ওনার কাছে সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করি এবং হারমোনিয়াম বাজনাও শিখি। তারপর ৭/৮ বছর বয়সে আমি সুখেন্দুবাবুর কাছে যাই। দীর্ঘদিন ধরে আমি ওনার কাছে উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষা করেছি। এবং আজও আমি ওনার শিষ্য। সংগীত শিক্ষার সময় যখন বিভিন্ন পরীক্ষা আসতো যেমন স্কুল ফাইন্যাল, প্রি ইউ, বি এ এবং এম. এ তখন মাষ্টারমশাইর কাছে কিছুদিন কামাই হোত। এতে মন ভীষণ খারাপ লাগত তখন। সংগীতের এমনই হাতছানি। উচ্চাংগ সংগীতের সংগে সংগে বাংলা গানও শিখেছি মনীন্দ্র চক্রবর্তী এবং বিমান মুখার্জীর কাছে। আমার রবীন্দ্রসংগীতের গুরু হলেন আমার ছোড়দি নমিতা ঘোষাল এবং দেবব্রত বিশ্বাস (জর্জদা)। রবীন্দ্রসংগীতের এই অমর শিল্পীকে আমি অসাধারণ শ্রদ্ধা করি—একজন সৎ মানুষ হিসেবে এবং একজন বিদগ্ধ শিল্পী হিসেবে। রবীন্দ্রসংগীতের এমন প্রাণ, রূপ ও রস আমি আর কারুর গানে পাই না। আজও জর্জদার আমি শিষ্য।

এবার আসছে প্রেরণার ব্যাপারটা। এটা শিল্পীর জীবনে খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ উপযুক্ত প্রেরণা ছাড়া কোন শিল্পীরই শিল্প সত্তার প্রকৃত বা পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না। আমি এব্যাপারে মনে হয় দারুণ ভাগ্যবান। এবং আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমার মত ভাগ্যবান খুব কমই আছেন। আমার বাড়ীর লোকরা এ ব্যাপারে আমার জন্য যা করেন তার নজীর খুব কমই পাওয়া যায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে আমি। আমার বাবা (অমূল্য চন্দ্র ঘোষাল) এবং মা (লাবণ্য ঘোষাল) অনেক কষ্ট ক'রে মানুষ করেছেন। তাঁদের সততা আমার জীবনের আদর্শ। অনেক দুঃখ কষ্টের সংগে সংগ্রাম করেও আমার মা বাবা ভেঙ্গে পড়েননি। তাঁদের স্বপ্ন ছিল কি ক'রে সব দিক দিয়ে আমাদের পাঁচ ভাইবোনকে ভালভাবে মানুষ করা যায়। তাঁদের সে স্বপ্ন সফল হয়েছে কিনা বলতে পারি না—কারণ এর উত্তর ওনারা দিতে পারবেন। তবে আমার মনে হয় খানিকটা নিশ্চয়ই হয়েছে। কারণ আমরা কেউই অমানুষ হইনি নিশ্চয়ই। আমার মার গানের গলা ছিল অসম্ভব সুন্দর। স্বপ্ন ছিল গাইয়ে হবার। পাটনায় তৎকালীন বিখ্যাত সংগীত শিল্পী কেষ্ট মজুমদার মহাশয়কে সংগীত শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন আমার দাদু শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন মুখুটি। কিন্তু প্রতিভা [illegible]

[ত]বুও মার সে স্বপ্ন সফল হয়নি। কারণ খুব কম বয়সে বিবাহ হয় এবং পূর্ব-[বা]ংলার (অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ছয়গাও) এক গ্রামের গৃহবধু[রূ]পে আসেন এবং সংসারধর্ম পালন আরম্ভ করেন। কিন্তু নিজের ইচ্ছে ছেলে-[মে]য়ের মধ্য দিয়ে পূরণ করার জন্য তিনি বদ্ধ পরিকর ছিলেন। এবং সে জন্য যা [যা] করার প্রয়োজন তার কোনটিরই ত্রুটি রাখেন নি তিনি। আমার মার এই ঋণ [কো]নদিন শোধ করতে পারবো কিনা জানিনা—তবে জীবনে যদি সত্যিকার [মা]নুষের মত মানুষ হতে পারি আর ভাল গাইতে পারি তবেই আমি মনে করি [মা]র মন খুশী হবে। মা বাবার পরই আমার দাদা এবং দিদিদের কথা আসে। বড়দির কথা আগেই বলেছি। বড়দা রঞ্জিত ঘোষাল (বর্তমানে কলকাতাতে MMTCতে কর্মরত) এবং দুই দিদি সবিতা ঘোষাল (শিক্ষিকা—পৌর প্রতিষ্ঠান স্কুলের) এবং সংগীত শিল্পী নমিতা ঘোষাল (শিক্ষিকা—সাউথ পয়েণ্ট স্কুল) সব সময়ই নানাভাবে উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়ে থাকেন। বিশেষ করে সবিতাদি এবং নমিতাদির কোন তুলনা নেই এই ব্যাপারে। আমার বর্তমান সংগীত জীবনের অগ্রগতির পথে এঁদের নিরলস সংগ্রাম, সাধনা এবং নিস্বার্থ অবদানের কোন তুলনা আজকের দিনে পাওয়া যাবে কিনা জানি না। আমি এদের কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

আর একটা কথা এখানে না বললে গোটা লেখাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হ'ল আমি লেখক নই। লিখতে পারি না। তাই লেখার মধ্যে কোন দোষ ত্রুটি থাকলে আশা করি আপনারা ক্ষমা করবেন। একটু আধটু গানটান আসে। তবে লেখার ব্যাপারে অনবরত ছিনেজোঁকের মত লেগে থাকে আমার বন্ধু মানবেন্দ্র সান্যাল। মাঝে মাঝে দু একটা প্রবন্ধ লিখিয়েছেন। আর সেই জন্যই বর্তমানে কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় আমার লেখা বেরিয়েছে। ওর প্রচেষ্টা এবং তৎপরতা না থাকলে আমি হয়ত এক্ষেত্রে হাত বাড়াতাম না। যাইহোক আমার লেখার ব্যাপারের জন্য ঐ বন্ধুটি পুরোপুরি কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

সব শেষে একটি কথা বলে আমার লেখা শেষ করব। এই কাগজের মাধ্যমে আমি বাংলার এবং প্রবাসী বাঙালীদের এবং আমার অবাঙালী শ্রোতাদের আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যাঁরা আমার বন্ধুস্থানীয় তাঁদের কাছ

থেকে শুভেচ্ছা এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে আমি আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি—এই জন্য যেন সংগীতের ব্যাপারে নিরলস সাধনা এবং অধ্যবসায় আমার অব্যাহত থাকে। জীবনের সুখ দুঃখে যেন সমান অবিচল থাকি। সম্মানে অপমানে সব সময়ই যেন সঠিক পথে পরিচালিত হই এবং জীবন তরণী বেয়ে চলতে পারি। এই প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির অমর কাব্য উচ্চারণ করে আজ আমার বক্তব্য শেষ করছি :

সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

বেশভূষায় শালীনতা রক্ষা করুন

বেলা দে

ভারতবর্ষের নানাভাগে নানারকম জল হাওয়ার জন্য মানুষের চেহারা, াষাক ও সাজসজ্জার বৈচিত্র্য আমাদের চোখে পড়ে। তবে এ কথা াকার কর্তে বাধা নেই যে, ভারতীয় মেয়েদের সাংস্কৃতিক পরিচ্ছদ পৃথিবীর ান্যান্য দেশের মেয়েদের পোষাক অপেক্ষা অনেক সুন্দর ও সুরুচিসম্মত। দিও সভ্যতা ও প্রগতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে বেশী পরিবর্ত্তন য়েছে পোষাক-পরিচ্ছদে। এই পোষাক-পরিচ্ছদে মানুষের মনের অনেকখানি চির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে শুধু দামী শাড়ী ও অলঙ্কারে পরিবেষ্টিত লেই সুন্দর হওয়া যায় না, নিজেকে সুন্দর করে তুলতে সুরুচির প্রয়োজন য়। আজকাল শাড়ী ব্লাউজের পরিবর্তে নানা ধরনের বেশভূষা অনেকেই করছেন তাতে সৌন্দর্য্য কতটা বাড়ছে জানিনা তবে শাড়ীর মধ্যে নারীকে যে গৌরব ও মহিমার রূপে খুঁজে পাওয়া যায় তা আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। নারীর স্বাভাবিক লজ্জা শাড়ীর মধ্যে অপূর্ব মহিমায় প্রচ্ছন্ন হয়। শাড়ী শুধু ব্যবহার দেখানোর জন্যে নয়, নিজের শালীনতাকেও বজায় রাখতে হয়। তাই আমাদের মেয়েদের এমনভাবে সাজতে হবে যাতে অন্যের দৃষ্টিলুব্ধ ঔৎসুক্যে উজ্জল না হয়ে শান্ত সম্ভ্রমে নমিত হতে পারে।

সৃষ্টির প্রথম যুগে পুরুষ চেয়েছিল তার প্রিয়াকে কেয়ূরে কঙ্কনে আরো কতরূপে সাজাতে। সুরু হলো নারীর বেশ বিন্যাসের পালা., আজো যা পুরোদমে চলেছে। অবশ্য যতদিন কবির কাব্য প্রকৃত সৌন্দর্য্য এবং মানুষের সভ্যতা থাকবে ততদিন নারীর বেশ বিন্যাসের দিকটিও বজায় থাকবে। নারী বিশ্ব সৌন্দর্য্যের প্রতিভূ। প্রকৃতি থেকে সে পেয়েছে সুকুমার মনোবৃত্তি। তাই সে সৌন্দর্য্যপিপাসু —তাই সে সাজতে ভালবাসে নানা আভরণে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত এসে তাকে থামতে হবে। তাকে মনে রাখতে হবে সৌন্দর্য্য যেখানে সুরুচিকে ছাড়িয়ে যায়, আড়ম্বর যেখানে বাহুল্যে পরিণত হয় সেখানে আর রূপের শ্রী থাকে না।

প্রসাধন বা বেশ বিন্যাস যাই করুন না কেন মনে রাখতে হবে এর জন্য আপনি কতটা অর্থ ব্যয় করছেন। সংসারের ছোট বড় হাজার রকমের ব্যয় আছে সেগুলি অবশ্য পালনীয়। ঘরের খরচ খাওয়া, লেখাপড়া, চিকিৎসা কিছু সাহায্য করা ইত্যাদি তো আছেই।

পুরাকালে নারীর বেশ বিন্যাসের খরচ এতটা ছিল না। তাঁরা প্রকৃতির দ্রব্যের সাহায্যে রূপচর্চা করতেন। তাঁদের প্রয়োজনও যেমন ছিল অল্প তার আয়োজনও ছিল বাহুল্য বর্জিত। আমি সাজসজ্জা করতে বারণ করছি না তবে রুচি ও সঙ্গতি অনুসারে ব্যয় করা উচিত। মনে রাখতে হবে শুধু কাপড় গহনা দিয়ে নিজের মান বাড়ানো যায় বটে তাতে প্রকৃত রূপের প্রকাশ হয় না। সে শ্রীমতী শ্রী-ই তার একমাত্র রূপ। তাই স্বাভাবিক লাবণ্যময়ী মেয়ে সাধারণ জামা-কাপড় পরলেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দু'খানি বালা হাতে আর কানে দুটি দুল তা সে সোনার বা রূপোর যাই হোক না কেন মেয়েটিকে চমৎকার মানাবে।

"তোমার বাহুতে তাই কে দিয়েছে টানি
দুইটী সোনার গণ্ডি কাঁকন দু'খানি।"

গহনার বাহুল্য যত বর্জন করা যায় ততই মঙ্গল। আজকাল শাড়ী জামার রঙের সঙ্গে মিশিয়ে নানা রকম কৃত্রিম প্রচলন হয়েছে এগুলি দেখতেও সুন্দর এবং নিরাপদ।

আমাদের দেশের প্রাচীনাদের চুল বাঁধনে, বসনে, ভূষণে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। আড়ম্বরহীন পরিচ্ছদে শিল্পের পরিচয় ছিল। সাঁওতাল মেয়ের রূপ যৌবন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেন কালো পাথরের জীবন্ত মূর্তি। মাথার ফুল, হাতে গলায় ফুল, বা পুঁতির গয়না আঁটসাঁট কাপড়—কোথাও ব্যয় বাহুল্য নেই কিন্তু কি সুন্দরী তারা। পশ্চিমদেশে বাহ্যিক প্রসাধন দিয়ে নিজেকে মনোহারিনী বেশে প্রকাশ করার শিল্প অনেক উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ শুধু অঙ্গ প্রসাধনে রূপের মর্য্যাদা বাড়ানোর চেয়ে বেশী নির্ভর করে অন্তরের সৌন্দর্য্য প্রসাধনে। চিত্ত চরিত্রের সৌন্দর্য্য প্রসাধন নারীকে বেশী মনোহারিনী করে এবং তার প্রভাবও হয় সুদূর প্রসারী। তাকে মনে রাখতে হবে তার সামনে উন্মুক্ত কর্মক্ষেত্র। শিল্প ও সংস্কৃতির

দ্বারা তাকে গড়তে হবে সমাজ। তার মনের অলঙ্কার দিয়ে নতুন করে দেশকে সাজাতে হবে। সে নিজে যেন বাহ্যিক অলঙ্কারের বোঝা না হয়। আজকের নারীকে মনে রাখতে হবে শক্তির আধারে রূপলাবণ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়। সুস্থ দেহমনই সৌন্দর্য্যের আধার। "আমার এই দেহখানি তুলে ধরো। / তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো।" দেবালয়ে প্রদীপ জ্বালতে ব্যয়ের প্রশ্ন ওঠে না, তেমনি সব রকম বাহুল্য বর্জন করে দেবালয়ের প্রদীপটির মতো বিশ্বনারী বর্ষে প্রতিটি নারীর দেহমন উজ্জল হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা করি॥

পূর্বাচলের পানে

রণজিৎ কুমার সেন

জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায় কোনো এক প্রহরে অকস্মাৎ যদি সমস্ত চিত্তকে মথিত ক'রে প্রভাতের কোনো হারানো সুর ভেসে আসে, যদি ভুলে-যাওয়া কোনোদিনের কোনো মিষ্টি গন্ধ আচম্‌কা ফিরে এসে হঠাৎ মনকে গভীর ভাবে আলোড়িত করে, তবে এমন কে পাষাণ আছে—যে অস্তাচলের পাড় থেকে সমস্ত চেতনাকে একত্রে জড়ো ক'রে ছুটে গিয়ে দাঁড়াতে চায় না প্রভাতের সেই শ্যামলীম আঙিনায়? সেখানে উষার অরুণরাগে ঘাষফুলগুলো একটু একটু ক'রে চোখ মেলছে, আর কোন্ একটি ছোট্ট খোকা সেই ফুলের গায়ে সোহাগের হাত বুলিয়ে দিয়ে আপন খেয়ালে বলে উঠচে: 'আমি যদি তোর মতো হতাম, তবে প্রতিদিন সূর্যের হাসিতে গা মেজে ঘাষের বুকে পাঁপড়ি মেলে দিয়ে এমনি ক'রে ফুটে উঠতে পারতাম।'

প্রতি মানুষের সেই ছোট্ট খোকাটি মাঝে মাঝে দূর অতীত থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। নিজের অলক্ষ্যেই মন তখন সাড়া দিয়ে বলে: যাচ্ছি, যাচ্ছি। অম্‌নি তার বর্তমানকে ডিঙিয়ে মনে মনে সে গিয়ে দাঁড়ায় প্রভাতের সেই ঘাষ ফুলটির সামনে, আর দূর-প্রসারিত জীবনের অভিলাষকে গেঁথে দেয় তার পাঁপড়ির রঙে রঙে। সারা জীবনের সুখ-দুঃখের দিনরাত্রিগুলিকে তখন বোঝার মতো নামিয়ে দিয়ে কয়েকটা মুহূর্ত নিজের মধ্যে স্তব্ধতার স্তরে নিমগ্ন হয়ে যায় মানুষ, আবার একটু একটু ক'রে নিজের বর্তমানে ফিরে আসে স্মৃতির সুধা নিয়ে।

এই মুহূর্তে তেমনি আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেই ছোট্ট খোকাটিকে,—যার সঙ্গে রক্তে-মাংসে নর্মে মর্মে ও চিত্রে চরিত্রে একদা একাত্ম হয়ে ছিলাম আমি। সে আমাকে অলক্ষ্যে কখন্ ডেকে নিয়ে গেল প্রভাতের সেই শিউলি-তলায়—যেখানে ফুলের গন্ধে ভ'রে থাকতো আমার সারা সকাল, যেখানে তরুণ সূর্য তার উদার আলোকিত চুম্বনে আমার সমস্ত মুকুলিত সত্তাকে রোমাঞ্চিত ক'রে তুলতো। আমি তখন বুঝি ফুলের সৌরভ নিয়ে কেবল সূর্যই হয়ে উঠতে

চেয়েছিলাম, নানা প্রতিশ্রুতির পাপড়ি দিয়ে মনে মনে সৃষ্টি করেছিলাম চিরশোভন মনলোভন একটি জীবন্ত পুষ্পকে। তাকেই সেদিন জীবন ব'লে জেনেছিলাম। তারপর কখন্ কোন্ অলক্ষ্যে সেই জীবনটা ধীরে ধীরে জীবনেরই পাঁকে পাঁকে ডুবে গেল, চোখে পড়েনি। সূর্য হ'তে চেয়ে মাটির একটি ছোট্ট প্রদীপই কি হ'তে পেরেছি?

এই মুহূর্তে আমি জীবন থেকে ছুটি নিয়ে মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছি সেদিনের সেই ছোট্ট খোকাটির। তার মিষ্টি মুখে চপল হাসি টেনে সে প্রশ্ন করলো: 'অনেক দূর তো এগিয়ে গেলে, কি পেলে? জবাব তৈরী ছিল না মনে, তবু বললাম: 'যে মুহূর্তে তোমাকে ফেলে গেছি, সেই মুহূর্তে নিঃশেষে ঝরে গেছি আমি —যেমন ক'রে শিউলি ঝ'রে পড়ে টুপ্‌টাপ্ টুপ্‌টাপ্ তার বোঁটা থেকে। তোমার অম্লান হাসি দিয়ে আবার তুমি ভ'রে তোলো আমাকে।' ছোট্ট খোকাটি আর একবার হাসলো শিউলি-শুভ্র হাসি, বললো: 'তা কি হয়, সে যে মস্ত একটা ঠাট্টা। একবারও তাকিয়ে দেখেছ আকাশটাকে?' দেখলাম—পূর্বাচলের সূর্য কখন্ পশ্চিম দিগন্তে ঢ'লে পড়েছে, ধীরে ধীরে ছায়া ছায়া হয়ে আসচে অকাশটা। পাছে নিজেকে হারিয়ে ফেলি, তাই দু'হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইলাম সেই ছোট্ট খোকাটিকে। কিন্তু শূন্য বাহু দুটি আমার শূন্যই থেকে গেল। তাকিয়ে দেখলাম —খোকা কখন্ পালিয়ে গেছে!!

পুষ্পময়ী কলকাতা

ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

'আমাদের ঘরের আশে পাশে যে সব বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে' তাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি-ভাবুকের আগ্রহের অভাব ছিল না। কিন্তু বর্তমান বৈশ্য জগতের প্রয়োজন—সর্ব্বস্ব জীবন ধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়ে আমরা অনেকেই ঐ 'বোবা' ও উপকারী সাথীদের ভুলতে বসেছি! তাই আজ থেকে কয়েক দশক আগেও কলকাতা আর সহরতলীর মাঠে-ময়দানে, পার্কে, পথের পাশে ফুলে ঝলমল দেশী বিদেশী, চেনা-অচেনা যে সব তরু চোখে পড়তো, একালে তার প্রায় অধিকাংশই বিনা বিজ্ঞাপনে ও সমারোহে বিদায় নিয়েছে বা নিতে বসেছে। তবু এখনও যে দু'দশটি অনাদর, অবহেলা সত্ত্বেও কোনক্রমে টিঁকে আছে তাদের দিকে চেয়ে শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও মাঝে মাঝে কৌতূহলী, পুষ্প প্রেমী পথিক থমকে দাঁড়ান, সেই সমস্ত পুষ্পপ্রসূ তরুর (ফ্লাওয়ারিং ট্রি) 'ফুল কুসুমিত' রূপ এখনও আমাদের চোখ টানে, মন টানে। গাছের নাম, বংশ পরিচয়, ফুল ধরার সময়-ক্ষণ নিয়ে আলোচনাও শোনা যায় ট্রামে বাসে। দ্রুত ধাবমান গাড়ির জানলায় মুখ রেখে নজরুল ইসলাম এভেনিউ-এর সদ্য রোপিত ফুল তরু বীথির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে অনেক বিদেশীও 'মিছিল' ও 'আবর্জনা'র নগরী কলকাতার প্রেমে পড়ে যান। একদা রবীন্দ্রনাথও জোড়াশাঁকোর আবর্জনা স্তূপের মধ্যে এক উদ্ধত নাগকেশরের (ওছরোকারপুস লঙ্গি-ফোলিউস) চারাকে মাথা তুলতে দেখে বিস্ময়ে, মমতায় অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখেরা সহর কলকাতার প্রায় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও ফুলকে ভালবেসেছেন গভীর ভাবে; বিশেষত বহু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আলম্বন বা উদ্দীপন বিভাব হচ্ছে পুষ্প প্রসূ তরু, যে সব গাছ এক সময় ছিল কলকাতার পথের শোভা তাদেরও কবি উপেক্ষা করেন নি।

তাই প্রথমভাবে, এখনও অবশিষ্ট আছে এমন কয়েকটি পুষ্প প্রসূ তরু সম্পর্কে

(বৃহত্তর কলকাতায়) সংক্ষেপে দুচার কথা আলোচনা করি ; করলে অনেক পাঠক-পাঠিকার কৌতূহলই নিরসন হবে। অবশ্য এই সূত্রে যে সব দেশী বিদেশী ফুলের গাছের কথা বলা হবে তার অধিকাংশই আমাদের অজান্তে সহর থেকে বিদায় নিতে বসেছে। দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ফুটপাতগুলিতে স্থায়ী ভাবে দোকান সাজিয়ে বসা, পার্কের গাছগুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, ময়দানের পুষ্প বীথি সমূহের প্রতি সাধারণের অবহেলার ভাব ইত্যাদি বহু কারণই নির্দেশ করা যায় এই বৃক্ষ-বিদায়ের। আসলে আমাদের অবহেলা আর অজ্ঞতার জন্যেই এই সমস্ত ফুলে ভরা গাছ একে একে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। তাই এই পুষ্প প্রসূ তরুগুলিকে নির্দয় কুঠারাঘাত বা মহিষ-গরুর আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেও ভালো করে জানা এবং চেনা দরকার। তবেই 'আসফল্ট অরণ্যে'র শুষ্ক, বর্ণহীন একঘেঁয়েমির মধ্যে আমাদের চোখ ও মন দু'দণ্ডের আরাম এবং তৃপ্তি খুঁজে পাবে।

অবশ্য পথ আলো করে থাকা নানা পুষ্পপ্রসূ তরুর মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে আকর্ষণীয় বা মনোহারী এ নিয়ে স্বভাবতই বিতর্ক বাধতে পারে ; এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো কখনই সম্ভব নয় ; কারণ এক এক ঋতুতে, এক এক পরিবেশে গাছের রঙ ও রূপ বদলায়। ঘন বর্ষার পটভূমিকায় কদম্ব (লাতিন-নাউক্লিয়া কদম্বা) ও কেকাধ্বনি আমাদের মনে যে রসাবেশ সৃষ্টি করে অন্য ঋতুতে তেমন করেনা। আবার কোন গাছের পল্লব এমন সময় ঝরে পড়ে যে ঠিক সেই ঋতুতে ফুল ও পাতাগুলি থাকলে তাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখাতো। আবার কোন গাছের ঘন পত্রগুচ্ছ ফুলকে ঢেকে ফেলে একেবারে। কোন গাছের নীচে এত অজস্র ফুল ঝরে পড়ে (যেমন শিউলি বা শেফালিকা, লা-নাইকট্যানথেস্ আরবোর-ট্রিসটিস্) যে পথিকের নজর চলে যায় সেই দিকে। আবার কতকগুলি গাছের ফুল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ; সেখানে দেখা যায় ফলের অনাবশ্যক প্রাচুর্য।

অতঃপর আমাদের খুব চেনা অথচ নিতান্ত অবহেলিত একটি পুষ্প প্রসূ তরুর কথা দিয়ে আমাদের এই বৃক্ষ-পরিচিতি শুরু করা যাক। কলকাতার সহরতলীতে বাবলা (লা-আকাসিয়া) গোত্রের (জেনাস) বেশ কিছু গাছ অযত্ন উপেক্ষা সত্ত্বেও কাঁটার রক্ষা কবচের জোরে এখনও টিঁকে আছে। এই চিরহরিৎ গাছটির মৃদুগন্ধ যুক্ত হলুদ ফুলের শোভা কিন্তু দেখবার মত। বসন্ত সমাগমে এই গোত্রের বহু গাছেই (যথা, বিটখদির, আকাসিয়া ফারনেসিয়া) ফুল ধরে।

· ফুলের শোভায় আরও যে সব গাছ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

তাদের মধ্যে অশোক (সারাকা ইণ্ডিকা / জোনেসিয়া আশোকা), কৃষ্ণচূড়া (গোল্ডমোহর পেয়েন্সিয়ানা পুলছেরিমা), কৃষ্ণকলি বা সন্ধ্যামণি (মিরাবিলিস জালাপা), রাধাচূড়া বা মোহন চূড়া (পয়েন্সিয়ানা রেজিয়া), পলাশ (বিউটিয়া ফ্রোনডোসা) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এগুলিতে ফুল ধরে শীতের শেষে। অশোক গাছ আসলে পৌরাণিক যুগ থেকেই তার ফুলের বাহার এবং নানা ভৈষজ্য গুণের জন্যে বিশেষ সমাদৃত। বসন্ত সমাগমে যখন অশোকের ডালে ডালে গাঢ় লাল ফুলগুলি ফুটে ওঠে তখন কবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করে— 'রক্ত রঙের জাগলো প্রলাপ অশোক গাছে' (রবীন্দ্রনাথ), অথবা ময়ূরের পেখমের মত উন্মোচিত লাল কমলায় মেশানো কৃষ্ণচূড়া ফুল যখন গাছের ডালগুলি ক্রমে ক্রমে ঢেকে ফেলে তখন অকবি নাগরিকের মনেও জাগে বসোচ্ছ্বাস। এমন আরও কত পুষ্পবৃক্ষ ছড়িয়ে আছে। ইতিউতি দাঁড়িয়ে আছে জারুল, ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা, রক্তকরবী, কুন্দ, কুড়চি, কদম, চাঁপা, বাত্তবাব বা গোরখা ইমলি। যারা বর্ষা বসন্তে ধরে পুষ্পময়ী রূপ। ইটের পরে ইট দিয়ে গাঁথা কলকাতাকে করে তোলে কল্লোলিনী।

———

কবিতা বিষয়ে কিছু কথা

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

নিজের সম্পর্কে লেখা বোধহয় সবচাইতে শক্ত। তথাপি লিখছি, আপনাদের অনুরোধের মূল্য দেওয়া আমার কর্তব্য।

আমিও খুব ছোট বয়সে কবিতা লিখেছি, বলা বাহুল্য, বড়োদের লুকিয়ে। আমার পারিবারিক আবহাওয়ায় বিজ্ঞানের চাইতে সাহিত্য ও ধর্মের জায়গা বেশি ছিল। আমার ঠাকুরমা, বাবা ও মা কবিতা ও ভক্তিমূলক গান লিখেছেন অনেক, পরে তাঁদের লেখা আমি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু বাবার গান ও স্মৃতিকথা ছাড়া আর কারও কোন লেখা কোথাও ছাপা হয় নি। পূর্ববঙ্গের গ্রামে মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারে মেয়েদের লেখা ছাপার কথা সম্ভবত সে সময়ে কারুর চিন্তায় আসে নি। ছোট বয়সে মৌচাক, শিশুসাথী, ভাইবোন, রংমশাল এবং দৈনিক পত্রিকার ছোটদের পাতার সঙ্গে আমি বড়োদের জন্য রাখা পত্রিকাগুলিও পড়ে নিতাম, যেমন—প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বর্তমান, শনিবারের চিঠি, মাসিক বসুমতী। পরিচয় পত্রিকা বাড়িতে বাণ্ডিল করে রাখা ছিল দেখেছি কিন্তু তখন পরিচয়ে আমার উৎসাহ ছিল না।

কলেজে পড়ার সময় আধুনিক কবিতার স্টাইল সর্বস্বতা আমাকে বিরক্ত করত। সে সময়ে প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক হিসেবে নিজেকে ভাবতে আমার ভালো লাগত। কলেজে পড়াবার সময় আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে আধুনিক কবিতার সমালোচনা করতে গিয়ে বাজি রেখে আমার বড়ো বয়সের কবিতা লেখার শুরু। সময় ১৯৬৪ বা ৬৫ সাল— ঠিক মনে করতে পারছি না। আমার দুটি কবিতা এক সঙ্গে জুড়ে (নিশ্চয়ই ভুলবশতঃ) ধ্রুপদী পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়।

কোন্ কোন্ পত্রিকায় লিখেছি? বাংলার ছোটবড়ো নানা পত্রিকায়। নামের তালিকা বোধহয় জরুরি নয়। আমার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ দুটি—'আমার প্রভুর জন্য' এবং 'যদি শর্তহীন'। তৃতীয়টি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

আমার 'কাব্যে স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা যেভাবে প্রাণ পায় অথবা [illegible] বা পরিবেশ প্রাণসঞ্চার করে'—সে বিষয়ে সুচারু কথায় কিছু লেখা শক্ত। স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি খুব একটা মাথা ঘামাই না। অভিজ্ঞতার সঙ্গে চিন্তা বা কল্পনার সংযোগে একটা জটিল উপায়ে একধরণের কবিতা রচিত হয়। প্রেরণা মূলে অবশ্যই থাকে কিন্তু লেখায় শেষ পর্যন্ত থাকে না। অল্প কিছু কবিতা পরিমার্জনা-অসহিষ্ণু, শুদ্ধ প্রেরণাজাত, দেখা-ছবির মতো লেখা হয়। কিছু কবিতা আবার চালাকচতুর—ছন্দশব্দের প্রসাধন-প্রধান।

মৃত্যু, অসুখ বা কষ্ট আমাকে দিয়ে কবিতা লেখাতে পারে, নিজের কষ্ট পারে সবচাইতে বেশি। একধরণের শুদ্ধ আনন্দও আমাকে অনুপ্রাণিত করে, কিন্তু তা আমাকে কবিতা লেখায় তত সাহায্য করে না যতটা আমার চৈতন্যকে অভিভূত করে। অর্থাৎ আমাকে এদিক থেকে অনায়াসে স্বার্থপর বলা যায়। কবিতার তির্যক্ প্রকাশভঙ্গি আমার প্রিয়। চিত্রময়তার চাইতে ব্যঞ্জনা আমার বেশি ভালো লাগে।

লেখিকার বক্তব্যের পরও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে—সেটা হচ্ছে মানুষটিকে চিনিয়ে দেওয়া—বিজয়া মুখোপাধ্যায় স্বাতন্ত্র্যবাদী না? এই প্রশ্নটা শুনেছি বহুবার বহু লেখক লেখিকার মুখে। সমুদ্রের অতলে থাকে ঝিনুক—সেই ঝিনুকের দুটি কোরকে থাকে মুক্তো—কিংবা বর্ষার গ্রামের মেঠোপথ দিয়ে যেতে যেতে দিঘীতে নজরে পড়ে পদ্মফুল—বিজয়া মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে ভাবতে গেলেই কেন জানিনা আমাদের এ উপমাগুলো মনে পড়ে। অহমিকা বা স্বাতন্ত্র্যবোধ মোটেই ওঁর নেই, তবে কবিসুলভ একটি নির্জনতা বোধহয় ওঁর মনকে ঘিরে থাকে। খুব কোলাহল। খুব হৈ-চৈ বা সাহিত্যিক আড্ডায় সবসময় উনি পক্ষপাতী নন। স্বামী প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিক শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। কিন্তু হলে কি হবে—এ ব্যাপারে স্বামী মোটেই স্ত্রীকে help করেননা, বলছিলেন বিজয়া মুখোপাধ্যায়। কবিতাকে উনি ভালবাসেন—জীবনের চেয়েও। তবে জীবনও যে ওঁর কম প্রিয় নয় তার প্রমাণ শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের সুন্দর ও পরিপাটি করে সাজানো সংসার। শুধু কবিতা লেখায় হাতই ওঁর অপূর্ব নয়, কবিতা আবৃত্তির এমন কণ্ঠও বুঝি কম দেখা যায়। চিন্তার জগতে উনি সহজেই নিজের বলিষ্ঠ মতামত প্রকাশ করতে পারেন। বলেন, মেয়েদের সম্পর্কে বলবার ও লেখবার এত আছে, কিন্তু সেই অনুপাতে প্রকাশের মাধ্যম বড় একটা নেই।

এককালে অধ্যাপনা করেছিলেন এখন ঘর সংসার করেন আর বাকী সময় লেখেন। বললেন, অনেক লেখক লেখিকা শুনেছি নিয়মিত লেখেন। কিন্তু আমি ঠিক তা পারিনা।

শিক্ষিতা ও মার্জিত রুচীর মানুষ বিজয়া মুখোপাধ্যায়—না শিল্পে না জীবনে কোথাও অকারণ আড়ম্বর পছন্দ করেন না। সহজ সরল ও সাদাসিদে প্রকৃতির এই কবিসত্বার প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা। তার শিল্পী জীবন আরও বহু…ব…হু বছর পাঠক পাঠিকাদের আনন্দ দান করুক আমরা সেই প্রার্থনাই করি।

জীবনের চিত্রকর

হেনা চৌধুরী

নিঃস্তব্ধ রাতে একটানা বৃষ্টির রিমঝিম আওয়াজটা বেশ লাগছিল। কিন্তু যখন বৃষ্টি এসে কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটায় তখন কিন্তু বেশ রাগই ধরে। অথচ রাতের এই নিথর মুহূর্তগুলিতে বৃষ্টিকে মনে হয় বন্ধু। শুধু বন্ধু নয় পরম বন্ধু। শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না, জানালায় এসে দাঁড়ালাম। এই মুহূর্তে ভীষণ ভাবে মনে পড়ল নীলিমাদিকে। নীলিমাদি একদিন বলেছিলেন, জানো বৃষ্টির মধ্যে আমি ভগবানের করুণা ধারার স্পর্শ পাই। অদ্ভুত মানুষ এই নীলিমাদি। মুখে সব সময় হাসিটি লেগেই আছে—কিন্তু কেউ জানে না যে সে ওয়েসিসের অন্তরালে চাপা পড়ে আছে বিরাট এক সাহারা মরুভূমি। যেখানে শুধু ধু-ধু করে মাঠ। বালি আর কাঁকর। কিন্তু কথা আছে পাথরেও ফুল ফোটে। নীলিমাদির হাতের আঁকা ছবি দেখলে সেকথাই মনে হয়। নীলিমাদি মেয়েদের মধ্যে নামী চিত্রকর। তার বালিগঞ্জ প্লেসের ফ্ল্যাটটি নিখুঁৎ করে সাজানো ছবিতে ছবিতে।

বেডরুম, ড্রইংরুম আর একটি আঁকবার ঘর—এই তিনটি ঘর নিয়ে নীলিমাদির সংসার।

ছবি! ছবি আর ছবি!

কিছুদিন আগে প্যারিসে একটা আর্ট একজিবিসনে নীলিমাদির ছবি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিল। শিল্পী হিসেবে এর চেয়ে বড় সম্মান আর কি হতে পারে?

কিন্তু শিল্পের অন্তরালে জীবনশিল্পী যে তার জীবনটাকে নিয়ে কি ছিনিমিনি খেলেছেন তার খোঁজ তো কেউ রাখে না?

আমিও জানতাম না। যদিও নীলিমাদি আমার খুব কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক দিদির মতন। তা না বলে দিদি বলাই ভাল। বিশেষ করে আমার যখন নিজের কোন দিদি নেই।

সেদিন ছিল রাখী পূর্ণিমা। নিটোল গোলাকার রূপোর থালার মতন চাঁদ হাসছিল আকাশের বুকে। আমি আর নীলিমাদি দুটি বেতের চেয়ারে নীলিমাদির ছাদের বাগানে বসেছিলাম মুখোমুখি। আমারও মনটা একটা ব্যক্তিগত কারণে একটু ভারী হয়েছিল। তাই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে চলে এসেছিলাম নীলিমাদির

মেঘের আশ্রয়ে। চারিদিকে টবে বানানো রকম রকম ফুলের গাছ। বেল, জুঁই, হাস্নাহেনা—সব মিলিয়ে খুব মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছিল। দুজনে চুপচাপ বসেছিলাম। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে নীলিমাদিই বললেন, তুমি তো লেখিকা—আজ তোমায় একটা গল্প বলবো। গল্প মানে গল্পের প্লট।

বললাম, সে কি নীলিমাদি আপনি বুঝি ছদ্মনামে আবার গল্পও লেখেন?

নীলিমাদি ম্লান হেসে বললেন, উপন্যাসের গল্প নয়। এ একটা জীবনের গল্প। বুঝলাম এ কিসের ভূমিকা। এমন রাতে বোধহয় তাঁর অতীতের কোন স্মৃতি মনে পড়ে গেছে, তাই জীবনের সেই সঞ্চয়গুলো আমাকে দিয়ে একটু হাল্কা হতে চাইছেন।

আয়া এসে কফি দিয়ে গেল। নীলিমাদি এক পেয়ালায় ঢেলে আর এক পেয়ালা আমায় এগিয়ে দিয়ে বললেন, আগে ছাখো চিনি ঠিক আছে কিনা? বললাম, দু-চামচেই দিয়েছেন তো। ঠিকই হবে। তাঁর কাহিনী কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নীলিমাদি স্থরু করলেন।

ছোট মেয়ে স্কুলে পড়ি। লেখাপড়া, নাচগান সবই ভাল লাগে। স্কুলে কোন উৎসব হলেই আমার নাচবার ডাক পড়তো। তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। বর্ষামঙ্গল উৎসবে নাচ শেষ করে দর্শকদের প্রচণ্ড হাততালি কুড়িয়ে বেশ একটু বিজয়িনীর ভংগীতে স্কুলের সেক্রেটারীর চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন। সেক্রেটারীর পাশেই বসেছিলেন বেশ একটু হোমরা চোমরা গোছের এক ভদ্রলোক। তিনি আমায় কাছে ডাকলেন। আমার নাম কি, কোন্ ক্লাসে পড়ি, কোথায় থাকি, বাবা কি করেন—মানে এক নাগাড়ে ভদ্রলোক আমায় এক ঝাঁক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। কোনরকম ভাবে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিয়ে বান্ধবীদের কাছে ফিরে গেলাম। পরের দিন যথারীতি বই বগলে করে বেণী দুলিয়ে স্কুলে গেলাম। অনেক স্বপ্ন তখন চোখে। স্কুল ছেড়ে কলেজ। কলেজ এর পরে ইউনিভারসিটি। কিন্তু আমার সব স্বপ্নের গণ্ডগোল করে দিলেন সেদিনের সেই ভদ্রলোক। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে ওই কটি কথার ফাঁকে তিনি আমায় মনে মনে তাঁর ভাবী পুত্রবধূ নির্বাচন করে ফেলেছেন। আর তাঁর সেই চকিত ভাললাগার মধ্য দিয়ে শুধু আমার ভবিষ্যৎ জীবনই নয়—গোটা জীবনটাই মৃতের সমাধি মন্দির করে দেবেন!

নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত লগ্নে আমাদের বিয়ে হলো। তারপর একটু থেমে নীলিমাদি বললেন, জানো আজও যেন অনুভব করতে পারি তাঁর সেই হাতে

হাত রেখে অস্ত পড়ার মুহূর্তগুলি ! সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, আমার [illegible] বুঝি কেউ নেই ! এমন আশ্রয় বুঝি আর কারুর নেই । 'কিন্তু আজ ?' পায়ের তলায় মাটি আর মাথার ওপর আকাশ এটুকু গড়ে তুলেছি নিজের শান্তনায়— কিন্তু সেই হাতের মুঠি ! তোমরা বল নীলিমাদি এত বড় চিত্রকর—কিন্তু তোমরা তো জানোনা জীবনের চিত্রকর নীলিমাদির জীবনের ঘটনায় বিধাতা ঢেলে দিয়েছেন কালি । হ্যাঁ—শুধুই কালি ! আমার জন্য শিল্পী বিধাতার ভাণ্ডারে ঐ একটি রং-ই অবশিষ্ট ছিল । কথা শেষ হতেই দেখলাম চাঁদের আলোয় নীলিমাদির ভাসা ভাসা চোখের কোণায় জল চিক্ চিক্ করে উঠলো ।

বললাম, আপনার যখন কষ্ট হচ্ছে তখন না হয় থাক্ । তিনি বললেন, না সারাজীবন ভোর যে কথা বুকের মাঝে বয়ে বেরিয়েছি—তা বলতে কেন কষ্ট হবে ! বলে নীলিমাদি আবার সুরু করলেন ।

বিয়ের পর তো বাসী বিয়ে ফুলশয্যা সব ভালভাবেই কাটলো । আমার স্বামী দেবাশীষ রায় ছিলেন সত্যিকারের ভদ্র ও শিক্ষিত মানুষ । তিনি তখন সবে ডাক্তারী পাশ করেছেন আর আমি পড়ি স্কুলে । তাই ভালবাসার পাঠ আর জীবনের পাঠ দুটোই এক সঙ্গে ওর কাছ থেকে নিতে হতো । তাছাড়া আমি ছিলাম একটু চঞ্চল প্রকৃতির । আর ও ছিল গম্ভীর । ফলে প্রথম প্রথম adjust করে নিতে একটু অসুবিধে হয়েছিল । তবে আমার অভিমান, অনুযোগ, আবদার সব কিছুই ও আনন্দের সংগে গ্রহণ করতো ।

মনে আছে একবার বায়না ধরেছিলাম ইষ্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের ম্যাচ দেখতে যাবো । শাশুড়ীকে লুকিয়ে ও আমায় নিয়ে গিয়েছিল খেলার মাঠে ।

রবিবার আমরা কখনো বাড়ীতে খেতাম না । গাড়ী নিয়ে চলে যেতাম দূর-পাল্লায় । তারপর বাইরেই কোথাও দুপুরের খাওয়া খেয়ে নিতাম । শ্বশুর বাড়ীতে আমার আদর যত্নের সীমা ছিল না । বাবা, মা ভাইবোনকে ছেড়ে এসে শাশুড়ী, শ্বশুর, দেওর, ননদ ওদের খুব আপন করে পেয়েছিলাম । তার ফলে আমি এক সুখের সাম্রাজ্যের রানী হয়ে বসেছিলাম বলা যায । কিন্তু আমার বরাতে সুখ সইল না !

একটু থেমে আবার বললেন, সবার কি সব-কিছু সয় । ভাবি—আমার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কে ? আমার ভাগ্য ? না দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ? ও লণ্ডনে গিয়েছিল এফ. আর. সি. এস. পড়তে । এরই মধ্যে যুদ্ধ বাধল । পড়া বন্ধ রেখে ওকে সৈন্য বিভাগের ডাক্তার রূপে যুদ্ধে যোগদান করতে হোল । এ সময়

বিলেত থেকে ওর নিয়মিত চিঠি আসতো। প্রতি চিঠিতেই ও লিখতো, তুমি আমার জন্য একটুও ভেবো না। আমি ভাল আছি। কিন্তু হঠাৎ সব যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল! না কোন চিঠি না কোন টেলিগ্রাম। যারা ওখানে ছিলেন তাদের সংগে যোগাযোগ করেও কোন ফল হোলনা। কেউই ওর খোঁজ দিতে পারলেন না। মাসের পর মাস যায়—দেখতে দেখতে বছরও গড়িয়ে গেল। আমার ব্যাকুলতা দেখে সেই রকম পরিস্থিতিতেও বাবা তার এক বন্ধুর সঙ্গে আমাকে লণ্ডনে পাঠালেন। ভরসা—যদি খুঁজে বের করতে পারি। আসবার সময় শাশুড়ীকে প্রণাম করার পর বলে এলাম, মা আমি যদি সাধ্বী হই তো আপনার ছেলেকে খুঁজে বের করবই।

যুদ্ধোত্তর সেদিনের লণ্ডনের অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। চারিদিকে ব্লাক্‌আউট। পঁথঘাট ঘুটঘুটে অন্ধকার। যখন তখন সাইরেন বাজছে। বোমা পড়ছে। ধনসম্পদ কিছুরই নিরাপত্তা নেই। আমি আশ্রয় নিলাম বাবার (সহযাত্রী) বন্ধু নির্মলকাকার বাড়ীতে। কিন্তু আশ্রয় নিলে কি হয়? সেই পরিস্থিতিতে একমাত্র বৃদ্ধ আর শিশু ছাড়া কাউকেই বসে থাকতে দিতনা সরকার। প্রত্যেককেই কিছু কিছু কাজ করতে হতো। আমার উপর ভার পড়লো যুদ্ধে আহত জনসাধারণের সেবা করার। বোধহয় আমাকে ভারতীয় নারী দেখেই এ কাজটা ওরা আমায় দিয়েছিলেন। এ এক বিচিত্র ও নতুন অভিজ্ঞতা! কেন জানিনা, সেই পরিস্থিতিতে বসেও নিজেকে শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্নের কমলের মতন মনে হতো। কিন্তু এসব তো এহ বাহ্য। আসল কাজ তো ওকে খুঁজে বার করা। এ ব্যাপারে নির্মলকাকা আমাকে যতদূর সম্ভব সহযোগিতা করলেন। ব্রিটিশের সমস্ত সম্ভাব্য মিলিটারী ক্যাম্প-এ তিনি খোঁজ করলেন। কিন্তু সবই বৃথা হোল। কেউ ওর কোন খোঁজ দিতে পারলো না। তবে? তবে কি ও বেঁচে……আর মনে করতে পারলাম না। না! না! তা হতে পারে না!

ওদিকে বাবা আমায় ফিরে যাবার জন্য চিঠি লিখতে লাগলেন বার বার। নির্মলকাকা বললেন, নিজে তো যতদূর সম্ভব করলি। এবার আমার ওপর ভার দিয়ে তুই দেশে ফিরে যা। আমি খবর পেলেই ডেকে পাঠাবো। ওঁর এ কথায় রাজী হলাম। এছাড়া উপায়ই বা কি ছিল! দেশে ফিরতে আর মাত্র দুই তিন দিন বাকী। সেবিকা হিসেবে সেদিনই আমার কাজ শেষ।

এই কমাসের পরিচিত সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে যাবো, এমন

সময় স্ট্রেচারে করে নিয়ে এলো একটি যুদ্ধে আহত মেয়েকে। আঘাত যদিও এমন কিছু গুরুতর নয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পরই বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে।

আমাদের বিভাগের যিনি প্রধান তিনি বললেন মিসেস রয় ইনিই আপনার last patient। ওকে attend করে kindly একটু বাড়ী পৌঁছে দিন।

অধ্যক্ষের আদেশ যথারীতি পালন করলাম।

ডিভনশায়ারের একটি এ্যাপার্টের সামনে এসে গাড়ী থামলো। আমি মেয়েটিকে ধরে ধরে নামালাম। তারপর বেল টিপলাম।

দরজা খুলে আমার সামনে দাঁড়ালো দেবাশীষ।—দেবাশীষ রায়। চোখ দুটো ভাল করে মুছে নিলাম। কারণ নিজের চোখকেই তো বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এমন ঘটনা গল্পে উপন্যাসেই ঘটে। কিন্তু জীবনে কে কবে শুনেছে এমন ঘটনা। দেবাশীষের মুখ দেখে বুঝলাম ওরও মনের জমিতে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে।

আসলে আমাদের দুজনেরই নার্ভ বোধ হয় খুবই steady ছিল। নইলে অন্তত একজন অজ্ঞান হোতাম।

দেবাশীষ বলল—নীলা তুমি!

বললাম, আমার তো সেই প্রশ্ন। জানো না এই এক বছর ধরে প্রতিমুহূর্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি।

দেবাশীষ বলল, ভেতরে চলো।

বাইরে বরফ পড়ছে। দরজা জানালায় ভারী পর্দা টাঙ্গানো। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে।

ডোরা ততক্ষণে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে।

দেবাশীষ বলল, আর কোনদিন বলব না কিন্তু আজকের রাতটুকু তুমি আমার অতিথি হয়ে থাকো।

বললাম, পৃথিবীর আর অগণিত দিনরাত্রি কার মুখের দিকে চেয়ে থাকবো? ও আমার এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। তারপরই সেই আদিম নারী সুলভ কৌতুহল বশে জিজ্ঞেস করলাম ডোরা তোমার কে?

ও বলল, সেই কথাই তো বলছি।

দুজনে মুখোমুখি বসলাম। দেবাশীষ উঠে গিয়ে খাবার নিয়ে এলো। আমি সার্ভ করলাম—দেবাশীষ শুরু করলো তার কাহিনী।

তোমাদের ছেড়ে এখানে এসে পড়াশুনা নিয়ে মেতে গিয়েছিলাম। ভেবে-

ছিলাম তোমাকেও পাঠিয়ে দিতে বাবাকে লিখতো। কারণ একা একা ভাল লাগছিল না। বিশেষ করে এখানকার মেয়েরা গুণী ভারতীয় ছেলে দেখলেই বান্ধবীর বেশে প্রেয়সী হতে চায়। কিন্তু এই জীবনধারা পালটে দিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। অদ্ভুত এক thrill। এক উন্মাদনা। তবে ভারতীয় হয়ে ব্রিটিশ সেনা-বাহিনীতে যোগ দেওয়াটার মধ্যে একটা জ্বালা ছিল বৈকি। কিন্তু সেন্টিমেন্ট-এর তখন সময় কই।

সারাক্ষণ কাজ। কাজ আর কাজ। মরবার ফুরসৎ নেই। এরই মধ্যে জনৈক ইংরেজ ডাক্তারের নজরে পড়ে গেলাম। আমাদের বাহিনীতে তিনি ছিলেন মেজর। আসলে আমার কর্মকুশলতায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। আস্তে আস্তে তাঁর ছেলের মতন হয়ে গেলাম। সেই ডাক্তারের একটা নার্সিংহোম ছিল। যুদ্ধের চাকরী ছেড়ে দিয়ে সেই নার্সিংহোমের ডাক্তার হলাম। তখন তার বাড়ীতেই থাকতাম। সেই সময় একটি মেয়ে আমার খুব সেবাযত্ন করতো। কিন্তু কখনো মেয়েটি নিজের পরিচয় দিতনা। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলতেন মনে কর এক অভাগা নারী। মনে কর না হয় তোমার maid। কিন্তু না maid-এর মতন তো চেহারা নয়। সাজ-পোষাক আচার ব্যবহার সর্বত্রই বেশ একটা কালচার ও রুচীর ছাপ।

যাইহোক এভাবেই দিন কাটছিল। ফন্দী আটছিলাম ইণ্ডিয়াতে পালাবো। এরই মধ্যে ডাক্তার অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন—মারা যাওয়ার সময় উইল করে তিনি এই নার্সিংহোমটি আমায় দিয়ে গেলেন। আর দিয়ে গেলেন সেই অভাগা মেয়েটিকে, যাকে তিনি মনের দুঃখে maid বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। জীবন দীপ নিভে যাবার আগে বললেন, ডাঃ রয় ওই মেয়েটি আমার একমাত্র সন্তান। মাত্র কিছুদিন হল যুদ্ধে ওর স্বামী ও একমাত্র পুত্র মারা গেছে। ওকে তুমি গ্রহণ কর।

চেষ্টা করেছিলাম....অ.. নে....ক চেষ্টা কিন্তু সেই মুহূর্তে মৃত্যুপথযাত্রীর প্রিয়-জনের পায়ের তলা থেকে তার শেষ সম্বলটুকু ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। নীতি আমার হৃদয়ের কাছে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু এতদিন ওর বাবা ছিলেন আমাদের দুজনের মাঝখানে। আজ আর কোন আবরণই তো রইল না। তাই পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়েই তোমাকে বিয়ে করলাম।

তারপর একটু থেমে দেবাশীষ বলল জানি দুই স্ত্রী থাকা আইনতঃ অপরাধ।

এখন চরম শাস্তি তোমার হাতে।   বল ? বল ? কি শাস্তি দিতে চাও ?

বলেছিলাম, সুখী হোয়—আর ওকে কোনদিন বলনা যে তুমি আমায় বিয়ে করেছিলে।

দেবাশীষের দু-চোখ জলে ভরে গেল ভালবাসায় না কৃতজ্ঞতায় জানিনা।

কাহিনী শেষ হলে দেখলাম নীলিমাদিরও গাল বেয়ে নেমেছে জলের ধারা। বললেন, গল্পের পরিশিষ্টের মতন আমার জীবনেও একটা পরিশিষ্ট আছে।

দেশে ফিরে দেখি এয়ারপোর্টে শ্বশুর বাড়ী বাপের বাড়ীর সব লোক চরম উৎকণ্ঠিত হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।   না জানি কি খবর নিয়ে যাবো আমি।   অবশ্য সকলেই সব কিছু শোনার জন্য মনকে তৈরী করে রেখেছেন।

সবাই আমার চোখের তারার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগলো। তারপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করবার জন্যই আমার দাদা বললেন, কিরে কোন খোঁজ পেলি ?

মিথ্যে কথা বলতে গেলে যতখানি গাম্ভীর্য্য বজায় রাখতে হয় তার চেয়ে একটু বেশীই গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে উদাস কণ্ঠে জবাব দিলাম, না, পাইনি !

যদি বলতাম পেয়েছি, তাহলে তার সংগে যে খবরটা ওদের পরিবেশন করতে হত, সেটা যে শুধু আমার নারীত্বের পক্ষেই অপমানজনক তাতো নয় ওদেরও মর্য্যাদার পক্ষে হানিকর।   ওরা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠবে।   মামলা মোকদ্দমা শুরু করবে।   আমাকে আবার বিয়ের জন্য চাপ দেবে।   তাই সব দিক বজায় রাখবার জন্যই আমি এই নীতি গ্রহণ করেছিলাম।

পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে ভর্তি হলাম আর্ট কলেজে।

আর্ট কলেজের ডিগ্রী শেষ করে নন্দলাল বসুর কাছে আঁকা শিখেছি।   আর সুদীর্ঘ এই তিরিশ বছর ধরে শুধু এঁকে চলেছি।   এর পর আরও কয়েক বার ইংল্যাণ্ডে গেছি।   দেবাশীষের সংগে দেখা হয়েছে।   ও প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশী দাম দিয়ে আমার ছবি কিনেছে।   ওর সংগে আমার এই যোগাযোগের কথা কেউ জানে না।

চাঁদের আলোয় পাহাড়ী নদীর মতন নীলিমাদির লাল টকটকে পবিত্র সিঁথির সিন্দুর যেন আরও উজ্জল হয়ে উঠলো।

নীলিমাদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভাবতে ভাবতে এলাম—বিয়ে ভালবাসার চেয়ে বড় ?—না ভালবাসা বিয়ের চেয়ে ?

আমাদের নিকট সিমেন্ট-
কংক্রিটের বিভিন্নপ্রকার
অতি-আধুনিক সুরুচিসম্পন্ন
নক্সার জালি সর্ব্বদাই
মজুত থাকে।
দেবেন্দ্র নাথ পাল এণ্ড কোং
প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক
৩২/২ নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট. কলিকাতা-১২
গ্রাম : লোহাজালি
ফোন : ২৪-১৭০৯
২৪-৫২৯৩

ন্যায়-অন্যায়

মানবেন্দ্র সান্যাল

সুদীর্ঘকালের জড়তা ভেঙে
যখন অঙ্কুরিত হলাম আমি,
শুচিস্নিগ্ধ প্রেমের মৃত্তিকায়—
যখন বহুদিনের ঘুম কেটে
চোখ মেলে
দেখতে চাইলাম তোমাকে সরাসরি,
তখন চোখ বুজে
কষ্টকর পাপের কল্পনায়
তুমি বললে ঃ
না না এ অন্যায়।
সূর্য্যের আলোতে ঝলসে যখন উঠল
ইস্পাতের নিষ্পাপ ফলাটা—
তখন উদাসীনতার চরম অবজ্ঞায়
ভুল ভাবনার বেদনাময় কল্পনায়
তুমি বললে, মিথ্যে এই বলাটা।

আনন্দময়তা থেকে জন্ম নিয়েছিলো
যে ভালোবাসা
তাকে বিষণ্ণতার অন্ধকূপে ঠেলে দিয়ে
এই বেঁচে থাকা
এই আসা যাওয়া
এই ওজন করে চাওয়া পাওয়া
এটা ন্যায়।

ন্যায় অন্যায় জানিনা—
মানিনা কোন মলিনতা,
সহজ মনের অন্তরে

সরলতার মন্তরে
এনেছিলেম মুক্তি আমার
অনেকদিনের পরে————
তোমার কথায় থাক তা থেমে
অবাধ্য মন যাক্ না জেনে
সরলতাও দোষের হয়
অন্ততঃ এইখানে।

দুর্গোৎসব

কবিরুল ইসলাম

এখনও অনেক দুর্গ জেতা বাকি আছে।

দুই পাহাড়ের শীর্ষে দুপা ফাঁক করে
জাদু দণ্ড হাতে
দারুণ দাঁড়িয়ে
এখনও অনেক যুদ্ধ জেতা বাকি আছে।

তোমাকে দেবেনা কেউ সূচ্যগ্র মেদিনী
বিনা রণে
রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া তাই আর গত্যন্তর নেই
পুত্রার্থে যা বড় প্রয়োজন
পৃথিবী কি কোনো দিন বাসযোগ্য ছিল ?
হয়তো বা ছিল
হয়তো বা ছিল না
হয়তো বা হবে
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ।

অনেক মাইল্ স্টোন পেরিয়ে সটান
তবুও—
এখনও অনেক দুর্গ জেতা বাকি আছে॥

আইনজীবির চোখে শিশু অপরাধী

অরুণা মুখোপাধ্যায়

আইনের জীবনে চলার পথে দেখেছি মানুষের বিচিত্র রূপ আর বিচিত্র তার দৃষ্টিভঙ্গী। এই বিভিন্ন রূপের পসরার মধ্যে আইনজীবীর চোখে কারণ অনুসন্ধান করে জেনেছি, আবিষ্কার করেছি নিষ্পাপ ফুলের মত শিশুদের অন্তর্নিহিত মনের এক উচ্ছৃঙ্খল, বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী রূপটিকে ; যার প্রকাশ ঘটেছে ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু কেন এমন হয় ?

মনে পড়ছে এক তরুণ অপরাধীর কথা। সমাজ বিরোধী কাজের জন্য দণ্ডনীয় অপরাধের আদেশ হবার আগে তাকে আদালতে ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করেছিলাম—'তুমি এ কাজ করলে কেন ? মা-বাবার জন্যও কি চিন্তা হলো না ?' তরুণ অপরাধী উদাস ভাবে উত্তর দিয়েছিলো —'কি ভাববো ? কার জন্য ভাববো ? মাকে চিরদিন বাইরের কাজে ব্যস্ত দেখেছি। ঘরে আর কতটুকু মায়ের স্নেহ পেয়েছি বলুন ? আমার জীবনে কোনদিন কোন কাজেই মা বুঝিয়ে দেননি কোন্‌টি ঠিক, আর কোন্‌টি ঠিক না।' সত্যিই সেদিন সেই তরুণ অপরাধীর জন্য ব্যথাভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ী ফিরেছিলাম।

আর একটি ঘটনা। একবার এক তরুণ চোরকে দেখেছিলাম কেমন যেন বেপরোয়া ভাব ; সব কিছুই নষ্ট করতে চায়, ভেঙে ফেলতে চায়, অপরের জিনিষ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা সব সময়। খোঁজ নিয়ে জানলাম—মা আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার জটিলতায় দিন কাটাচ্ছেন। স্বামীকে পরিত্যাগ করে অপর পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছেলেটির অবচেতন মন কিছুতেই মানতে পারে না। কথায় কথায় ছেলেটিকে কেমন যেন সেদিন মারমুখী বলে মনে হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি সেদিন ভারী দুঃখ হয়েছিল এই তরুণ অপরাধীকে দেখে। মহিলা আইনজীবীর দৃষ্টিতে চিন্তাও করেছিলাম অনেক কিছু। ভেবেছিলাম আজকের দিনের মেয়েরা যদি তাঁদের জীবনকে জটিলতায় না ভরিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী রূপ প্রকাশ না করেন শিশুদের কাছে, তবে কি তাঁদের সন্তানরা মানসিক সুস্থ হয়ে উঠতে পারে না ?

এ ছাড়া মায়ের অত্যধিক আদরেও সন্তানকে নষ্ট হতে দেখেছি। ছোটবেলা থেকেই শিশুর অন্যায় আবদারকে মা প্রশ্রয় দেওয়ায় বড় বয়সে তার কোন একটা বড় অন্যায় আবদারকে মা মানতে নারাজ হন। ব্যস্, আর যায় কোথায়! একেবারে মায়ের গয়নার বাক্স নিয়েই চম্পট। এর পরেই এই কিশোরটিই 'তরুণ অপরাধী' নামে কুখ্যাত হয়ে উঠে। আইনজীবীর চোখে শিশু অপরাধীর বিচিত্র রূপের মধ্যে এই তরুণ অপরাধীর ইতিবৃত্তও তাই আমি আমার ডায়েরীর পাতায় সযত্নে তুলে রেখেছিলাম।

শিশু ও কিশোরের উপর ছায়াছবির প্রভাবও অত্যন্ত ব্যাপক। কিশোরদের স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্বৃত্তপনা ভরা ছবি না দেখানো উচিত আর অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদেরও যৌন আবেদনের ছবিতে না নিয়ে যাওয়া কল্যাণকর। একবার এক তরুণ অপরাধী নিজের মুখে বলেছিল—'ছবি দেখে আমি চুরি করতে শিখেছি।'

তাই মনে হয় নির্বিচারে সব ছবি দেখানোর সুযোগ করে দিলেও শিশুদের অপরাধ করার প্রবণতাকেই বাড়ানো হয়। ১৯৬৮ সালের খোসলা কমিশনও বলেছেন—প্রাপ্তবয়স্করা সিনেমা দেখে যতটা হৃদয়ঙ্গম করেন প্রায় ততটাই অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েরাও করে। মোটামুটিভাবে তাদের বোধশক্তি প্রাপ্তবয়স্কদের শতকরা ৭০ ভাগ।

এ ছাড়া অবশ্য উত্তেজনামূলক আত্মহত্যার সংবাদও তরুণদের মধ্যে প্রচারিত হওয়া ভাল নয়। কারণ শিশু আদালতে দেখা যায় অপরাধী শিশুর অসম্পূর্ণ মানসিকতার মধ্যে বিকৃতি রোগ। তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যুক্তিহীন ও বিকৃত আবেগের দাসত্বে আবদ্ধ হয়েছে—যার পরিণতি হয় আত্মহনন নয়তো কোন না কোনভাবে অপরের ক্ষতি করা।

তবে আইনজীবীর দৃষ্টিতে আমি বলবো যে শিশুর অপরাধকে দমন করার পথে রাষ্ট্রেরও বহু কর্তব্য আছে। যেমন রোগগ্রস্থ ও মানসিক বিকৃতিগ্রস্থ নরনারীর বিবাহ আইনের সাহায্যে বন্ধ করা, যৌন আবেদনমূলক চলচ্চিত্র শিশুদের সামনে প্রদর্শন না করানো, আইনের সাহায্যে শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তিকে রোধ করানো কার্য্যকরী করা ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন। তবে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে একটি কথা না বললে আজকের রচনা অসম্পূর্ণ হবে। সেটি হলো দেশের যারা তরুণ সম্প্রদায়, যারা হলো জাতির ভবিষ্যৎ তাদের অপরাধের জন্য দায়ী কি প্রধানতঃ আমরা মেয়েরা নই? আর তাই যদি হয় তবে আমরা মা, বোনেরা কেনই বা পারবো না আমাদের সন্তানদের, ভায়েদের নিজেদের মনের মত করে গড়ে তুলতে?

(৩২ পৃষ্ঠার পর)

৪র্থ। আহা ! গাংগুলীমশাই—

ভট্টাচার্য। আঃ, থামো দিকিনি তুমি !

৪র্থ। ন্যাড়াবাবার তো কোন দোষ নেই—

ভট্টাচার্য। (ক্রোধে) ঢের হয়েছে ! বলি, গেলা পেটা কতদিন হয়নি শুনি —এখন খ'সে পড়ো তো বাপু !

আচাযি। ধান ভানতে শিবের গাজন—

সকলে। হ্যাঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ !

৪র্থ। বেশ, আমিই যাচ্ছি।

শরৎ। না—না, আপনি যাবেন না চক্কোত্তি মশাই ! মামা—

বিপ্রদাস। তারা মা—আর যে সহ্য করতে পারি না !

ভট্টাচার্য। আহা-হা, তুমি বুঝছ না কেন ন্যাড়া ! তুমি আমাদের সমাজে পতিত—অস্পৃশ্য। তুমি ছুঁলে বা পরিবেশন করলে এতগুলি নিমন্ত্রিত নিষ্ঠাবান, সৎ, কুলীন ব্রাহ্মণ কেউই আজ এ বাড়ীতে জল পর্যন্ত স্পর্শ করবেন না।

শরৎ। ওঃ ! আমি অস্পৃশ্য—সমাজে পতিত ! বেশ. আমি আপনাদের কাছ থেকে অস্পৃশ্য হয়েই বিদায় নিচ্ছি ভট্টচাযিমশাই। আমি চলেই যাচ্ছি !

বিপ্রদাস। তারা—তারা মা !

শরৎ। তবে যাবার সময় একটা কথা বলে যাচ্ছি পণ্ডিতমণ্ডলী ! খেতে বসে বেড়াল কুকুর ছুঁলে যাদের জাত যায় না—যে সমাজ পতিত হয় না, সে জাত বা সমাজের বড়াই আপনাদের বেশী দিন টিকবে না। যে সমাজ মানুষের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে সে সমাজ—সমাজ নিয়েই থাক। তাদের রক্তচক্ষু আর গোড়ামীর কাছে আমি কোনদিন মাথা নত করবো না, তার চেয়ে দীন, দরিদ্র, অসহায় সাধারণ মানুষের সমাজ আমার কাছে অনেক প্রিয়। আমি চললাম মামা—

বিপ্রদাস। ন্যাড়া !—

ভট্টাচার্য। ছেড়ে দিন ছোটবাবু—

বিপ্রদাস। তারা—তারা মা !

(১২)

মজঃফরপুরের একটা ধর্মশালা। লোকজনের কোলাহল। একটা গানের সুর ভেসে আসছে।

শরৎ। 'তুমি নির্মল কর, / মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে।'

নিশানাথ। শরৎদা! শরৎদা!

শরৎ। কৌন্ হ্যায় তুম্?

নিশা। পরণে সন্ন্যাসীর বেশ, কণ্ঠে পরিষ্কার বাংলা গান অথচ—কেন নিজের পরিচয় গোপন করছেন? —আপনাকে আমাদের বাড়ীতে যেতেই হবে শরৎদা।

শরৎ। না ভাই, সমাজ সংসার পরিত্যক্ত আমার মত ভবঘুরের এই ধর্মশালার আস্তানাই ভাল।

নিশা। আপনাকে যেতেই হবে—এতে আমার দাদা-বৌদি খুব খুশি হবেন।

শরৎ। দেখ, সন্ন্যাসীর বেশ যখন একবার পরেছি—পথে বাস করাই ভাল।

নিশা। আপনার লেখার গৌরব আছে—

শরৎ। সব ছেলেমানুষী—কবেকার কোন খেয়ালে······এখন আর আমি কলম ছুঁই না।

নিশা। ওকথা বললে আমি শুনব না। এখানে আপনার যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে।

শরৎ। না-না, এতে আর কষ্টের কি! বেশ ভাল আছি।

নিশা। একটা অনুরোধ শরৎদা,—যে ক'দিন এই মজঃফরপুরে থাকবেন আমাদের বাড়ীতে আপনাকে আতিথ্য গ্রহণ করতেই হবে। দাদা-বৌদি আগেই আপনার পরিচয় পেয়েই গেছেন।

শরৎ। কি রকম?

নিশা। আমার দাদা শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৌদি অনুরূপা দেবী ভাগলপুরে আপনার বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু অরুণবাবুর কাছে—

শরৎ। অরুণ!

নিশা। চমকে উঠলেন কেন?

শরৎ। না এমনি।

নিশা। ভাগলপুর ছাড়ার পর আপনার এই দুঃখময় জীবনের কথা তাঁরা কেউই জানেন না। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, অরুণবাবু বৌদির এক জ্ঞাতি খুড়ো। তাঁর কাছ থেকেই আপনার লেখার পাণ্ডুলিপি—'অনুপমার প্রেম', 'কোরেল' বৌদি সবই পড়েছেন। এমনকি আপনার 'ছায়া' পত্রিকাও তাঁর কাছে অজানা নয়।

শরৎ। অরুণের এটা ছেলেমানুষী।

নিশা। আপনাকে যেতেই হবে শরৎদা। আপনার কণ্ঠের গান—

শরৎ। গান!

নিশা। কেন আর গোপন করছেন। রোজই রাস্তা থেকে শোনা যায়। আপনার মধুর কণ্ঠের আস্বাদ থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না। আর তাছাড়া, গানের সব সরঞ্জাম আমাদের বাড়ীতেই আছে।

শরৎ। খুব জোর আসর বসে বুঝি ?

নিশা। ভাল ভাল গায়কের সমাবেশ হলে তো আর কথাই নেই—

শরৎ। বেশ ত শুনতে যাবো একদিন। কারা আসেন ?

নিশা। তা অনেক, মাঝে মাঝে মজঃফরপুরের একজন জমিদারও।

শরৎ। কি নাম ?

নিশা। মহাদেব শাহু।

শরৎ। জমিদার—মহাদেব শাহু !

নিশা। যেমন সঙ্গীতে অনুরাগ তেমনি কণ্ঠ ; মাঝে মাঝে বাড়ীতে বাঈজীর ব্যবস্থা'ও আছে।

শরৎ। বাঃ! চমৎকার লোক তো রাজা সাহেব।

(১৩)

মহাদেব শাহুর বাড়ী। সঙ্গীতের মজলিস বসেছে। বাঈজীর কণ্ঠে ঠুংরী গানের মধুর সুর শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তবলার ছন্দপতন ঘটছে। এ নিয়ে মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

মহাদেব। কি ব্যাপার বলত ? শরৎবাবুর তো তবলায় এমন তাল কাটতে কোনদিন দেখিনি ?

জনৈক। হ্যাঁ, আজ যেন কেমন অন্যমনস্ক ভাব।

শরৎ। (সহসা তবলা ছেড়ে দেন)

সকলে। কি ব্যাপার ? কি ব্যাপার !

মহাদেব। শরীর ভাল নেই নাকি ?

জনৈক। কিন্তু শিকারের সময় তো তেমন কিছু—

মহাদেব। হ্যাঁ, তখন তো উৎসাহের আতিশয্যে শরৎবাবু আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। যাক্—আজ এখেনেই মজ'লস ভেঙে দেওয়া যাক।

সকলে। উঠে পড়া যাক—তা হলে ! চলুন সব।

মহাদেব। শরৎবাবু।

শরৎ। এঁ্যা, হ্যাঁ।

বাঈজী। শুনুন !

শরৎ। আমাকে ?

বাঈজী। হ্যাঁ, একটু কথা আছে।······আচ্ছা, তোমার এ সন্ন্যেসী সন্ন্যেসী খেলা আর কতদিন চালাবে ন্যাড়া দা।

শরৎ। কে ? পিয়ারী বাঈজী !

বাঈজী। ন্যাড়াদা।

শরৎ। তবে কি—তুমি—রাজলক্ষ্মী। (সেতারে ঝঙ্কার দিয়ে করুণ সুর বেজে ওঠে)

(১৪)

রেঙ্গুন। জেটিঘাট। জাহাজ ছাড়ার বাঁশীর শব্দ। জনতার কোলাহল।

গিরীন। আরে, শরৎদা ! এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আছ ?

শরৎ। দেখছ লাল সূর্যটা কেমন রক্তিম আভায় সারা আকাশটাকে রাঙিয়ে দিয়েছে।

গিরীন। এভাবে বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ নিয়েছ কেন ?

শরৎ। জগতের অনেক কিছু দেখলাম, শিখলাম তাই ভাবলাম—

গিরীন। অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা নেবে ?

শরৎ। না ঠিক তা নয় !

গিরীন। তবে ?

শরৎ। শরৎচন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খলতার চরম খবর তোমাদের বাঙালী পল্লীতে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে তাই—ইন্দ্রিয়কে সংযত করা যায় কিনা এ তারই একটা প্রচেষ্টা মাত্র।

গিরীন। চাকরী-বাকরী কিছু জুটল ?

শরৎ। পি-ডবলিউ-ডি-র চাকরীটা, এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য চলে গেল। তোমাকে বলতে আমার বাধা নেই গিরীন,···'আমার একটা অপবাদ চিরকাল অফিসে থাকবেই—আমি শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্য্যন্ত অফিসের দরজা মাড়াতাম না তাই—

গিরীন। ওর জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।

শরৎ। ভাবনা আমার কোনকালে ছিল না, আজও নেই—মা মারা গেলেন, বাবার মৃত্যু আমাকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়ে গেল। ছোট ছোট ভাই বোনেরা—তাই বাধ্য হ'য়ে আমাকে প্রবাসে জাহাজ ভাসাতে হয়েছে। এত দুঃখেও যখন বেঁচে আছি তখন জুটে যাবে যা হয় একটা কিছু—

গিরীন। এখন কোথায় যাবে ঠিক করেছ?

শরৎ। ঝামাপুকুর। উকীল রামচন্দ্র মিত্র-র ছেলে মণীন্দ্রবাবুর কাছে যাবো ভাবছি।

গিরীন। তিনি তো তোমার সুকণ্ঠের বেশ তারিফ করেন। তাঁরই মুখে তোমার সম্পর্কে আরও অনেক কথা শুনেছি। তুমি একাধারে শিকারী, সঙ্গীতজ্ঞ আর বিলিয়ার্ড খেলায় ওস্তাদ।

শরৎ। হ্যাঁ, এককালে আমার সবই ছিল কিন্তু আজ আর কিছু নেই গিরীন—তবে পানাভ্যাসটা যে চিরদিনের মত ত্যাগ করতে পেরেছি এটাই তথাগতেরই পরম করুণা।

গিরীন। সত্যি, তুমি পানাভ্যাস ত্যাগ করেছ?

শরৎ। হ্যাঁ গিরীন, সে এক মর্মান্তিক করুণ কাহিনী।···একজন ভদ্রলোক স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখে ঘুমোচ্ছিল, রাত একটায় দুটো মাতাল তাকে টেনে তুলে একেবারে মেরে এলা!

গিরীন। কে সেই ভদ্রলোক?

শরৎ। আমাদের এক বর্মী বন্ধু। আর মাতাল দুটো। আর এক চাটুজ্জে এবং আমি। রাত একটায় হার্টের রুগী বর্মী বন্ধুকে জোর করে মদ খাওয়াল চাটুজ্জে—পাশেই মেটিঙের ওপর তার স্ত্রী। সারা দিনের ক্লান্তিতে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আর আমরা দুটো মাতাল তার স্বামীকে শেষ করে দিলাম। এর পরও যদি মাতালের বিবেক না আসে তবে আর কিসে আসবে?

গিরীন। ···সত্যিই তুমি মানুষ শরৎদা। জীবন পথে তোমার মত পথিক—

শরৎ। আজ আসি ভাই—যদি কোনদিন তোমাদের কাজে লাগতে পারি সেদিন নিজেকে ধন্য মনে করবো। (সুর বেজে ওঠে)

(১৫)

গায়ত্রীর কক্ষের সুমুখ। ঝড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ। দরজায় করাঘাতের শব্দ।

শরৎ। গায়ত্রী! গায়ত্রী!

গায়ত্রী। কে? ও-আপনি।

শরৎ। গিরীনের কাছে আমি সব শুনেছি। তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না। এক শয়তানের হাত থেকে তোমাকে যখন উদ্ধার করতে পেরেছি তখন ও কাঠগোলার শশাঙ্কটাকে শায়েস্তা করতে বেশী সময় লাগবে না।

গায়ত্রী। আমার বাবার কাছে আর তো আমি ফিরে যেতে পারবো না দাদা।—শয়তান ছুটো লক্ষ্ণৌতে আমার মেসোমশায়ের বাড়ী নিয়ে যাবার ছল ক'রে একেবারে জাহাজে তুলেছে।

শরৎ। তোমার কোন ভাবনা নেই, যথা সময়ে গিরীন তোমাকে জাহাজে তুলে দেবে।

গায়ত্রী। আমি হিন্দুর ঘরে বালবিধবা - সমাজের রক্ত চক্ষুর কাছে আমাদের ক্ষমা নেই।

শরৎ। তাহ'লে ঐ সমাজকে তুচ্ছ ক'রে নতুন জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করতে আপত্তি কি?

গায়ত্রী। কি বলতে চান আপনি?

শরৎ। তোমার সমস্ত মলিনতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে কেউ যদি কাছে টেনে নিতে চায় গায়ত্রী!

গায়ত্রী। তাহয় না, উচ্ছিষ্ট প্রসাদে দেবতার নৈবেদ্য হতে পারে না।

শরৎ। কিন্তু তোমার বিবাহ—

গায়ত্রী। ছোটবোনের দাবী থেকে আমাকে আরও দূরে নিয়ে যেও না দাদা! (কান্নায় ভেঙে পড়ে করুণ সুর বাজতে থাকে।)

(১৬)

শরৎচন্দ্রের কক্ষ।

শান্তি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আপনি আমাকে বাঁচান।

শরৎ। শান্ত হও! কি হ'য়েছে খুলে বল।

শান্তি। টাকার লোভে বাবা রোজ রাতে কারখানার মিস্ত্রিদের নিয়ে বাড়ীতে নেশার আড্ডা জমায়। কারখানার মিস্ত্রী ঘোষাল বুড়ো বাবাকে টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে বিয়ে করতে চায়—আজ—(কান্না)

মত্তাবস্থায় চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বর—"কোথায় গেলিরে হারামজাদী।" এই তো।

শরৎ। আমি রোজ রাতে আপনাদের হল্লা শুনতে পাই—বাড়ীতে বিবাহ-যোগ্যা অনূঢ়া মেয়ে! আপনার লজ্জা করে না।

চক্রবর্তী। মেয়ে যোগ্য হয়েছে, বিয়ে দেব না? আমি গরীব মানুষ, এই বিদেশে ওর চেয়ে ভাল পাত্র আর কোথায় পাবো? ঘোষালের টাকা আছে, ছুড়িটা ভাত কাপড়ের দুঃখ পাবে না। একটু নেশা ভাঙ করে—হোক্। সে তো আমিও করি। আর যদি বয়সের কথা বল বাবু—বেটাছেলের আবার বয়স কি?

শরৎ। ঘোষালের সমস্ত দেনা আমি মিটিয়ে দেবো।

চক্রবর্ত্তী। তা না হয় হ'ল,—কিন্তু মেয়ের আমার বিয়ে দিতে হবে ত। এতই যদি তোমার প্রাণে দয়ামায়া বাবু, তুমিই কেন এই গরীব বামুনের মেয়েটাকে নিয়ে আমার জাত কুল রক্ষা কর না।

শরৎ। বেশ। এখন ঘরে যান। পাত্র না জোটে শেষ দেখা যাবে।

চক্রবর্ত্তী। এই তো বাবা লক্ষী ছেলের মত কথা। আয় শান্তি ঘরে আয়। ওরে তোর পরম সৌভাগ্য। আয়—

শরৎ। যাও শান্তি, ঘরে যাও—

(১৭)

শ্মশানে বাতাসের হু হু শব্দ। দু'একটা শেয়াল কুকুরের চীৎকার। একটা গান ভেসে আসছে। "খেলার ছলে হরি ঠাকুর | গড়েছেন এই জগৎখান,..."

বাবাজী। ব্যাস্, কাজ শেষ। "বল হরি—হরি বোল হরি" এস বাপেরা নদী থেকে দু'কলসী জল ঢেলে চিতেটাকে নেভাও।

শরৎ। গিরীন। আমার শান্তির যে আর কোনই চিহ্ন রইল না ভাই।

গিরীন। চুপ কর শরৎদা। মৃতদেহটার যে সৎকার হ'য়েছে এটাই ভাল। নেহাৎ শ্মশানে বাবাজীকে পেলাম তাই রক্ষে। নইলে কি যে হ'ত। আমি যখন সমিতির সভ্যদের সমস্ত অবস্থা জানিয়ে বললাম—তারা তখন কি বললে জান শরৎদা, যদি ভদ্রপল্লীতে তোমার বাস হত, আমাদের সমাজের সঙ্গে তোমার মেলামেশা থাকত, তাহ'লে আজ ভাবতে হ'ত না। অন্ততঃ বিশ-পঁচিশজন বন্ধু-বান্ধব তোমার স্ত্রীর শবদেহ কাঁধে নিয়ে শ্মশানে যেত, কিন্তু তুমি কখনও তাদের সঙ্গে মেশ নি, তোমার বিবাহিত জীবনের কথা অনেকেই জানে না।

শরৎ। ভাই, কোথায় সে চলে গেল, একদণ্ডে যেন একটা প্রলয় হ'য়ে গেল।

গিরীন। শোকে অধীর হয়ে পড়লে তো চলবে না—এখন তোমাকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে।

বাবাজী। বাবা! বিরাটের চিন্তা কর, সান্ত্বনা পাবে, জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যুঃ। জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে?

গিরীন। পরের উপকার করতে গিয়েই তো বৌদি প্লেগের হাত থেকে রক্ষা পেলেন না। প্লেগ রোগীর সেবা করতে গিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন—এ তো পরম গৌরবের শরৎদা।

শরৎ। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হ্যাঁ, ভাই ঠিক তাই "পরার্থে প্রাজ্ঞ-উৎসৃজেৎ।" (বাঁশীর সুর শোনা যায়)

শরৎচন্দ্রের কক্ষ। গড়গড়া টানার আওয়াজ।

যোগেন। শরৎদা। শরৎদা আছো ?

শরৎ। আরে যোগেন ভায়া যে এস—এস।

যোগেন। 'বড়দিদি, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, পথ-নির্দেশ, বিরাজ বৌ, বোঝা, কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ, পরিনীতা, চরিত্রহীন, পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি, পল্লী-সমাজ, শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী…' আরে বাপরে বাপ ইরাবতীর মত একেবারে সাহিত্যের বন্যা—

গিরীন। শরৎদা। কি ব্যাপার ? সত্যিই তুমি একটা বিরাট রহস্য একটা জিজ্ঞাসা। এত কাণ্ড করে বসলে কবে ?

যোগেন। শোন শরৎদা, আমরা ভেবেছি ক্লাবের তরফ থেকে প্রবাসী বাঙালীরা মিলে তোমাকে সাহিত্যিক সম্বর্ধনা দেবো।

শরৎ। যোগেন ! উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে একটা সমাজ পরিত্যক্ত অপাংক্তেয় মানুষকে নিয়ে এত হৈ চৈ ভাল নয়।

গিরীন। কি বলছ তুমি শরৎদা।

শরৎ। ঠিকই বলছি ভাই, তোমরা সনাতন হিন্দু সন্তান। আমাকে নিয়ে বেশী মাতামাতি করলে—

যোগেন। সমাজচ্যুত হব !

গিরীন। তোমার সঙ্গে মেলামেশা করেও যখন এখনও ঠিক আছি—আর তার কোন সম্ভাবনা নেই।

শরৎ। ক'দিন থেকে তোমাদের কাছে একটা কথা বলব বলব করেও বলতে পারছি না।

যোগেন। কি বিশেষ জরুরী কিছু !

শরৎ। না—তবে হ্যাঁ জরুরীও বটে —

গিরীন। আর "সাসপেন্সে" না রেখে বলেই ফেল শিগ্গীর !

শরৎ। খুব শিগ্গীরই আমাকে রেঙ্গুন ছেড়ে কলকাতায় যেতে হচ্ছে ভাই।

গিরীন। সেকি।

শরৎ। হ্যাঁ ভাই, একের পর এক ভাগ্য বিপর্যয়ে মনটা আমার দুর্বল হয়ে পড়েছে। শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না তার ওপর আপিসের সাহেবের সঙ্গে বনি-বনাও তেমন হচ্ছে না। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

একশ' টাকা আয়ের ভরসা দিয়ে কলকাতা যেতে লিখেছেন। দেখি—ভাগ্যে কি আছে।

গিরীন। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

শরৎ। ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবনে একমাত্র ভরসা তোমাদের মত বন্ধুরাই—তাদের ছেড়ে থাকব এ ভাবতেও পারি না। যদি সুস্থ হয়ে ফিরি আবার দেখা হবে। এ ভাবে আর বেঁচে থাকতে চাই না—না। (করুণ সুর)

(১৯)

বাজে শিবপুরের বাড়ী। বসে শরৎচন্দ্র তামাক টানছেন।

শরৎ। জান সরোজ! জান, তোমরা আমার জীবনের সায়াহ্নকালে জানতে চেয়েছ কোথায় আমার আঘাত? আমার উপন্যাসের নায়ক নায়িকারা তা তোমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেবে। তাদের মুখেই আমার অনেক কথা বলা হয়ে গেছে ভাই। একদিন কলম ছেড়ে দিয়ে চরকা ধরেছিলাম। সুভাষচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন আমাকে সম্বর্দ্ধিত করেছেন,—দেশমাতৃকার পরাধীনতা আমাকে বারবার আঘাত করেছে। দেশের রাজ-নৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েও বেশীদিন সেখানে টিকতে পারলাম না।

সরোজ। কেন শরৎদা!

শরৎ। সে তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না ভাই—আমার 'পথের দাবী' তোমার এ প্রশ্নের কিছুটা মীমাংসা করে দেবে। আমার বিরুদ্ধে আজ অনেক অভিযোগ শুনতে পাই—আমার সাহিত্যের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঠিক কথা, কেন জান? "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্ব্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে।

সরোজ। শরৎদা?—আপনি যেন কেমন—

শরৎ। হ্যাঁ ভাই শরীরটা ক'দিন যাবৎ ভাল লাগছে না! ভাবছি নার্সিং হোমে চলেই যাই।

সরোজ। আজ আমি চললাম শরৎদা!

শরৎ। এসো ভাই। সমাজ—সমাজ—সমাজ!

পার্ক নার্সিং হোম।

শরৎ। আর পারি না। আয়ু আমার শেষ হয়ে এসেছে। ক্লান্তিতে আমার বুকের বল পর্যন্ত হারিয়ে গেছে। হে পরম করুণাময় এবার আমাকে দাও শান্তি··· আজ আমার চোখের সামনে সবাই এসে ভিড় করছে। কে? বিশ্বকবি! তোমাকেই গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছি। তোমার কাব্য কবিতা গল্পের বই ছিল আমার জীবন যাত্রার পথে একমাত্র সাথী! তুমি আমায় অনেক সম্মান দিয়েছ ···আঃ। ও কি তোমরা কারা? একই সঙ্গে এত ভিড় করে আছো? কে? কে তুমি?

রাজলক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে "আচ্ছা, ন্যাড়াদা, তোমার তো অনেক গুণ তবে কেন এমন কর বলত?"

আঃ! তোরা কি আমাকে একটু শান্তিতে মরতে দিবি না।

অন্নদাদির কণ্ঠস্বর। 'ভাই ন্যাড়া, রাগ করিস না—তোর ঐ টাকা ক'টার সঙ্গে যে মায়া জড়ান রয়েছে।'

আঃ! আঃ! যা তোরা সব দূর হয়ে যা—সারা জীবন আমাকে জ্বালিয়েছিস আজ আবার মৃত্যুর মুখে পা রেখেছি এখনও তোরা আমাকে মুক্ত দিবি না!

গায়ত্রীর কণ্ঠস্বর—"ছোট বোনের দাবী থেকে আমাকে আরও দূরে টেনে নিয়ে যেও না দাদা।'

নাঃ! আর সহ্য করতে পারিনা। গুরু তুমিও এসেছ? বল শেষ সময়ে একবার তোমার কণ্ঠে আমার সম্বর্দ্ধনার বাণী শুনতে বড় সাধ।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র—তুমি জীবনের নির্দিষ্ট পথের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছ।

"বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয়নি। তোমার সাহিত্য রসসত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেষণপাত্র,···

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান ক'রে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত দৃষ্টি বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন ক'রে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে

প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে)…অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি।…

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে, চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয় কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষ ভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি।… তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন, তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে গুণে ভালোয় মন্দয়,—চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়। (করুণ সুর বেজে ওঠে তার মধ্যেই ধ্বনিত হয়—)

"যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,/ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে,
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'/দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।"